বাংলা কবিগানে রমেশ শীল, বিজয় সরকার ও স্বরূপেন্দু সরকার

সঞ্জয় পাণ্ডে
এম.ফিল. গবেষক
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
ডিসেম্বর ২০১৯

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা কবিগানে রমেশ শীল, বিজয় সরকার ও স্বরূপেন্দু সরকার

গবেষক
সঞ্জয় পাণ্ডে
যোগদানের তারিখ : ১৬/০৬/২০১৫
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১১৩
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫
সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক
ড. আকলিমা ইসলাম কুহেলী
সহযোগী অধ্যাপক
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকারনামা

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, 'বাংলা কবিগানে রমেশ শীল, বিজয় সরকার ও স্বরূপেন্দু সরকার' শীর্ষক বিষয়ের ওপর এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভটি আমার মৌলিক রচনা। এই অভিসন্দর্ভটি অথবা এর কোনো অংশবিশেষ কোথাও প্রকাশিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য অন্য কোথাও জমা দেওয়া হয়নি।

গবেষক

সঞ্জয় পাণ্ডে
যোগদানের তারিখ : ১৬/০৬/২০১৫
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১১৩
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫
সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, সঞ্জয় পাণ্ডে কর্তৃক উপস্থাপিত 'বাংলা কবিগানে রমেশ শীল, বিজয় সরকার ও স্বরূপেন্দু সরকার' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধায়নে রচিত। তাঁর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ ১১৩, ২০১৪-২০১৫। এটি লেখকের মৌলিক গবেষণাকর্ম। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করেননি।

ড. আকলিমা ইসলাম কুহেলী
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
সহযোগী অধ্যাপক
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীত বিভাগের শিক্ষকমণ্ডলীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সংগীত বিভাগের অধ্যাপক প্রয়াত ডক্টর মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী স্যারের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীত বিভাগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উক্ত বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছিলেন। আমি শ্রদ্ধাভরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ডক্টর আকলিমা ইসলাম কুহেলী ম্যাডামের প্রতি। যিনি শত ব্যস্ততার মাঝেও আমাকে শিক্ষাদান, গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও গবেষণার সকল বিষয়ে সর্বতোভাবে সহায়তা করেছেন। যাঁর উৎসাহে আমি গবেষণা সফলভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি। এছাড়া যে সকল গ্রন্থাগার ও প্রতিষ্ঠান থেকে আমি এ কাজের তথ্য সংগ্রহ করেছি, সে সকল প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই যাঁরা আমাকে বইপত্র ও তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বাংলা একাডেমি-র উপ-পরিচালক ড. তপন বাগচীকে– যিনি বর্তমান গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে আমাকে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে আমাকে সহায়তা করেছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই সেসব গবেষকদের প্রতি, যাঁদের প্রদত্ত সাক্ষাৎকার আমার গবেষণাকে ঋদ্ধ করেছে। পরম শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক যতীন সরকার, পরম শ্রদ্ধাভাজন বিজয় সরকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান কাজল অধিকারী, পরম শ্রদ্ধাভাজন বিজয় সরকারের মানসপুত্র ও গবেষক মহসিন হোসাইন, পরম শ্রদ্ধাভাজন স্বরূপেন্দু সরকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র অধ্যাপক স্বরোচিষ সরকার-এর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা রইল অশেষ। কৃতজ্ঞতা জানাই আমার জন্মদাতা পিতা-মাতাসহ পরিবারের সকলের প্রতি। যাঁরা আমার গবেষণার কাজে কোনো না কোনোভাবে কাছে বা দূরে থেকেও সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। পরিশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই গ্রামবাংলার অসংখ্য কবিয়াল এবং তাঁদের পরিবারবর্গকে।

সঞ্জয় পাণ্ডে
গবেষক
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

সূচি

ভূমিকা	৭
প্রথম অধ্যায় বাংলা কবিগান ও তার উন্মেষকাল	১১
দ্বিতীয় অধ্যায় বাংলা কবিগানের বিকাশকাল	৪১
তৃতীয় অধ্যায় বাংলা কবিগানের ধারায় রমেশ শীলের ভূমিকা	৯১
চতুর্থ অধ্যায় বাংলা কবিগানের ধারায় বিজয় সরকারের ভূমিকা	১১৮
পঞ্চম অধ্যায় বাংলা কবিগানের ধারায় স্বরূপেন্দু সরকারের ভূমিকা	১৪৪
ষষ্ঠ অধ্যায় বাংলা কবিগানের বর্তমান অবস্থা ও সম্ভাবনা	১৭০
উপসংহার	১৭৬
পরিশিষ্ট : গবেষকদের সাক্ষাৎকার	১৭৮
আলোকচিত্র	১৯৬
গ্রন্থপঞ্জি	২০৩

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বাংলার সংস্কৃতি বহু যুগ ধরে- গ্রামীণ সভ্যতা, গ্রামীণ জীবন এবং গ্রামীণ সংস্কৃতির ওপর ভর করে বিকাশ লাভ করছে। মানুষের গ্রামীণ জীবনের আনন্দ-বেদনার সুরমূর্ছনায় এর শিল্প-সাহিত্য ভরপুর। বহুবিধ জটিল প্রসঙ্গের সহজ শিল্পরূপ নিয়ে বাংলা লোকসংগীত-লোককথা গড়ে উঠেছে। যুগে যুগে নানা গায়েন, কথক, সাধক, বাদক, পীর, ফকির, সাধু প্রভৃতির ঐতিহ্যে ও অবদানে আমাদের লোকসাহিত্য ভরপুর। আর্থিক সম্পদে আমরা পশ্চাদপদ হলেও নানামুখী সংগীতসম্পদের প্রাণ-প্রাচুর্যে আমাদের মন-মনন চিরকালই ঋদ্ধ। তাই আজো কবিগান, জারীগান, সারীগান, গাজীর গান, টপ্পা, কীর্তন, গম্ভীরা, বাউল, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, মুর্শিদী, মারফতী, তরজা, বিচারগান, ভাবগান, বিয়ের গান, আলকাপ, আঞ্চলিক গান, শ্যামাসংগীত প্রভৃতি মনভোলানো গানের সুর ও বিষয়-বৈচিত্র্যে গ্রামবাংলার জনগোষ্ঠী এবং জনপদ মুখর। হাজার বছর পূর্বেও আমাদের দেশে কথকগণ রাম-পাঁচালী, ভারত-পাঁচালী, হর-গৌরী, রাধা-কৃষ্ণ, বিষ্ণু-লক্ষ্মী প্রভৃতির ধামারী গান করতেন।

সে সময় দেশ-সমাজ-রাষ্ট্রের নানা সংকট-সমস্যা, দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, বিপদ-বিপর্যয়, খরা-বন্যা, ক্ষুধা-ব্যাধি, শোষণ-হনন, উত্থান-পতন, উৎপাত-উপদ্রব, বিপ্লব প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে প্রাকৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রিক ও ধার্মিক আদলেও গান-গাথা মুখে মুখে রচনা করেছেন অনেক অবিস্মরণীয় গায়েন ও কথক। এ প্রসঙ্গে কবিয়াল গোঁজলা গুঁই, ভবানী বণিক, নিতাই বৈরাগী, কেষ্টা মুচি, নিধুবাবু, রামবসু, ভোলা ময়রা, রাসু নৃসিংহ, রূপচাঁদ পক্ষী, হরুঠাকুর, মোহনচাঁদ, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি প্রমুখ কবিয়ালদের নাম নানা গুণে মানে-যশে-দানে স্মর্তব্য। পনের শতক থেকে যখন পাঁচালী লেখা হচ্ছিল, তখন কথকদের কিংবা গায়েনদের গানের আসরের জনসমর্থন ও জনপ্রিয়তা গ্রামবাংলায় একটুও কমতি ছিল না। তখন কবিমাত্রেই ছিলেন কথক ও গায়ক।

বাংলার শ্রুতি-স্মৃতিনির্ভর লোকসংগীত তথা লোকসাহিত্যই বাঙালি সংস্কৃতির আদি পীঠস্থান। এ সংস্কৃতি মুখ থেকে শ্রবণে বাহিত হয়ে স্মৃতির সম্পদ হয়ে সর্বসাধারণের আস্বাদ্য হয়ে এসেছে। দিনে দিনে স্থায়িত্ব রক্ষার প্রয়োজনে মুদ্রণযন্ত্রের সূত্রে গীতসাহিত্যের শ্রুতিসত্তা বিলুপ্ত হয়ে আসল একসময়। অক্ষর পরম্পরায় সজ্জিত প্রতীকচিত্রের দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ নিল সংগীত ও সাহিত্য। এর পূর্বেও নাটগানের মতো শক্তিশালী লোকজ সংস্কৃতির পরিবেশনায় এক ধরনের দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ ছিল। সে গীত ছিল প্রথমত শ্রবণ, তার পরে তাতে দর্শনের বিষয়টি চলে আসত। কালক্রমে শ্রবণ করার পুরনো অভ্যাস লুপ্ত হয়ে আপন মনে পাঠ করে রসগ্রহণ করার সুযোগটি চলে আসল। ফলাফল হিসেবে লেখাপড়া-জানা সাহিত্য শহরে-নগরে চালিত মুদ্রিত গ্রন্থে আবদ্ধ হল; আর সাধারণজনের তথা অক্ষরজ্ঞান-বিহীন সাধারণ মানুষের সাহিত্য-সংগীত-ধারার পরিচয় হল লোকসংগীত বা লোকসাহিত্যের সাথে।

সেদিনের দেশ-সমাজ-রাষ্ট্র ছিল আজকের তুলনায় অনেক অনুন্নত ও পশ্চাদপদ। শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য প্রভৃতিতেও ছিল প্রায় অজ্ঞ ও আনাড়ি। রেডিও, টিভি আর সংবাদপত্রও ছিল অনায়ত্ত। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার অভাবে যানবাহনেরও ছিল না সুব্যবস্থা। তাই পৃথিবী আজকের মতো অখণ্ড ও সংহত ছিল না। আর সে সুবাদেই লোকায়ত বাংলার কথক ও গায়েনগণ তাঁদের গাথা-গানে সুরে-ছন্দে, ছড়ায়-পদে লোকসমাজে প্রচার করতেন ধর্মের কথা, ভাবের কথা, জীবনের কথা, জগতের কথা এবং দর্শনের কথা। তাই তাঁরাই ছিলেন তৎকালীন লোক-সমাজের শিক্ষক।

Dhaka University Institutional Repository

লোকায়ত বাংলার লোকসমাজকে ধর্মে-দর্শনে, সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে, স্বাজাত্যে-স্বদেশপ্রেমে, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বে, রাজনীতি-সমাজনীতিতে, নীতি-নৈতিকতাতে, দায়িত্বে-কর্তব্যে এবং দেশ-সমাজ-রাষ্ট্র বিষয়ক জ্ঞানদানই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। সেই তামস যুগে গ্রামবাংলার অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ লোকসমাজে শিক্ষার ও জ্ঞানের টিমটিমে প্রদীপটি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন তাঁরাই। আজো গ্রামবাংলার গণ-মানুষের কাছে তাঁরা বরেণ্য। গাঁয়ে-গঞ্জে হেন লোক নেই যারা গায়েন, কবিয়াল ও কথকগণকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে না।

এমনিভাবে আঠারো শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত চলছিল। হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে বিদেশি বণিকদের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের সাফল্যে ও মুঘল শাসনের শৈথিল্যে বাঙালির জীবনে নেমে আসে আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নানা বাধা-বিপত্তি, ভয়-ভীতি ও বিপদ-বিপর্যয়। মূলত আঠারো শতকের গোড়া থেকেই বাঙালির জীবন ও জীবিকায় নেমে আসে সীমাহীন অভাব-আকাল-আর্তি ও আঁধি। অমন বিপদ-বিপর্যয় ও আকালের কালেও কবিয়াল ও কথকগণ হাল ছাড়েননি তাঁদের গানের। কবিয়ালদের কাছে হেন বিষয় নেই, যা তাঁরা জানেন না, সঙ্গত কারণেই এই নিরক্ষরের দেশে কবিয়ালেরা আজো লোকায়ত বাংলার লোক-শিক্ষক। তাঁদের সর্ববিদ্যায় ব্যুৎপন্নমতিত্ব, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বাক্‌পটুতা, বাক্‌প্রতিমা, তর্কনিষ্ঠা, ছড়া-গান ও ছন্দ প্রয়োগের দ্রুততা আমাদেরকে নিয়ে যায় ভাবের বিস্ময়ের আশ্চর্যালোকে।

তৎকালীন গ্রামাঞ্চলের ধামালী, ঝুমুর, গম্ভীরা প্রভৃতি গানে আদিরসের অভাব ছিল না কখনো। তাই কবিগানেও রুচিবিকৃতি ও অশ্লীলতার অন্ত ছিল না। কবিগান তাই উন্মেষকাল থেকেই গুরুপ্রশস্তি, সখী-সংবাদ ও খেউর দিয়েই শুরু। বাউল মত ও বাউল-সাধনার মতো হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সাধনার সমন্বয়ে, পরিচর্যায় ও পরিশীলনে কবিগান আজকের আধুনিক প্রযুক্তিবিজ্ঞানের যুগেও বেঁচে রয়েছে ভিন্নভাবে।

কবিগান ভারতবিভক্তির পূর্বপর্যন্ত অবিভক্ত বাংলার লোকসংগীতের অত্যন্ত জনপ্রিয় ধারা হিসেবে তার অস্তিত্ব দৃঢ়ভাবে বজায় রেখেছে। সে সময় কবিগানের আয়োজন ছাড়া পূজা-পার্বণ এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিয়ের অনুষ্ঠানও অসম্পূর্ণ থেকে যেত। বিলুপ্তপ্রায় সাংস্কৃতিক ধারা হিসেবে ইদানীং 'কবির লড়াই' নামে যে একটি আয়োজন শহুরে সংস্কৃতিক আসরে মাঝে মাঝে উপস্থাপিত হতে দেখা যায়– তা প্রকৃত কবিগান নয়।

কবিগান আমাদের লোকঐতিহ্য ও সাহিত্যে বহমান একটি ধারা। এই ধারা বহতা নদীর স্রোতের ন্যায় এঁকেবেঁকে বয়েই চলেছে এবং ছুটে চলেছে দিক-দিগন্তে। যুগ-যন্ত্রণা ও কালিক ভাবনার যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে মাঝে মধ্যে এর ব্যত্যয় কিংবা ব্যতিক্রম ঘটলেও কবিগান কখনো কোথাও একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। কবিয়ালগণ গদ্যে কিছু বলেন না, বলেন পদ্যে ছড়া। সঙ্গে থাকে অপূর্ব হৃদয়ছোঁয়া সুর ও ছন্দ। কবিয়ালদের এই উপস্থাপনা মূলত তাৎক্ষণিক, পূর্বপ্রস্তুতি ব্যতিরেকেই কবিয়ালগণ অত্যন্ত বাকপটু। তাঁদের শব্দচয়ন ও শব্দসম্ভার অকল্পনীয় ও ঈর্ষণীয়। উপস্থিত বুদ্ধিতে তাঁদের মন-মনন ঋদ্ধ। লোকায়ত বাংলার সর্বত্র এর ব্যাপ্তি ও বিকাশ, প্রচার-প্রসার, সুনাম ও সুখ্যাতি এবং প্রভাব ও প্রতিপত্তি। বাংলার বাউলদের ন্যায় কবিয়ালগণও আজীবনই অজাতশত্রু ও অসাম্প্রদায়িক।

কবিগান বাঙালি সংস্কৃতির একটি মৌলিক উদ্ভাবন। তাৎক্ষণিকভাবে কবিয়ালগণ সৃষ্টি করে চলেন শত-সহস্র ছড়া-কবিতা, সঙ্গে থাকে সুর ও ছন্দ। নানা সুরে-ছন্দে-ছড়ায়-পাঁচালীতে কবিয়ালগণ যে অজস্র কবিতা শ্রোতাদের উপহার দেন তাতে শ্রোতারা বিমুগ্ধ হন। গ্রামবাংলার গতরখাটা লোকসমাজ ও ছিন্নমূল পরিবার হতেই কবিয়ালদের আগমন ও আবির্ভাব, উদ্ভব ও উত্থান। তাই তাঁদের অভাবের এবং দুঃখের শেষ ছিল না। কবিয়ালদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন গ্রামের জমিদার তথা ভূ-স্বামীগণ। সঙ্গত কারণেই ভূ-স্বামীগণের মনোরঞ্জনের জন্য এবং তাঁদের প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশায় কবিয়ালগণ ভূ-স্বামীগণের

Dhaka University Institutional Repository

নামেই বন্দনা গাইতেন। তখনকার দিনের কবিগানে অনেক ব্যক্তিবন্দনা, ব্যঙ্গ ছড়া-কবিতা-পাঁচালি ছিল। ছিল নানা অশ্লীলতা এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ। নানামুখী আক্রমণাত্মক, শ্লেষাত্মক ও ব্যঙ্গাত্মক ছড়া, গান, সুর ও কবিতার অন্ত ছিল না তখনকার দিনের গাইয়ে, গায়েন ও কথকদের মধ্যে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গীয় অঞ্চলে যে প্রাণস্পন্দন জেগেছিল তা ছিল কোলকাতাকেন্দ্রিক শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের চিন্তা ও কর্মের বলয়ে আবদ্ধ। ইংরেজি শিক্ষা ও ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবে এই 'জাগরণ'-এর উৎপত্তি। সার্বজনীন মানবচেতনাকে সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ চিন্তা-চেতনায় অঙ্গীভূত করতে ব্যর্থ ছিল এই 'জাগরণ'। আধুনিক শিক্ষার আলোকবঞ্চিত খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের সঙ্গে এই 'জাগরণ'-এর কোনো যোগ ছিল না। 'জাগরণ'-এর এই নাগরিক প্রচেষ্টার পাশাপাশি বঙ্গীয় অঞ্চলের গ্রামে-গঞ্জেও চলেছিল এক ধরনের জাগৃতির প্রয়াস। লোকগানের মাধ্যমে এই প্রয়াস হয়ে উঠেছিল গ্রামবাংলার জাত-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষের মিলনের প্রয়াস। বুদ্ধির জড়তামুক্ত অসাম্প্রদায়িক মানববাদ এই অক্ষরজ্ঞান-বিহীন গ্রাম্য-সাধক ও লোককবিদের বাণী ও সাধনার মাধ্যমে মূর্ত হয়ে উঠেছিল– প্রাণ পেয়েছিল। গ্রামবাংলার এই মানবতাবাদী মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনে প্রাণপুরুষ হয়ে উঠেছিলেন এই বঙ্গীয় ভূ-খণ্ডের লোককবিগণ।

মূলত সুদূরপ্রসারী, বাস্তবমুখী, যুগোপযোগী ও বস্তুবাদী হয়েই কবিগান নিজস্ব স্বকীয়তার মাধ্যমে টিকে রয়েছে এবং থাকবেও। বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাতেই ছোট-বড় ও নবীন-প্রবীণ অনেক কবিয়াল আজো কবিগান করছেন। কবিয়ালদের হৃদয়বন্ধনের প্রসূন-স্বরূপ ও অক্লান্ত পরিশ্রমে কবিগান আজো বেঁচে রয়েছে গ্রাম-বাংলার গণমানসে। লোকায়ত বাংলার ঐতিহ্যের মধ্যে কবিগান একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। আমাদের সাহিত্য-পথিকৃৎগণ লোক-সংস্কৃতির অনেকগুলো অলিগলি বিচরণ করার পরও কবিগান সম্পর্কে তেমন কোনো 'মাস্টার পিস' রচনা করেননি। এটা হয়তো আমাদের কবিয়ালদের দুর্ভাগ্য। আবার কবিয়ালদের মধ্যে তেমন কোনো জাত লিখিয়ে ছিলেন না। মূলত কবিয়ালগণ বেশিরভাগই ছিলেন অল্পশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত। তাই হয়তো কোনো কবিয়ালই কোনো গ্রন্থ রচনায় এগিয়ে আসতে সাহস করেননি। তবে এ প্রসঙ্গে কবিয়াল হরিচরণ আচার্যের 'কবির ঝংকার' নামক গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করা যায়।

কবিগানের জন্ম ও জীবন, শুরু ও সূচনা, বিকাশ ও বিস্তৃতি সম্পর্কেও নানা বিতর্ক রয়েছে। একেবারে নির্ভেজাল সত্য কিংবা পাথুরে প্রমাণ দিতে পারেননি কেউ। যে যা বলেছেন তা কেবলই আঁচ-আন্দাজ-অনুমাননির্ভর। তবে ১৯৭৭ সনে কোলকাতা থেকে শ্রী দীনেশচন্দ্র সিংহ 'কবিয়াল–কবিগান' নামে যে গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন তা পড়ে এবং ঈশ্বরগুপ্ত ও তাঁর উত্তরসূরি গবেষকদের রচনা থেকে যে প্রমাণ আমরা পাই তাতে পূর্ববাংলার তথা বর্তমান বাংলাদেশের কবিগানকে পশ্চিমবাংলার ধার করা বলে মনে হয় না। সে সময় পূর্ববাংলার প্রায় সব কটি জেলাতেই প্রখ্যাত ও প্রতিষ্ঠিত অনেক কবিয়ালের পরিচয় পাওয়া যায়। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন তাঁর 'হারামণি'র সপ্তম খণ্ডে বাংলাদেশের কবিগান ও কবিয়ালদের সম্পর্কে যেসব তত্ত্ব-তথ্য সংযোজন করেছেন তা সর্বজনগ্রাহ্য ও স্বীকৃত।

'বাংলা কবিগানে রমেশ শীল, বিজয় সরকার ও স্বরূপেন্দু সরকার' শিরোনাম অভিসন্দর্ভটি যথাযথ তথ্য-উপাত্ত বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে মোট ছয়টি অধ্যায়ে প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়-এর শিরোনাম 'বাংলা কবিগান ও তার উন্মেষকাল' : এই অধ্যায়ে কবিগানের স্বরূপ ও প্রকৃতি এবং বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কবিগানের বিষয়, সুর, সময়, শিল্পী, পৃষ্ঠপোষকতা,উদ্ভাবক ও উদ্ভবকাল নিয়ে আলোচনাও এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়-এর শিরোনাম 'বাংলা কবিগানের বিকাশকাল' : এই অধ্যায়ে কবিগানের বিকাশকালীন সময়ে পূর্ববঙ্গ পর্বে ও কোলকাতা পর্বে কবিগান ও কবিয়ালদের ভূমিকা এবং এই সময়ে কবিগানের

গঠনগত, বিন্যাসগত, প্রকরণগত, ব্যবস্থাপনাগত বিষয়গত, সুরগত, রুচিগত ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়-এর শিরোনাম 'বাংলা কবিগানের ধারায় রমেশ শীলের ভূমিকা' : যাতে কবিয়াল রমেশ শীলের জন্ম-পরিচয়, কর্মজীবন, সংগীতজীবন, সাহিত্যকর্ম বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া গানের ভাব, ভাষা, আঙ্গিক, কাঠামো, চিন্তা-চেতনা এবং কবিগানের ক্ষেত্রে রমেশ শীলের ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

'বাংলা কবিগানের ধারায় বিজয় সরকারের ভূমিকা' শীর্ষক চতুর্থ অধ্যায়ে বিশিষ্ট কবিয়াল বিজয় সরকারের জীবন ও তাঁর কবিগান নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। বিজয় সরকারের গানের ভাবকাঠামো, সংগীতদর্শন এবং চিন্তাচেতনা এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

বাংলার অন্যতম বিশিষ্ট কবিয়াল স্বরূপেন্দু সরকার আলোচিত হয়েছেন 'বাংলা কবিগানের ধারায় স্বরূপেন্দু সরকারের ভূমিকা' শীর্ষক পঞ্চম অধ্যায়ে। কবিয়াল স্বরূপেন্দু সরকারের সংগীতজীবন, তাঁর গানের দর্শন-রীতি এবং তাঁর সাহিত্যকর্ম বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম 'বাংলা কবিগানের বর্তমান অবস্থা ও সম্ভাবনা'। সরল, সাদামাটা মানুষের গান হিসেবে বাংলার কবিগান সর্বজননন্দিত শিল্প-নিদর্শন। এ গান মানুষের কথা বলে। এই সংগীতধারায় পল্লিমানুষের স্বভাবজাত মানবমিলনকামী জীবনদর্শনের বাণী উচ্ছ্বসিত হয়। লোকসংগীতের এই ধারাটির বর্তমান অবস্থার কথা তুলে ধরা হয়েছে এই অধ্যায়ের আলোচনায়। দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে সম্পৃক্ত আত্মানুসন্ধানের এই পথযাত্রা যাতে আমাদের সংস্কৃতিকে নিরন্তর ঋদ্ধ করে রাখতে পারে– কবিগানের সেই সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণার আলোকে সম্ভাব্য কিছু প্রস্তাবনা তুলে ধরা হয়েছে আলোচ্য অধ্যায়ে। প্রস্তাবনাগুলোর মধ্যে রয়েছে কবিগানের প্রচার, প্রসার, সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ বিষয়ে আশু দৃষ্টিপাত করা– ইত্যাদি বিষয়।

বর্তমান গবেষণার 'উপসংহার' অংশে গবেষণায় উঠে-আসা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। গবেষণায় আলোচিত তিনজন বিশিষ্ট কবিয়ালের প্রভাববিস্তারী ভূমিকা ও তাঁদের সংগীতদর্শন ও মানবমুখী কল্যাণচিন্তা বিষয়ে গবেষণায় প্রাপ্ত নির্দেশক বিষয়গুলো আলোচ্য অংশে তুলে ধরা হয়েছে। কবিগানের ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখতে হলে করণীয় বিষয়গুলোর নির্যাস এই অংশে তুলে এনে কবিগানের প্রচার-প্রসার বজায় রাখার বাস্তবতা এই অংশের আলোচনায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

গবেষণার সর্বশেষ অংশ হিসেবে সংযোজিত 'পরিশিষ্ট' অংশে চারজন বিশিষ্ট কবিগান-গবেষকের সাক্ষাৎকার উপস্থাপন করা হয়েছে। কবিগান-গবেষকগণ হলেন, যথাক্রমে : ১. যতীন সরকার, ২. কাজল অধিকারী, ৩. মহসিন হোসাইন ও ৪. স্বরোচিষ সরকার।

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত কবিয়ালগণের কিছু আলোকচিত্র এই অংশে সংযুক্ত করা হয়েছে। পরিশেষে রয়েছে গ্রন্থপঞ্জি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাংলা কবিগান ও তার উন্মেষকাল

লোকসংস্কৃতির একটি অন্যতম উপাদান লোকসংগীত। লোকসংগীত চিরায়ত ও বৈচিত্র্যময়। বাংলার পরতে পরতে যেমন ছোট-বড় নদী-নালা স্রোতের জাল বিছিয়ে দিয়েছে তেমনি রয়েছে গানের স্রোত। কৃষিজীবী জনসমাজের সংস্কারজাত চিন্তাভাবনা বার মাসে তেরো পার্বণের উৎসব অনুষ্ঠানে, বাংলার নিসর্গশোভা নদী-নৌকা, মাঝি-মাল্লা, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, দুঃখ-দারিদ্র্য, সমাজের অন্যায়-অবিচার, রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পৌরাণিক কাহিনি ও অলৌকিক বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে গ্রামবাংলার নিরক্ষর মানুষ গান বেঁধেছে। এসব গানের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ও জনপ্রিয় ধারা কবিগান।

গীতিকবিতা বাংলা সাহিত্যের আদিরূপ। আধুনিক সময়ে সেই গীতিকাব্যকে এক নতুন রূপ দিয়েছে কবিগান। কবিগান গ্রামীণ মানুষের আনন্দকে ফুটিয়ে তোলে ফুলের মতো। বেদনা যেন সেতারের করুণ সুরমূর্ছনা। কবিগানে জটিল প্রসঙ্গ অত্যন্ত সরলভাবে কাব্য, ছড়া, গল্প, গান প্রভৃতির মাধ্যমে উত্থাপিত হয়। কবিগান অতি সহজে কঠিন কথা বলে দেয়, অনেক জটিল সমস্যা মিটিয়ে দেয়, অনেক অজানা বিষয় জানিয়ে দেয়। কবিগান অসীম উদার; জাতপাত বর্ণগোত্র নির্বিশেষে গণমানুষের এক উপভোগী বিষয়। কবিগান বাঙালির প্রাণের সামগ্রী এবং তা বাস্তব জীবনানুভূতি সমৃদ্ধ লোকায়ত সংস্কৃতির মহামূল্য সম্পদ।

গান ও কবিতার যে-যুগ্ম সৃষ্টি কবিয়ালদের, তারই প্রচলিত নাম 'কবিগান'। কবিগান এমন এক ধরনের প্রতিযোগিতামূলক গান, যাতে তাৎক্ষণিকভাবে রচিত ছড়া ও গানের মাধ্যমে দুই দল গায়ক প্রথমে পালাক্রমে এবং শেষে সম্মিলিতভাবে পরিবেশন করেন। গানে একজন আরেকজনকে আক্রমণ করেন অথবা প্রশ্ন ছুড়ে দেন এবং অপরজন গানের মাধ্যমে সেই আক্রমণের উত্তর দেন। প্রত্যেক দলের দলপতিকে কবিয়াল বা সরকার বলা হয়। তিনি মুখে মুখে পদ রচনা করেন ও তাৎক্ষণিকভাবে সুরারোপ করেন। দলের সংগীত-সহযোগীদের নাম দোহার। দলের যন্ত্রসংগীত-বাদকদের মধ্যে ঢুলিই প্রধান। অন্যান্য যন্ত্রকারীদের মধ্যে কাঁসিবাদক, করতালবাদক, বংশীবাদক, বেহালাবাদক, হারমোনিয়াম বাদক প্রমুখ। কম-বেশি দশ সদস্য নিয়ে এ দল গঠন করা হয়।

কবিগানকে মোটামুটি চারটি পর্যায়ে ভাগ করে বর্ণনা করা যায়। প্রথম ভাগে থাকে প্রতিযোগিতাহীন গান– যার মধ্যে রয়েছে বন্দনা জাতীয় ডাক, মালশি, ভবানীবিষয়ক, আগমনী, গৌরবন্দনা, দেশবন্দনা প্রভৃতি নামের গান, এবং কালনির্দেশক ভোর, গোষ্ঠ প্রভৃতি নামের গান। দ্বিতীয় ভাগে থাকে সংগীতের মাধমে প্রতিযোগিতা– যার মধ্যে রয়েছে সখীসংবাদ, বিরহ, বসন্ত, কবি বা লহর কবি প্রভৃতি শ্রেণির গান। এই দ্বিতীয় ভাগের গানের অভ্যন্তরে প্রশ্ন থাকে, তাৎক্ষণিকভাবে সেইসব প্রশ্নের জবাব রচনা করে প্রতিপক্ষকে তা পরিবেশন করতে হয়। তৃতীয় ভাগে থাকে মূল পর্ব– এই পর্বে টপ্পা জাতীয় গানের মধ্য দিয়ে দ্বন্দ্বপূর্ণ কাল্পনিক চরিত্রে কবিয়ালদ্বয় নিজেদের আরোপিত করান এবং ধুয়া গান ও ছড়া কাটা বা পাঁচালির মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে তাঁরা প্রশ্নোত্তর বা বিতর্ক চালিয়ে যান। সবশেষ ভাগটি হল বিরোধ-মিলনাত্মক জোটের পাল্লা, জোটক বা মিলনগীতি– এই অংশে কবিয়ালদ্বয় সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে নির্দিষ্ট গানের সুরে সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ছড়া কাটার মাধ্যমে প্রশ্নোত্তর ও বিতর্ক চালিয়ে যান।[১]

১. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ১০

Dhaka University Institutional Repository

ডাক

'ডাক' শব্দের অর্থ আহ্বান। প্রথমে একটি দল আসরে দাঁড়িয়ে আসর-বন্দনা রূপে পূর্বরচিত একটি 'ডাক' বা সমজাতীয় গান দিয়ে কবিগানের সূচনা করে। এ সময়ে সাধারণত একাধিক দোহার আসরে দাঁড়ান এবং দোহারগণ কমপক্ষে একবার করে প্রত্যেক প্রতিটি কলি গেয়ে থাকেন। বিশ শতকের সূচনার কবিগান সাধারণত গভীর রাত বা ভোররাতে শুরু হত। ডাক গানের উচ্চ সুর বাদ্যযন্ত্রের ঐকতানের সঙ্গে মিলে যে উচ্চরব সৃষ্টি করে, কবিগানের আসরে তা শ্রোতাদের আকৃষ্ট করে। ডাক গান সাধারণত চিতান এবং অন্তরা– এই দুই তুক দিয়ে তৈরি। কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে 'অন্তরা' নামের তুক 'ঝুমুর' নামে এবং বাগেরহাট অঞ্চলে 'অন্তরা' নামের তুক 'চালক' নামেও চিহ্নিত হয়ে থাকে। প্রতিটি তুকে যে কয়টি চরণ থাকে, তার প্রতিটির শেষ ধ্বনিতে মিল থাকে।[২] অর্থাৎ সম্পূর্ণ গানটির অন্ত্যমিল দুই ধরনের : এক জাতীয় মিল চিতানের চরণগুলোর শেষের মিল, আর এক জাতীয় মিল অন্তরায় প্রতিটি চরণের শেষের মিল। উনিশশতকের দিকে এই গানগুলো স্বল্পপরিসর ছিল, বিশ শতক নাগাদ তা দীর্ঘতর হয়ে উঠতে থাকে।

ডাক গানের সুর অনেক সময়ে রাগ-রাগিণী নির্ভর হয়। যেমন রাজেন্দ্রনাথ সরকার তাঁর গানগুলোকে ইমন-কল্যাণী, কল্যাণী, কামোদ, ঝিঁঝিট, ঝিঁঝিট কাম্বাজ, পঞ্চম, বিভাস, মালসী, লগনী প্রভৃতি রাগিণীতে পরিবেশন করতেন। ডাক গানের তাল চিতান তুকের জন্য এক এরকম এবং অন্তরা তুকের জন্য এক রকম। যেমন চিতান যদি আড়খেমটা তালে হয়, অন্তরা হয় কাহারবায়; চিতান যদি হয় কাশ্মীরি তালে, অন্তরা হয় ঠুংরি বা তেলেনায়; চিতান যদি কাওয়ালিতে হয়, অন্তরা হয় তেলেনায়; চিতান যদি কাহারবা বা মাস্টার আড়ায় হয়, অন্তরা হয় তেলেনায়; আবার চিতান যদি আড়খেমটা বা একতালায় হয়, অন্তরা হয় ঠুংরিতে বা কাওয়ালিতে।

এই জাতীয় গানের কথাবস্তুতে আরাধ্যের প্রতি আহ্বানমূলক বা আবাহনমূলক বাক্য থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কালী অথবা দুর্গা এই গানের আরাধ্য।[৩] তবে বিশ শতকের সূচনায় অন্যান্য আরাধ্য দেবদেবীকে নিয়ে এবং কখনো কখনো ঈশ্বরকে নিয়েও ডাক গান রচিত হয়। যেমন উনিশ শতকে রচিত কোলকাতার চিন্তামণি ময়রা রচিত এই গানটি :

> "জয়ন্তী মঙ্গলা জয়া তুমি গো যোগেশ্বরী যোগাদ্যে।
> ত্রিতাপহারিণী ত্রিগুণধারিণী ত্রিদিবারাধ্যে ॥
>
> তুমি তারা পরাৎপরা কঙ্কালী কালরূপধরা
> অসীতে রূপধারিণী তন্ত্রে মন্ত্রে অধিষ্ঠাত্রী শিবানী।
> বিশ্বজয়ী বিশ্বরূপ দৈত্যদল দুর্গারূপ
> (আবার) অমলে-কামিনী রূপ হও গো জননী ॥"[৪]

এর সঙ্গে তুলনা করা যায় বিশ শতকে রচিত বাগেরহাটের কবিয়াল রাজেন্দ্রনাথ সরকারের এই ডাক গানটি :

> "বিভু তুমি সর্বাধার, সাকার নিরাকার যিশু আল্লা বুদ্ধ হরি।
> অনন্ত ভাবতে ভাবিতে ভাবিতে জন্মিয়া যেন মরি।
> আমি ক্ষুদ্র সংস্কারে গড়ায়ে আমারে সেই অনুতাপ করি ॥
> তুমি অনাদির আদি অনন্ত উপাধি, অনন্ত ব্যাধি অনন্ত ঔষধি।
> অনন্ত নদী অনন্ত জলধি, তাতে অনন্ত লহরি।

---

২. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ১২
৩. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ১৩
৪. সংকলিত, নিরঞ্জন অধিকারী, *উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য*, পৃষ্ঠা ২৮০

Dhaka University Institutional Repository

আমার প্রাণটি লও মিলায়ে অনন্ত নিলয়ে যেন সর্বমন্ত্রে তোমায় হেরি ॥
তুমি শিবলিঙ্গ, শালগ্রামের প্রস্তর, অশ্বত্থ তুলসী বৃক্ষ রূপ ধরো।
কালী কৃষ্ণ রবি ব্রহ্মা বিষ্ণু হল, তুমি গজানন গৌরী।
তুমি সকল নামেতে সকল প্রেমেতে, শুধু বলবো কেন গৌরহরি ॥"[৫]

মালশি

ডাক গান পরিবেশনের পর প্রায় একই নিয়মে একটি মালশি গান পরিবেশন করা হয়। মালশি গানগুলো ডাক গানের চেয়ে দীর্ঘতর হয়। এই গান পরিবেশনের সময়ে কবিয়ালকে দোহারদের পেছনে দাঁড়াতে হয় এবং গানের কলি বলে দিতে হয়। পূর্বনির্ধারিত সুরে দোহারগণ তা পরিবেশন করেন। তাছাড়া কলিগুলো উচ্চারণের ঝোঁক ও ভঙ্গি থেকে দোহারগণ সংশ্লিষ্ট কলির সুর বুঝে নেন। কালী বা দুর্গা উভয় দেবীর উদ্দেশে মালশি গান রচিত হয়ে থাকে। অঞ্চলভেদে কখনো কখনো শুধু কালীবিষয়ক গানকে মালশি গান এবং দুর্গাবিষয়ক গানকে ভবানীবিষয় গান বলা হলেও বিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ উভয় ধরনের গান মালশি গান নামে পরিচিতি পায়। কালী বা দুর্গাকে নিবেদিত হলেও এই গানগুলোর মূল বক্তব্য বৈচিত্র্যপূর্ণ। আঠারো-উনিশ শতকে এই শ্রেণির গানে আদ্যাশক্তির প্রতি গায়কের নানা ধরনের প্রার্থনা ও আকৃতি, অভিযোগ ও অভিমান, মহিমা ও গুণকীর্তন স্থান পেত। কিন্তু বিশ শতক নাগাদ গানগুলোর কথাবস্তুতে বহুমাত্রিক পরিবর্তন ঘটে। কখনো কখনো দুর্গা বা কালীর একটু-আধটু উল্লেখ থাকলেও দেখা যায় সমকালীন রাজনীতি, আর্থসামাজিক অবস্থা, দৈব-দুর্বিপাক, ঘটনা-দুর্ঘটনা, জনপ্রিয় ব্যক্তির কীর্তি বা অপকীর্তি প্রভৃতি বিষয় গানগুলোর কথাবস্তুতে পরিণত হয়েছে।

'মালশি' শব্দটি মালব বা মালবশ্রী শব্দের অপভ্রংশ হওয়া সম্ভব। তাই এমন অনুমান করা চলে যে, উনিশ শতকের কোনো এক পর্যায়ে এই শ্রেণির গান ব্যাপকভাবে মালব বা মালবশ্রী রাগে গীত হত এবং তার ফলে রাগটির নামের অনুসরণে গানগুলো মালশি নামে পরিচিতি পায়।[৬] মালশি গানের তুক বা স্তবকসংখ্যা কম-বেশি ১২টি। নিম্নে গোপালগঞ্জের কবিয়াল মনোহর সরকারের একটি মালশি উদ্ধৃত করা হল :

"চিতান তারা জন্ম নিয়ে ভূমণ্ডলে মা তোর কোলে পেলাম কতো সুখ।
পাড়ন কতো সুমিষ্ট ফল খেয়েছি, শান্তির কুটির পেয়েছি
মাগো তোর দয়ায় সুখে আছি, দেখিতেছি ভবে পুত্রকন্যার মুখ ॥

১ম ফুকার মাগো বাল্য আর যৌবনারম্ভে ছিলাম মা তোর কোলে
শেষে মহামায়ার কোলে দিয়ে কোলছাড়া করিলে।
আমার আর কি সেদিন আসবে ফিরে
বসবো মা তোর কোলের পরে
আধো আধো মধুর স্বরে আর কি ডাকবো মা বোল বলে ॥"[৭]

ভোর-গোষ্ঠ

মালশি গানের মতো এগুলোও একতরফা গান। অর্থাৎ প্রথম পক্ষ এ ধরনের কোনো গান পরিবেশন করলেও দ্বিতীয় পক্ষকে তার পাল্টা গান গাওয়ার বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়তে হয় না। একমাত্র বিষয়বস্তুগত তফাত থাকার কারণে গানগুলো মালশি গানের থেকে আলাদা নামে চিহ্নিত হয়ে থাকে।

---

৫. সংকলিত, মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন-*হারামণি*-১০ম খণ্ড (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪), পৃষ্ঠা ২৪৬
৬. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ১৪
৭. সংকলিত, দীনেশচন্দ্র সিংহ, *পূর্ববঙ্গের কবিগান : সংগ্রহ ও পর্যালোচনা*, পৃষ্ঠা ১০৬

Dhaka University Institutional Repository

মালশি গানের বিষয় যেমন শাক্ত, তেমনি ভোর ও গোষ্ঠ গানের বিষয় বৈষ্ণবীয়। ভোর নামে পরিচিত গানগুলোতে সাধারণত রাধাকৃষ্ণের মিলন, বিরহ, বিলাপ প্রভৃতি প্রসঙ্গ স্থান পায়; অন্যদিকে গোষ্ঠ নামে পরিচিত গানগুলোতে সাধারণত রাখালদের সঙ্গে কৃষ্ণের গোচারণ এবং কৃষ্ণের প্রতি মা যশোদার স্নেহের বিষয় প্রাধান্য পায়।[৮] কোনো কোনো ভোর-গোষ্ঠ গান চৈতন্যদেব ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে নিয়ে, আবার কখনো তা রাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে নিয়ে রচিত হয়ে থাকে। বিশ শতকের একাধিক কবিয়াল পৌরাণিক প্রসঙ্গ ছেড়ে একেবারে সমকালীন বিষয় নিয়ে ভোর নামের গান পরিবেশন করেন। উদাহরণ হিসেবে নরসিংদীর হরিচরণ আচার্যের 'স্বদেশী ভোর' নামের গানটি কথা স্মরণ করা যায়। সঙ্গত কারণে সেখানে পৌরাণিক কাহিনিনির্ভর বিরহ-মিলনের পরিবর্তে ব্রিটিশ-বিরোধিতা ও দেশমাতৃকার প্রতি ভালোবাসা মুখ্য হয়ে ওঠে। গানটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হল :

"চিতান গেলো ভারতের তামসী নিশি দুঃখের শেষ সীমায়।
পাড়ন ঘোর বিলাসী শশী, শশী মুখে মেখে মসী
নিশি অন্তে অস্তাচলে যায় ॥
১ম ফুকার উষা ভক্তি নবশক্তি ভারতে উদিল, অসার আমোদ কুমুদ মুদিল
ছুটল জ্ঞান সরোজের কি সুগন্ধ উঠল সূর্য সদানন্দ
যতো ভারতের পাপ-পেছক মন্দ, অন্ধ হয়ে তারা লুকানো ॥
মিশ তোমরা জন্মেছ স্বর্গতুল্য ভারতভূমে
কুম্ভকর্ণের ন্যায় এতো ঘুমে বলো কতো রবে।
মুখ জাগো ভারতবাসী, স্মরণ করো আর্য ঋষি, কার্যক্ষেত্রে চলো সবে ॥
প্যাঁচ ব্রাহ্ম মুহূর্তে ভ্রাতৃবর্গ শিখ ধ্যানের নিয়ম
জপো অন্তরে মূল মন্ত্র-বন্দে মাতরম্
ফুল তুলে নানা জাতি জ্বালো ধূপ ও ঘৃতের বাতি
ভারতমাতার মঙ্গল আরতি করো ভক্তিভাবে।
খোচ যতো কর্মী সব কর্ম করো ধর্ম লোভে ॥
২য় ফুকার পড়ো ছাত্রগণ সূত্র ব্যাকরণ, পড়ো স্মৃতি বেদ
ছাড়ো অন্য বিদ্যা অসার ক্লেদ
ছাড়ো এন্ট্রান্স এলএ বিএ এমএ, প্রণাম দাও গোলামির নামে।
আছে গীতা ভাগবত ভারতভূমে, জ্যোতির্বেদের অঙ্গ আয়ুর্বেদ ॥
মিশ কেন স্বদেশের উচ্চ শিক্ষা তুচ্ছ করো
সংস্কৃত টোল অলংকৃত করো অকৈতবে।
খোচ যতো কর্মী সব কর্ম করো ধর্ম লোভে ॥
অন্তরা জাগো পৃথিবীর যতো কর্মবীর, স্থির করো নন-কোপারেশন।
প্রাতঃস্নান করে দেশি বস্ত্র পরে পবিত্র করো অন্তঃকরণ।
ভোরে পড়ো নিতাইগৌরাঙ্গচরিত
কেমন ত্যাগ স্বীকার করে করলো দেশের হিত।
যৌবনে যোগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া ধনী স্মরো সেসব কুললক্ষ্মীগণ ॥
পরচিতান ছাড়ো অলসতা বিলাসিতা উঠো ভ্রাতৃগণ।

পরপাড়ন মাতৃস্নেহ পাবে কর্ম করো ধর্ম ভেবে
আর কতোকাল রবে অচেতন ॥
শেষ ফুকার ছাড়ো হিংসা দ্বেষ জাগাও নিজের দেশ দেশের দেশিগণ।

৮. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ১৭

Dhaka University Institutional Repository

হবে দুর্দিনের পরিবর্তন।
ছেড়ে প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা সত্যধর্মে রাখো নিষ্ঠা
কিন্তু সকল ধর্মের প্রাণপ্রতিষ্ঠা, যুগধর্ম নামসংকীর্তন ॥
ছুট্টি পাবে সদাত্মা মহাত্মাদের সৎ সাহায্য
অসার ভোগ ত্যেজে ত্যাগের রাজ্যে কার্যে চলো সবে ॥"[৯]

সখীসংবাদ

কবিগানের অন্যতম প্রধান সখীসংবাদ। কবিগানের এই অংশ থেকে কবিগানের সংগীত প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এক দল আসরে এসে এই ধরনের একটি গান পরিবেশন করলে অন্য দলকে আসরে এসে তার জবাব রচনা করে গাইতে হয়। পুরোপুরিভাবে রাধাকৃষ্ণভিত্তিক এই গানে প্রায় ক্ষেত্রে রাধা বা কৃষ্ণ তার সখীদের নিকটে অথবা সখীদের মাধ্যমে রাধা বা কৃষ্ণ পরস্পরের নিকট ভাবের আদান-প্রদান করে থাকে বলে গানগুলোর নাম হয়তো এমন হয়েছে। বৈষ্ণবীয় আবহের এই গানের রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনির বিভিন্ন পর্যায়ের অনুসরণে সখীসংবাদ গানের বিভিন্ন রকম নাম হয়, যেমন– পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, মান, আক্ষেপ, কলহান্তরণ, প্রেমবৈচিত্ত্য, বিরহ, মাথুর, মিলন প্রভৃতি। সুবল সংবাদ, উদ্ধব সংবাদ, প্রভাস যজ্ঞ, বসন্ত প্রভৃতি নামের গানকেও সখীসংবাদ গানের অন্তর্ভুক্ত ধরা যায়, যদিও এসব গানে সখীর পরিবর্তে সখার উপস্থিতি স্পষ্টত লক্ষণীয়। অর্থাৎ লিঙ্গভেদ নয়, কবিগানের রাধাকৃষ্ণবিষযক গানগুলোই সখীসংবাদ নামে পরিচিত।[১০] এগুলোর মধ্যে 'বসন্ত' গানের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সরস্বতী পূজার আগে এই গান গাওয়ার রীতি নেই। খুব প্রতিভাবান কবিয়াল ছাড়া এই ধরনের গান রচনা করা বা জবাব রচনা করা এবং এই গান পরিবেশন করা খুবই কঠিন কাজ। রাধাকৃষ্ণের কাহিনির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্ক না থেকেও অনেক গান সখীসংবাদ হিসেবে পরিচিত পায়। রাজেন্দ্রনাথ সরকারসহ একাধিক কবিয়ালের 'জানকীর ফুলসজ্জা' নামের সখীসংবাদ এর উজ্জ্বল উদাহরণ। নিশিকান্ত সরকারের একটি সখীসংবাদ এবং তার জবাব উদ্ধৃত করা হল :

নিশিকান্ত সরকারের 'মানযোগী' শীর্ষক সখীসংবাদ

"চিতান করে চন্দ্রার বাড়ি লীলাসাঙ্গ যোগী সেজে শ্যাম ত্রিভঙ্গ
প্রভাতে মানকুঞ্জে উদয়।
পাড়ন দখে নূতন যোগী বিষয়ত্যাগী লম্পট গোবিন্দে
দুঃখের দূতী বৃন্দে ব্যঙ্গ করি কয় ॥
১ম ফুকার তোমার ভিতর কালা বাইরে রাঙা ঠিক যেন দেখিতে মাকাল।
যেমন ধুলা মেখে সাজে সাধু মাঠের গো-রাখা।
দেশগাঁয়ে সাধু কোলায়, না বাঁচলে পেটের জ্বালায়।
যেমন দায়ে ঠেকিলে চিঁড়ের ছালায় পাছে হয় বৈরাগী নাকাল ॥
মিশ সাধুর কোন দেশে ধাম, ধরো কী নাম, কী মনে করে
এলে কুঞ্জের দ্বারে নিশি ভোরে কও দেখি রথে কিংবা পায়ে হেঁটে।
মুখ আজি পূর্ণিমার নিশি কোন আশ্রয়ে উপবাসী রজনী কাটে ॥
প্যাঁচ ভবে যোগীগণের শুদ্ধমতি, যোগবলে মুখে ফোটে ব্রহ্মজ্যোতি
তোমার সে চিহ্ন নাই মোটে।
কতো ক্ষতচিহ্ন হচ্ছে লক্ষ পক্ব বিম্ব ঠোঁটে।
ভালো নাই চন্দনের ফোঁটা, সিন্দুরের তিলক কাটা
এক কচি সাধুর রূপের ছটা, কলঙ্কী চাঁদ লোটায় মাথা কুটে।

---

৯. হরিচরণ আচার্য, *কবির ঝঙ্কার*, ১ম খণ্ড– পৃষ্ঠা ৩০

১০. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ১৯

মিশ দেখে তোমার মলিন মুখ, দুঃখে বুক ফাটে ॥
২য় ফুকার পরে যোগীগণে গৈরিক বস্ত্র তোমার তো দেখি না তেমন
তুমি কোন আশ্রমের নীলকাপুড়ে সাধু মহাজন।
করেতে নাই কোদণ্ড, আছে এক বাঁশের খণ্ড
পেয়ে দুর্দিনে কোন দুর্দণ্ড করেছে সর্বস্ব হরণ ॥
মিশ তোমার দশা দেখে কষাঘাতে অন্তরে জাগে
বুঝি পড়েছো কি কর্মভোগে, করিলে মাথামুণ্ডন দোষ কাটে।
মুখ আজি পূর্ণিমার নিশি কোন আশ্রয়ে উপবাসী রজনী কাটে ॥
অন্তরা থাকিতে ভোগবিলাস ভক্তদাস, কি আশে সন্ন্যাসে দিয়েছো মন।
কিসের অপরাধে বেড়াও কেঁদে গো হয়েছে সুধাহীন বিধুবদন।
দিয়ে চোরের নৌকায় সাধুর নিশান ঘোরো দেশবিদেশ
যেমন আঠা-মাখা জটাধারী ঈশান ব্যোমকেশ।
তোমায় মানায়েছে বেশ।
তোমার এই বৈরাগ্যের বিধিনির্দেশ গো
আছে কি পুনর্বার গৃহে গমন ॥
পরচিতান যেন বিষের কুম্ভ দুগ্ধে ঘেরা তেমনি তোমার এই চেহারা।
ঠিক যেন বিষামৃতময়।
পরপাড়ান কেন ভোজের বাজি দেখাও আজ ব্রজগোপীকে
এসব দৃশ্য দেখে ঘোচে না সংশয় ॥
শেষ ফুকার তাকাও আড় নয়নে সবার পানে, মনে হয় তোমাকে দেখিলে।
যেমন উপবাসী রক্তপস্বী সরসী সলিলে।
ঠারো চোখের আড়াল থেকে সাজিয়ে ময়ূর পাখে
যদি কাক পড়ে স্বজাতির ঝাঁকে, ঠোকর আর নখের আঁচড় মিলে ॥
ছুট্টি সাধুর কোন দেশে ধাম, ধরো কী নাম, কী মনে করে
এলে কুঞ্জের দ্বারে নিশি ভোরে কও দেখি রথে কিংবা পায়ে হেঁটে ॥"

নিশিকাণ্ড সরকারের এই 'মানযোগী' শীর্ষক সখীসংবাদের নকুলেশ্বর সরকার কৃত জবাব নিম্নরূপ :

"চিতান তখন বৃন্দার মুখে নিন্দা শুনে রাগে রাগে শীগোবিন্দ কয়।
পাড়ন ও তুই রক্ষক হয়ে ভক্ষক হলি তক্ষকের মতো
অযুক্তি যতো করলি অভিনয় ॥
১ম ফুকার যেদিন শ্রীরাধিকার দুর্জন মানে পায় না শ্যাম মানসাগরে কুল।
বৃন্দা ভেলা সমতুল।
যোগী সাজায়ে তারে আনিলেন কুঞ্জের দ্বারে
এখন সেই বৃন্দা চিনে না তারে, কবির এই কল্পনাই ভুল ॥
২য় ফুকার ও তুই রাধার মন ভাঙ্গিবার ছলে আমাকে যোগী সাজালি
কতো সান্ত্বনা দিলি।
রাইকে কও মান করিতে আমায় কও পায়ে ধরিতে
যেমন আগুন দিয়ে খড়কুটাতে পেতনি তুই সরে দাঁড়ালি।
মিশ ও তুই ছল করে সাজালি আমায় নবীন যোগীর সাজ
সাজের ভালো মন্দ বেশকারীর কাজ
আমি কি নিজের হাতে সেজেছি।

মুখ বৃন্দা তুই করে ছলা দিলি আচল ঝোলা হাড়ের মালা
তাইতো পরেছি ॥
প্যাঁচ বললে কাইল গিয়েছে পৌর্ণমাসী, কার কুঞ্জে ছিলাম উপবাসী
এ কথা বলো অকারণ।
আমি উপবাসী থাকবো কেন থাকতে আয়োজন।
আমি শেষ করে গোষ্ঠখেলা আসিতে সন্ধ্যাবেলা
দেখা চন্দ্রার বাড়ি সাধুর মেলা সেখানে মহাপ্রসাদ পেয়েছি।
মিশ দেখে তোমার মলিন মুখ, দুঃখে বুক ফাটে ॥
৩য় ফুকার বললে, দায় ঠেকে বৈরাগী নাছাড়, স্বীকার এই বৃন্দের রূপসী।
ঠেকে হলেম সন্ন্যাসী।
তুই পারো দায় ঠেকাতে, তুই পারো দায় মেটাতে
এস কুটিল বিদ্যায় এ জগতে বৃন্দা তুই নারদের মাসী ॥
৪র্থ ফুকার বললে, নাই তোমার করঙ্গ দণ্ড, কোন ভণ্ডে নিয়েছে লুটি
তুই এই কুচক্রের ঘুঁটি।
তুই যখন নিজের করে যোগী সাজালি মোরে
যদি সাজে কোনো অভাব পড়ে, সেটা তো বেশকারীর ত্রুটি ॥
৫ম ফুকার দিলে চোরের নৌকায় সাধুর নিশান, তাই শুনে হয়েছি অবাক।
ও তুই বক সাজালি কাক।
দুর্জয় মান করলো রাধে, ধরা দেই সাধে সাধে
দিয়ে শ্রীরাধার চরণ গারদে এই চোরকে বন্দী করে রাখ ॥
ছুট্টি ও তুই ছল করে সাজালি আমায় নবীন যোগী সাজ
সাজের ভালো মন্দ বেশকারীর কাজ
আমি কি নিজের হাতে সেজেছি ॥"[১১]

সূচনা পর্ব থেকে সখীসংবাদ কবিগানের জনপ্রিয় একটি অংশ। এই জনপ্রিয়তার কারণে অনেক সময়ে শুধু সখীসংবাদ গানই সাধারণের নিকট স্বতন্ত্র পরিচয় লাভ করতে শুরু করে। মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্যের মতো সখীসংবাদকে নির্দ্বিধায় বৈষ্ণব সাহিত্য হিসেবে অভিহিত করা যায়। একইভাবে অন্যান্য শ্রেণির বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রাসঙ্গিকভাবে যেমন লেখকদের জীবনবোধ রাধাকৃষ্ণের ওপরে আরোপিত হয়, সখীসংবাদকে তার থেকে আলাদা ভাবার কোনো কারণ নেই।

কবি বা লহর-কবি

লহর কবি বলতে সাধারণত প্রতিযোগিতামূলক গান বোঝানো হয়। যখন কোনো মালশি'র জবাবে প্রতিপক্ষের মালশি গাওয়ার প্রয়োজন হত, তখন তা-ও লহর মালশি নামে পরিচিত হত। অন্যদিকে কবির লহর মানে হল জোটের পাল্লা, যেখানে উভয় কবিয়াল সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে ছড়া কেটে বিতর্ক করে থাকেন। আসলে লহর শব্দটি লড়াইয়ের সমার্থক। তাই উনিশ শতক থেকে কবিগানের একাধিক অঙ্গের সঙ্গে লহর শব্দটি যুক্ত হয়ে আছে। সাধারণত সমকালীন বা পৌরাণিক কোনো কাহিনির ওপর নির্ভর করে এই জাতীয় গান রচনা করা হয়। বিভিন্ন ধরনের পশুপাখি এমনকি জড়পদার্থ পর্যন্ত এই শ্রেণির গানের বিষয় হয়ে থাকে। বিষয়বস্তু যাই হোক-না কেন, এই গানের কথা, উপস্থাপন ও সুর সবকিছুই হাস্যরসাত্মক ভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়।

---

১১. সংকলিত, দীনেশচন্দ্র সিংহ, *পূর্ববঙ্গের কবিগান : সংগ্রহ ও পর্যালোচনা*, পৃষ্ঠা ৪৮২-৮৩

কবিগানের বিরুদ্ধে অশ্লীলতা ও স্থূলরুচির যেসব অভিযোগ রয়েছে, এইজাতীয় গানের বিষয়বস্তু তার জন্য অনেকাংশে দায়ী বলে মনে হয়। বিশেষভাবে কোলকাতা পর্বে এইজাতীয় গানের চাপান ও উতোরের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ আদিরসের আগমন ঘটত। প্রসঙ্গত উনিশ শতকের কোলকাতার বিখ্যাত কবিয়াল হরু ঠাকুরের কবিগানের উল্লেখ করা যেতে পারে। জানা যায়, তিনি জমিদার নবকৃষ্ণ রায়ের অনুরোধে যেসব কবিগান রচনা করতেন, তার অধিকাংশই ছিল জমিদার-গৃহিণীদের নিয়ে নানা ধরনের আদিরসাত্মক উক্তি ও ইঙ্গিতমূলক।[১২] পূর্ববঙ্গ পর্বে তা খানিকটা হ্রাস পেলেও, একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। জবাবসহ একটি কবি উদ্ধৃত করা হল, মূল গানটি বিজয়কৃষ্ণ সরকারের এবং এর জবাব গানটি স্বরূপেন্দু সরকারের :

"চিতান একজন গরিব মানুষ কেশব ভুঁইয়া
সন্ধ্যার পর বিছানায় শুইয়ে দীনতায় হীনতায় পূর্ণ মন।
পাড়ন অনেক চিন্তার পরে বুড়ো বরে কন্যা দিতে চায়
সংসারের দায় নয়তো টাকা পণ ॥
১ম ফুকার ও সেই খবর পেয়ে বর জুটলো এক কজ্জল বর্ণের লজ্জাহীন বজ্জাত।
ও তার ছেলে মেয়ে আছে ঘরে বউ মরছে হঠাৎ।
বয়স প্রায় ষাটের ঊর্ধ্বে হার মেনেছে সংসার যুদ্ধে
ভোগে আম-বাত রোগে মধ্যে মধ্যে পড়ে গেছে নীচের পাটির দাঁত ॥
মিশ সেই মেয়ের বয়স চোদ্দো বছর সংবাদ পেয়ে তাই।
নিমাই বালা বরের বেয়াই বরকে দেয় মিঠেকড়া সান্ত্বনা।
মুখ বেয়াই হে করি মানা
এমন শরিকনাশা জরিমানা দিতে যেয়ো না ॥
প্যাঁচ তুমি টাকা দিলে হাজার খানেক
বন্ধুবান্ধব নিন্দে তোমায় করবে অনেক
টাকায় কি যৌবন পাওয়া যায়।
হলে দোয়াজবরে কন্যা কিছু মানাতো তোমায়।
ভাবে থাকিলে সমতা প্রাণে আসে মমতা
বেয়াই তোমার নাই কোনো ক্ষমতা
না বুঝে ভাবছাড়া লাফ দিয়ো না ॥
খোচ আমি তোমার আত্মীয় পর ভাবিয়ো না ॥
২য় ফুকার বয়স পঞ্চাশ ঊর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ ধর্মশাস্ত্রের মর্ম তোমায় কই।
হবে যোগে যুক্ত বিষয়মুক্ত স্বভাবে কালজয়ী।
দিনে দিনে দিন ফুরালো কাল পেয়ে কাল ঘনালো
তোমার চুল পাকিলো দাঁত পড়িলো
বেহাই তোমার তা পাকিলো কই।
মিশ মোহের উন্মাদনায় সেজেছো ভাই উন্মত্ত বারণ।
তোমায় বারে বারে করি বারণ
মরণপথে চরণ আর বাড়াইয়ো না ॥
অন্তরা তোমার এই সখের জাল সাপের মাল সাধ করে গলেতে পরিয়ো না।
তুমি যন্ত্রহারা মন্ত্রহারা গো, ভুল করে এই মরণ মরিয়ো না।
তোমার পাক চুলেতে কলপ দিয়ে কালো করলে ভাই
টাক বন্ধ করিবার কোনো ব্যবস্থা তো নাই।

---

১২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, *৪র্থ খণ্ড* (কোলকাতা- মডার্ন বুক এজেন্সি), পৃষ্ঠা ১৬০

তার তো ঔষধ মেলে না।
তুমি বাহিরে যতো সাজ পরো গো
মন্ত্রের কাজ চোখ ঘুল্লিতে সারে না।
নারীর চক্র ভীষণ চক্র বোঝা খুব মুশকিল
তোমায় মুখে যেটুক ভালোবাসবে দিয়ে গোজামিল
তাতো তুমি বুঝবে না।
ব্রজের আয়ান ঘোষের দশা যেমন গো
পরে খায় ঘরের সব মাখন-ছানা ॥

পরচিতান যতো জ্ঞানী মানুষ ধরাতলে দেশকালপাত্র ভেদে চলে।
বেদে কয় সুপণ্ডিত তারে।

পরপাড়ন কতো বোকা লোকে টাকার জোরে সাজে বুদ্ধিমান
তুমি তার প্রমাণ দিলে এবারে ॥

শেষ ফুকার কেন বার্ধক্যে ষোড়শী এনে বড়শি গলে বিঁধতে চাও।
তোমার বড়ো-ছেলের বিয়ের বয়স তারে বিয়ে দাও।
সংসারের বিষম বিষে এ জ্বালা জুড়াবে কিসে
নিয়ে সৎ গুরুর সৎ পরামিশে দেশের মানুষ দেশে চলে যাও ॥"

বিজয়কৃষ্ণ সরকারের এই 'বেয়াইর বিয়ে কবি'-র স্বরূপেন্দু সরকার রচিত জবাব :

"চিতান বেয়াই নিমাই বালা বুদ্ধির ঢেঁকি, বল দেখি বিয়ের বুঝিস কী।
পরপাড়ন আমার টাকাপয়সা যাবে না সাথে, তাই বিয়েতে সুখ করে রাখি ॥

ফুকার তুমি বুড়ো মানুষ দেখে কেন করতেছ তোমার এতো
জানো না শক্তি মোর কতো।
শিখেছি বাণের ভজন, যৌবনশক্তি রসায়ন
বেয়াই তারও খেয়ে তিন চার ডজন
হয়েছি ঠিক যুবকের মতো ॥

মিশ বেয়াই বৃদ্ধ মানুষ দেখে কেন করছো উপহাস।
আমার গায়ে লেগে বসন্তের বাতাস
যৌবনের মৌবনে নিয়েছি ঠাঁই।
বেয়াই হে করি মানা, আমার বিয়েতে বাদ সাধিও না।
বেয়ানের দোহাই ॥

প্যাঁচ আছে ইতিহাসে পুরাকালে অনেকে বিয়ে করতো বুড়াকালে
তাহাতে কম পড়তো না বল।
হতো প্রাণায়ামে আয়ু বৃদ্ধি যৌগিক ক্রিয়ার ফল।
দেখো হক সাহেব বরিশালে আশি বছরের কালে
ও তার দিব্য ছেলে জন্ম নিলে
ঈশ্বর কি আমাকে করবে না তাই ॥

খোচ তোমার কথা শুনে আমার দুঃখের সীমা নাই ॥

২য় ফুকার দেখো আরবে মাবিয়া ছিল বয়স তার সাড়ে চার কুড়ি।
বউ ছিল আশি বছরের বুড়ি।
তার কাছে একদিন গিয়ে এজিদকে জন্মাইয়ে
দিলো এমাম বংশের মাথা খেয়ে, তার সাথে দেবো আজ আড়ি ॥

৩য় ফুকার বললে বেয়াইর নাই কোনো ক্ষমতা, এ কথায় বড়ো ব্যথা পাই।
ক্ষমতা কোনখানে দেখাই।
বেয়াই মোর কথা নিয়ো আর বুঝি এসব কইয়ো।
আমার বেয়ানকে পাঠায়ে দিয়ো শক্তির পরীক্ষা দিতে চাই ॥

৪র্থ ফুকার বললে বড়ো ছেলের বিয়ের বয়স, বেয়াই তুমি তারে বিয়ে দাও।
বেয়াই, এ কেমন কথা কও।
ছেলে পাস করুক বিএ, তারপরে দেবো বিয়ে
তারে বিএ-র আগে বিয়ে দিয়ে ছেলের কি মাথা খেতে চাও ॥

৫ম ফুকার নীচের পাটির দাঁত পড়েছে, এ কথায় বাধালে জঞ্জাল
খুলনা কি গিয়ে বরিশাল
গিয়ে ডেন্টিস্টের ধারে, নতুন দাঁত দেবো জুড়ে
শেষে বেয়ান যদি দর্শন করে, শেষকালে পুড়বে তোমার কপাল ॥"[১৩]

টপ্পা

কবির টপ্পা দিয়ে কবিগানের মূল লড়াই সূচিত হয়। ছড়া কেটে তর্কবিতর্ক করার যে দীর্ঘস্থায়ী আসরগুলো কবিগানের প্রধান অংশ, সেখানে এই ধরনের গানের মাধ্যমে কবিয়ালদ্বয় নিজেরা কোন কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন, তার ঘোষণা দেন। প্রায় ক্ষেত্রেই এই গানের এক বা একাধিক তুকে মূল প্রশ্ন ও জবাবের সারাংশ স্থান পায়। গঠনগত কারণে টপ্পা গানের মধ্যে দুটি চরিত্র খুঁজে পাওয়া যায়, যে চরিত্র দুটিতে কবিয়ালদ্বয় অভিনয় ও তর্কবিতর্ক করেন। স্বাভাবিকভাবেই স্থান, কাল ও কবিয়ালভেদে এই দ্বান্দ্বিক পটভূমি ও চরিত্র বিচিত্র ধরনের হয়ে থাকে।[১৪]

এই গানগুলো সাধারণত চারটি স্তবক বা তুকে বিন্যস্ত থাকে। স্তবকগুলো যথাক্রমে : চিতান, অন্তরা, প্যাঁচ ও মুখ। উনিশ শতকের ময়মনসিংহের স্তবকগুলোর নাম ছিল যথাক্রমে চিতান, পারান, মিল, মহড়া, অন্তরা ও মিল। কবিগানের ডাক, মালশি, সখীসংবাদ, কবি প্রভৃতির তুলনায় কবির টপ্পাও সংক্ষিপ্ততর। এই সংক্ষিপ্ততার কারণে কবিগানের এই অংশের নাম হয়তো টপ্পা করা হয়েছে।[১৫] কবির টপ্পা রচিত হয় কবিয়ালদ্বয়ের তর্কযুদ্ধের সূচনাকারী বক্তব্য দিয়ে, স্বাভাবিক কারণেই যা হালকা মেজাজের হয়ে থাকবে। বিশ শতকের শেষার্ধে দক্ষিণবঙ্গের কবিগানগুলোতে টপ্পা গানের গঠন কেমন ছিল, তা নিম্নোদ্ধৃত টপ্পা থেকে বোঝা যাবে। এখানে একজন কবিয়াল শোভা দেবীর ভূমিকায় এবং অন্যজন গৌরাঙ্গের ভূমিকায় পাল্লা করতে মনস্থ করলে তখন তাঁদের এভাবে টপ্পা রচনা করতে হয় :

"শোভা দেবী (প্রশ্ন বা চাপান)
আমি উপেন্দ্র মিশ্রের ঘরনী শোভা দেবী নাম
বললে স্বপন মাঝে গোপীনাথ, তোমার ঘরে হবে মোর সাক্ষাৎ
ফিরিবে তোমার বরাত, পূরবে মনস্কার ॥
ব্রজে গোপী নিয়ে যাহার খেলা, সেই নন্দলালা যদি তুমি হও
বিষ্ণুপ্রিয়া আর মাকে কাঁদাইয়া কি-বা শান্তি পাও।
হাতে পড়ে শুক সারী, পড়িল যে শ্লোক চারি, এই চার শ্লোকের তাৎপর্য দেখাও।

---

১৩. উদ্ধৃত, স্বরোচিষ সরকার, "কবিগান : অতীত ও বর্তমান", *সাহিত্য পত্রিকা*, ফেব্রুয়ারি- ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ২১৩-২১৭
১৪. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ২৭
১৫. করুণাময় গোস্বামী, *সঙ্গীতকোষ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি), পৃষ্ঠা ২৮

যদি নারীরা সব নরকের দ্বার, শেষের শ্লোকে মাথায় কেন ঝাঁকি দাও।
বিষ্ণুপ্রিয়া আর মাকে কাঁদাইয়া কিবা শান্তি পাও ॥

গৌরাঙ্গ (জবাব বা উতোর)
আমি শোভা দেবীর কল্পনাতে হই শচীর নন্দন।
কতো বুদ্ধি মোর ঠাকুর মাতার, যুক্তি তর্কে যেন ক্ষুরধার।
মনে হয় ঠিক ব্যারিস্টার, আইনে বিচক্ষণ।
দেখ বিষ্ণুপ্রিয়া আর মাতাকে, কও দেখি কাঁদাইব কী কারণ
স্বকর্মের ফলে কাঁদে, প্রারব্ধ কর্ম হয় না তা খণ্ডন।
হাতে পড়ে শুক সারী পড়িল যে শ্লোক চারি বাস্তবতায় বিরুদ্ধাচারণ
আমি করতে তা পারি না বলে, মস্তকে ঝুল হয়েছে সে কারণ
স্বকর্মের ফলে কাঁদে প্রারব্ধ কর্ম হয় না তা খণ্ডন ॥"[১৬]

মালফুকার

উনিশ ও বিশ শতকের বাংলাদেশের কোনো কোনো আসরে কম-বেশি আক্রমণাত্মক অথবা ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক সংক্ষিপ্ত গান পরিবেশিত হত, যা গঠনের দিক দিয়ে টপ্পা গানের মতো হলেও টপ্পার মতো তাতে কোনো প্রশ্ন থাকত না। সমকালীন কোনো বিষয় বা ঘটনাকে বিদ্রূপ করতে অথবা প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করতে এই ধরনের টপ্পা রচিত হত। এসব টপ্পা মালফুকার, রংফুকার, লালীগান প্রভৃতি নামে পরিচিত। কবিগানের পূর্ববঙ্গ-পর্বে বিশেষত পদ্মার উত্তর অঞ্চলের কবিয়ালগণ উভয় ধরনের মালফুকার পরিবেশনে পটু ছিলেন। তাঁরা এটিকে 'কবির দাঁড়া'ও বলতেন। তবে দক্ষিণবঙ্গের কবিগানেও আক্রমণাত্মক মালফুকার লক্ষ করা যায়। কোলকাতার পর্বের কবিগানে এই ধরনের মালফুকার 'খেউড়' বা লাল নামে পরিচিত ছিল। কোলকাতা পর্বে আদিরসাত্মক এই 'খেউড়' গানের গঠন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। তবে পূর্ববঙ্গ পর্বে ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক (হয়তো কখনো কখনো আদিরসাত্মকও) এইসব গানে সাধারণত একটি চিতান বা একটি ফুকার বা একটিমাত্র অন্তরা গাইতে হত। কোথাও কোথাও এইসব ফুকার জোটক বা জোটের পাল্লার কায়দায়ও পরিবেশিত হতে দেখা যায়।[১৭] নিম্নে ময়মনসিংহ অঞ্চলের একটি বিদ্রূপাত্মক মালফুকার এবং দক্ষিণবঙ্গের একটি আক্রমণাত্মক মালফুকার উদ্ধৃত হল।

রামগতি শীলের বিদ্রূপাত্মক মালফুকার :
"আজগুবি এক কাব্যকথা, মন দিয়া শুনো সে সকল। মরি হায় রে।
আষাঢ়ে নূতন ঢলে, সিং মাগুর কৈ কাতলে বেঁধেছে একদল ॥

ঘন্যা, পুঁটা, খাদে দুটা, জজার আর ঘাগটে গায় মূলতানে।
চান্দা, চেলা, ইছা, ঘুঙ্গিয়া, মলা, খৈলা আর চিতল চিতানে।
বোয়াল, লাডি, বাইম, লেডি পাব্যা, এই কয়টা মৈল ভাব্যা, ধরবে কোন স্থানে।
দলের নটুয়া, কড়ি কাটুয়া, মড়ার কাছিম মাঝখানে ॥"[১৮]

মনোহর সরকারের আক্রমণাত্মক মালফুকার ও নকুলেশ্বর সরকারের জবাব :
মনোহর সরকার–
"কুঞ্জবাবুর দল এসেছে তিন মেয়ে সভায় নাচে,

---

১৬. উভয় অংশের রচয়িতা স্বরূপেন্দু সরকার
১৭. হরিচরণ আচার্য, *বঙ্গের কবির লড়াই* (পুনর্মুদ্রণ নরসিংদী : দীপকচন্দ্র দাস, ২০০৬), পৃষ্ঠা ১৫-১৬
১৮. উদ্ধৃত : বিজয়নারায়ণ আচার্য, "রামগতির টপ্পা", *সৌরভ*, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯১৪, পৃষ্ঠা ৫০

রূপে করে ঝলমল, ওরা মেয়ের বলে করে বল।
যে কয়েকটা পুরুষ আছে, থেমে মেয়ের পাছে পাছে
ওদের পুরুষত্ব ঘুচে গেছে, সবাই বলে মেয়ে-দল।

নকুলেশ্বর সরকার–
বললি মোদের দলে মেয়ে আছে, আমরা থাকি মেয়ের পাছে
চিরদিনই মেয়ের জয়, বিশ্ব মেয়ের গুণে সৃষ্টি হয়।
গৃহ হয় গৃহিণীর জন্য, একা সেই গৃহিণী ভিন্ন
থাকতে ধনেরত্নে গৃহ পূর্ণ, তবু গৃহ শূন্য বয় ॥

বললে মেয়ে আছে মোদের দলে, আমরা চলি মেয়ের বলে
জ্ঞানের কর্তা মৃত্যুঞ্জয়, সে মেয়ের পদে শরণ লয়
শতস্কন্ধ বধের কালে, রাম চলেছেন মেয়ের বলে
সেদিন সিতা না অসিতা হলে, শতস্কন্ধ হয় না ক্ষয় ॥

বললি মোদের দলে মেয়ে আছে, অঙ্গভঙ্গি করে নাচে
তাই দেখি আজ করে রোষ, বুঝি দেখালি আজ মেয়ের দোষ।
মেয়ের পেটে জন্ম পেলি, মেয়ের দুগ্ধে প্রাণ বাঁচালি
নইলে তুই কি বড়ো হয়েছিলি, চুষে বাপের... ॥"[১৯]

ধুয়া ও ধুয়া গান

কবিগানের টপ্পা গানের পরে এবং ছড়াকাটামূলক পাঁচালি অংশের মধ্যে এক ধরনের গান উভয়ের অংশের সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে, এই গানের নাম ধুয়া গান। বিশ শতকের প্রথম দিকে বিশেষ কোনো সুরে একটিমাত্র কলি গেয়ে সেই কলির সুর ও তাল অনুসরণ করে কবিয়ালগণ পাঁচালি বলতেন। বিশেষ ঐ কলিটিকে তখন বলা হত ধুয়া বা ডাক-ধুয়া বা দিশা। কিন্তু বিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ পুরো একটি গান ধুয়ার জায়গা দখল করে এবং এভাবে ধুয়া তখন ধুয়া গান হিসেবে পরিচিতি পেতে থাকে। পাঁচালি অংশে কবিয়ালগণ যেহেতু দীর্ঘক্ষণ ধরে ছড়া কাটতে থাকেন, সেহেতু সুর-তালের একঘেয়েমি দূর করতে কবিয়ালকে মাঝে মাঝে নতুন নতুন ধুয়া গান গাইতে হয়। পাঁচালির ছড়ার ছন্দশৈলী পরিবর্তন করতেও এই ধরনের ধুয়া গান সংযোজনের প্রয়োজন হয়।[২০]

প্রশ্নকারী কবিয়াল তাঁর প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কোনো একটি ধুয়া গান করেন। এই সঙ্গতিকে আরো জোরালো করার জন্য ধুয়া গানের কিছু কিছু অন্তরা তাৎক্ষণিকভাবে রচিত হতে দেখা যায়। জবাবদানকারী কবিয়ালও একইভাবে এমন ধুয়া গান করেন, যে গানের মধ্যে জবাবের উপাদান থাকে। জবাবের উপাদান কম থাকলে তিনিও ধুয়া গানের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে অন্তরা সংযোজন করে থাকেন। বিশেষভাবে স্মরণীয় অধিকাংশ কবিয়াল তাঁদের পাঁচালির আসরগুলোতে এইসব ধুয়া গানের তাল অনুযায়ী ছড়া কেটে থাকেন। ধুয়া গানের অন্তরাকে অনুসরণ করতে গিয়ে অনেক সময়ে ত্রিপদী ও চৌপদী ছন্দে কবিয়ালকে ছড়া কাটতে হয় এবং স্থায়ী বা চিতানের অন্ত্যমিলের সঙ্গে সেসব ছড়ার মিল রক্ষা করতে হয়। ধুয়া গান গাওয়ার পরে কবিয়ালগণ যে ছড়া কাটেন, বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে সেটাকে পাঁচালি নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।[২১] পাঁচালির সুর যাতে ধুয়া

---

১৯. উদ্ধৃত : দীনেশচন্দ্র সিংহ, *কবিয়াল কবিগান* (কোলকাতা : সৌদামিনী সিংহ, ১৯৭৭), পৃষ্ঠা ২৩৪-৩৫
২০. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ৩০
২১. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ৩০

গানের সুরকে অনুসরণ করতে পারে, সেজন্য যন্ত্রসঙ্গতকারীগণ তাঁদের যন্ত্রে ধুয়া গানের সুর ধরে রাখেন এবং ছড়া কাটার মধ্যে মধ্যে সেই সুর শুনে ধুয়ার স্থায়ীকে মনে পড়ে।

ধুয়া গানের বিষয় ও সুর উভয়ই বৈচিত্র্যপূর্ণ। বাংলাদেশের লোকসংগীতের যতগুলো শাখা আছে, তার প্রতিটি শাখার গানই কবিগানের ধুয়া গান হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। আধুনিক গান, যা লঘুসংগীত হিসেবে পরিচিত, সেগুলোও যেমন ধুয়া গান হিসেবে পরিবেশনযোগ্য, আবার রাগসংগীতের সঙ্গতিপূর্ণ শৈলীগুলোও এই অংশে ব্যবহার্য। অর্থাৎ সুরের দিক দিয়ে ধুয়া গানের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তবে সাধারণত বিভিন্ন এলাকার বাউল, কীর্তন, ভাটিয়ালি প্রভৃতি সুরের গান ধুয়া গান হিসেবে পরিবেশিত হয়ে থাকে।

আঙ্গিকগত দিক দিয়ে গানগুলো সাধারণত বাউল, ভাটিয়ালি প্রভৃতি গানের মতো। চিতান (ধরন ও পাড়ন) বা স্থায়ী এবং একাধিক অন্তরা দিয়ে গানগুলো রচিত হয়ে থাকে। তবে প্রায় ক্ষেত্রেই এর অন্তরার সংখ্যা তিনের অধিক। এসব গানে পাওয়া যায় দেহতত্ত্বের কথা, কোথাও পাওয়া যায় গুরুভক্তির নমুনা, কোথাও ঘটে সমকালীন সমাজ ও রাজনীতির প্রতিফলন, আবার কোনো গানের মধ্যে দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের হাস্যরস সৃষ্টির প্রচেষ্টা। গানগুলো পূর্বরচিত থাকার জন্য, এর গুণগত মান তাৎক্ষণিক রচিত গান ও ছড়া থেকে অনেকটা ভালো হয়। তাছাড়া বিশশতকের শেষার্ধে কবিগানের এই অংশে যে কবিয়াল যত বেশি দক্ষ ছিলেন, সেই কবিয়াল ততোটা জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে এগিয়ে ছিলেন।

নিম্নের দুটি ডাক-ধুয়া বা দিশা এবং একটি ধুয়া উদ্ধৃত করা হল :

ক. ডাক-ধুয়া বা দিশা–
"১. মন মাঝি মোর বৈঠা নে রে আমি আর বাইতে পারলাম না।
২. গোঁসাইরে নি দেখছো খাজুর গাছতলায়, গোঁসাই খাজুর খায় আর লেজ নাড়ায়।"

খ. রসিকলাল সরকারের ধুয়া গান–
"ননদী লো যা ফিরে যা ঘরে।
বলিস ডুবেছে রাই কলঙ্কিনী কৃষ্ণ প্রেম সাগরে ॥

ঘুচলো তোদের সকল জ্বালা মুছলো কুলের কালি
কলঙ্কিনী রাই বলে আর কেউ দেবে না গালি।
ব্রজে আর হবে কৃষ্ণকালি গোপন বাসরে ॥

ঝুলন দোল আর নৌকাবিলাস সবই হলো শেষ
প্রবাসে চলেছি আমি যেথায় বন্ধুর দেশ।
যেনদয়া করে শ্যাম হৃষীকেশ এই আশিস দিস মোরে ॥

ভুলে যা লো রাধা তোদের ছিল কুলের বউ
শ্যাম বিনে জীবনে মরণে আপন নাই আর কেউ।
যার প্রাণে ওঠে অকূলের ঢেউ, কুলে তার কী করে ॥

বিদায় বেলায় ননদী গো শেষ মিনতি নিয়ো
আমার হয়ে শ্যামের কুঞ্জে সাঁঝের প্রদীপ দিয়ো।
এ দীন রসিক বলে আমায় রাখিয়ো চরণসেবার তরে ॥"

পাঁচালি

কবিগান পরিবেশন কালের প্রায় অর্ধেকটা অংশ জুড়েই কবিয়ালগণ পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দবন্ধে তর্কবিতর্ক করে থাকেন। ছন্দিত এই বিতর্কের অপর নাম পাঁচালি। তবে উনিশ শতকে 'পাঁচালি' নামে আলাদা এক ধরনের গান ছিল। ধুয়া গানের মতো গান এবং ছড়ার মাধ্যমে তখন কাহিনি বর্ণনা করা হত। সে সময়ে দাশরথি রায়ের পাঁচালি এর উদাহরণ। কবিগানের পাঁচালি নামের অংশটি উনিশ শতকের ঐ 'পাঁচালি' গান থেকে প্রভাবিত হওয়া সম্ভব।[২২]

উদ্ভব যাই হোক উনিশ শতকের পাঁচালি এবং কবিগানের পাঁচালি এক নয়। কবিগানের পাঁচালির জনপ্রিয় প্রতিশব্দ 'পাল্লা' বা 'কবির পাল্লা'। কোথাও কোথাও এই অংশ 'আলোচনা' নামেও অভিহিত হয়ে থাকে। আবার অনেকে এই অংশকে ছড়াকাটা নামে চিহ্নিত করে থাকেন। টপ্পা গানের মাধ্যমে কবিয়ালগণ তাঁদের চরিত্র ও বিতর্কের বিষয় ঠিক করে নেওয়ার পর থেকেই শুরু হয় এই ছন্দিত পাঁচালি। আলোচনা বা তর্কবিতর্কের পরম্পরা অক্ষুণ্ন রেখে পাঁচালিকে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তুলতে মাঝে মাঝে ডাক-ধুয়া (দিশা) বা ধুয়া গান পরিবেশিত হয়। এভাবে কবিগানের পাঁচালি অংশের সঙ্গে টপ্পা ও ধুয়া গান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে থাকে। পাঁচালির মধ্যে কখনো কখনো গদ্যের দেখা পাওয়া যায়। যুক্তির খাতিরে অনেক কবিয়াল ছোট আকারের হাস্যরসাত্মক গল্প, চুটকি গল্পের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। এইসব গল্পের অনেকগুলো ছন্দিত আকারে উপস্থাপিত হলেও ছোট আকারের অনেক গল্প কবিয়ালগণ গদ্যে বর্ণনা করে থাকেন। তবে সেই গদ্যও বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে উপস্থাপিত হওয়ায় সাধারণ গদ্যবাক্যের থেকে তা আলাদা হয়ে থাকে। পাঁচালির মধ্যে পরিবেশিত এই ধরনের গদ্যকে তুলনা করা যায় গদ্যকবিতার সঙ্গে, অথবা একে বলা চলে এক ধরনের ছন্দিত গদ্য। এই গদ্যে সাধারণত হাস্যরসাত্মক কাহিনি বর্ণিত হওয়ায়, সাধারণ শ্রোতাদের অনেকেই প্রায়ই ভুলে থাকেন যে, পাঁচালির এই বিশেষ অংশটি ছন্দমিল ছাড়াই উপস্থাপিত হল।

ছন্দের বিচারে পাঁচালি অংশকে অন্তত তিন ভাগে বিভাগ করা চলে, যথা : পয়ার পাঁচালি, ত্রিপদী পাঁচালি, এবং চৌপদী পাঁচালি। এগুলোর আবার বহু ধরনের রকমফের রয়েছে। যেমন পয়ারের রকমফের : লঘু পয়ার, দীর্ঘ পয়ার; ত্রিপদীর রকমফের : লঘু ত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী, ভগ্ন ত্রিপদী; এবং চৌপদীর রকমফের : চৌপদী ও ভগ্ন চৌপদী।[২৩]

পয়ার বাংলার জনপ্রিয় একটি ছন্দ। তবে আপাতদৃষ্টে পয়ারকে খুব সহজ ছন্দ মনে হলেও খুব অল্প পরিসরে উক্তি সম্পূর্ণ করতে হয় বলে, পয়ারের বন্ধনে বক্তব্যকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করা খুবই কঠিন কাজ। দীর্ঘ পয়ারে কিছুটা স্বাধীনতা হয়তো থাকে, কিন্তু লঘু পয়ারের আঁটসাঁট বন্ধনে বক্তব্য উপস্থাপন করা, এবং একই সঙ্গে ঢোলের তালের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে শব্দচয়ন করা অত্যন্ত কঠিন। সাধারণত বক্তব্যের শেষদিকে কবিয়ালগণ পয়ার ব্যবহার করে থাকেন। ঢোলের দ্রুত টোকার সঙ্গে মিলিয়ে কবিয়ালগণ যখন এই ছন্দে কথা বলেন, তখন তাঁদের দক্ষতা ও সৃজনশীলতা শ্রোতাদের বিস্মিত না করে পারে না। একটি লঘু পয়ারের উদাহরণ :

> "যাক তবে বেশি বলে নাহি প্রয়োজন।
> অল্পে অল্পে আসর আমি করি সমাপন ॥
> কী বলিব নন্দী তোরে আমার কথা নিস।
> কোনো দিন না শুনিবি কারো পরামিশ ॥
> নারদের মতো ধূর্ত নাহি এ ত্রিলোকে।
> পথভ্রষ্ট করিবার চাহিয়াছে তোকে ॥

২২. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ৩১
২৩. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ৩২

আমার দোষত্রুটি তোরে দেখাইতে চায়।
যাতে তোর গুরুভক্তি নষ্ট হয়ে যায় ॥"

কবিগানের পরিভাষায় ত্রিপদী পাঁচালির একটি জনপ্রিয় প্রতিশব্দ 'ডাক-ছড়া'। কবিয়ালগণ এই ধরনের ছড়া কাটতে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। যদিও এ কথা ঠিক যে ত্রিপদীর জটিলতা পয়ারের থেকে কিছুটা বেশি। সেখানে প্রতিটি চরণ একাধিক উপচরণে বিভক্ত থাকে, সেই উপচরণের প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য সমান হতে হয়, সর্বোপরি রক্ষা করতে হয় মধ্য মিল।[২৪] তাৎক্ষণিকভাবে কবিয়ালদের রচিত ত্রিপদী কেমন হয়, তা বোঝাতে একটি লঘু ত্রিপদী, একটি দীর্ঘ ত্রিপদী এবং একটি ভগ্ন ত্রিপদীর উদাহরণ পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হল :

লঘু ত্রিপদী

"কমলদাস বৈরাগী কৃষ্ণপ্রেমে অনুরাগী মনে বাঞ্ছা যাবে বৃন্দাবন।
কালামৃধায় জন্মস্থান কৃষ্ণ বলে কাঁদে প্রাণ বৃন্দাবনে চলেছে যখন ॥
কলিকাতা পৌঁছাইতে ওড়াকান্দি পড়ে পথে বিলের ভিতর দিয়া চলে।
বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হঠাৎ পড়ে নজর আলের উপর কিবা জ্বলে ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী

আবার বললে দেখতে পাই খাদ্যাদিতে বিচার নাই
নির্বিচারে মতুয়া সব খায়।
এ কথা মোটে সত্য নয় সকল কিছু খাওয়া কি যায়
খড় কুটা ঘাস খায় না মতুয়ায় ॥
ভালো করে আছে জানা মতুয়ারা বিষও খায় না
তবে দোষ দাও অকারণ।
বলতে পারো মাছ মাংস খায় এগুলি তো অখাদ্য নয়
সারা বিশ্বে ইহার সমর্থন ॥

ভগ্ন ত্রিপদী

দাদু তুমি আমার কথা নিও।
এই কলঙ্কের কথা শুনে কতো ব্যথা মায়ের প্রাণে
ইহার সঠিক জবাব আমার দিও ॥
মুখে তুমি যা করো বর্ণনা।
একি কর্ম তোমার হলো যা বলো তা উলটা চলো
তোমার পক্ষে ইহা সম্ভবে না ॥"

জোটের পাল্লা

জোটের পাল্লা হল কবিগানের পাঁচালি অংশের উপসংহার। উনিশ শতকে কোলকাতা পর্বে এর নাম ছিল কবির লহর। দক্ষিণবঙ্গে এর একটি জনপ্রিয় প্রতিশব্দ মিলনগোষ্ঠ বা মিলনগীতি। চট্টগ্রাম অঞ্চলে এই অংশের নাম জোটক। পশ্চিমবঙ্গের অনেক স্থানে এটি বোল কাটাকাটি নামে পরিচিত।[২৫] টাঙ্গাইল অঞ্চলে কবিগানের এই অংশ আলাদাভাবে 'মালজুড়ি' বা 'মালজোড়া' নাম গ্রহণ করে।[২৬] এটি

২৪. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ৩২
২৫. দীপক বিশ্বাস, *কবিগান*, কোলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৪, পৃষ্ঠা ১০
২৬. মামুন তরফদার, *টাঙ্গাইলের লোক-ঐতিহ্য* (ঢাকা : ক্যাবকো পাবলিকেশন্স, ২০০৬), পৃষ্ঠা ১৭৯

পাঁচালি অংশ থেকে যথেষ্ট আলাদা নয়। অনেক ক্ষেত্রে এই অংশে পাঁচালি অংশের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি ঘটে। তবে পাঁচালি অংশ থেকে এই অংশের তফাত উপস্থাপন-কৌশলে। পাঁচালির আসরগুলোতে কবিয়াল বা সরকারগণ পালাক্রমে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করে থাকেন। এক কবিয়ালের পালা শেষ হওয়ার পর অন্য কবিয়াল আসরে আসেন। কিন্তু জোটের পাল্লায় প্রথমে একজন কবিয়াল এসে একটি ধুয়া গান বা ডাক-ধুয়া গাওয়ার পরে সেই ধুয়া গানের সুরে পয়ার বা ত্রিপদীতে ছড়া কাটতে শুরু করার এক পর্যায়ে প্রথম কবিয়ালের আহ্বানে বিপক্ষের কবিয়াল আসরে দাঁড়ান এবং উভয় কবিয়াল সামনাসামনি দাঁড়িয়ে পরস্পরের সঙ্গে তর্কবিতর্ক চালিয়ে যেতে থাকেন। প্রথমদিকে এই ছড়ার লয় খানিকটা ধীর থাকলেও উভয়ের যুক্তির তীব্রতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছড়াকাটার লয় দ্রুততর হতে শুরু করে। এই দ্রুত ছড়া কাটার মধ্যে অনেক সময়ে আদিরসাত্মক প্রসঙ্গের অবতারণা হয়ে থাকে। প্রায় ক্ষেত্রে উভয় কবিয়াল শেষ পর্যন্ত তাঁদের বিতর্কিত বিষয়ের উপসংহারে পৌঁছতে সক্ষম হন, এবং সঙ্গত কারণে তা মিলনাত্মক হয়ে থাকে। তাই সাধারণত কবিয়ালগণ পরস্পরকে আলিঙ্গনের মাধ্যমে কবিগান শেষ করেন। কবিয়াল মদন আচার্য রচিত একটি চমৎকার জোটের পাল্লা উদ্ধৃত করেছেন যতীন সরকার। সেটি নিম্নরূপ :

"ধুয়া মান ছেড়ে দে ওগো রাধে আমি তোমার পায়ে পড়ি।
একবার ফিরে চাও না কিশোরী ॥

কৃষ্ণ সরকার হে মনোরঙ্গে তোমার সঙ্গে গাইবো আজ মানের জুড়ি।
কর্তাপক্ষের আদেশ হইলে সেই ভাবেতেই কাজ করি।
রাধে বা কৃষ্ণ হবে যাও না সে রাস্তা ধরি।
বাক্যব্যয়ে সময় নষ্ট তাতে কষ্ট হয় ভারি ॥

রাধা গত নিশি কষ্ট করে পোহাই শর্বরী।
তুমি সত্য বলো চিকন কালা কল্য ছিলে কার বাড়ি ॥

কৃষ্ণ একটি নবীন বাছুর হারাইয়া আমি রাইতভর ঘোরাঘুরি।
এই কারণে কুঞ্জে আসতে আজ হইয়াছে কিছু দেরি ॥

রাধা তোমার বেণুর রবে ধেনু ফিরে তবে কি জন্য ঘোরাঘুরি।
আবার কপালেতে সিন্দুরের বিন্দু পরনেতে নীল শাড়ি।

কৃষ্ণ বনে বনদুর্গা পূজা করছিল কয়জন নাগরী।
আমায় কুঙ্কুম দিয়া আশীর্বাদ দিল সত্য আজ স্বীকার করি।

রাধা বুঝলাম তোমার সব চাতুরী পরনে কেন নীল শাড়ি।
বাদুরচোষা আমের দশা কি জন্য তোমায় হেরি ॥

কৃষ্ণ আসবার সময় তোমার কুঞ্জে হঠাৎ কূপেতে পড়ি।
ভিজা কাপড় বদলাইতে গিয়াছি ধোপার বাড়ি ॥

রাধা শাড়ির অঞ্চলে আজ চন্দ্রাবলীর নাম হেরি।
কোথায় পাইলে এমন শাড়ি কেমন কেমন আজ হেরি ॥

কৃষ্ণ রাধে গো, বললে নাকি অঞ্চলেতে চন্দ্রাবলির নাম হেরি।
চন্দ্রা নামে একটা কোম্পানি খুলছে, দেখছো না চিন্তা করি।
আসলে কুঞ্জে আসতাম পারি, দাও না, প্রতিজ্ঞা করি ॥

রাধা চন্দ্রারে আজ মা ডাকিলে কুঞ্জেতে আসতে পারি।
তা না হলে যাও না চলে তুমি সে চন্দ্রার বাড়ি ॥
কৃষ্ণ বললে নাকি মা ডাকিতেম, কিছুটা রক্ষা করি।
ষোলো আনা মা না ডাইক্যা মাসিমা ডাকতাম পারি ॥

রাধা আরেক কথায় মরি ব্যথায় কোথায় যাই আর কি করি।
তোমার কপালে কঙ্কনের চিহ্ন কি জন্য আমি হেরি ॥

কৃষ্ণ দ্রুত বেগে আসবার সময়ে রাস্তাতে গেলাম পড়ি।
একটা কলসের কান্ধার দাগ লাইগ্যাছে ভাবেতে বুঝতাম পারি ॥
রাধে গো তুমি আমার আমি তোমার এক রাজ্যেতে বসত করি।
মানটা আজি ছাইড়্যা দিলে কুঞ্জেতে ঢুকতাম পারি ॥

রাধা নাথ গো, কতো কষ্ট দিলে আমায় কি করে আজ মান ছাড়ি।
পিরিতের বাক্সে জঙ্গার পড়ছে, বলো উপায় কি করি ॥

কৃষ্ণ পিরিতে বাক্সে জং পইড়াছে বললে তুমি কিশোরী।
একটু প্রেম নারানের তৈল লাগাইয়া বাক্সটারে ঠিক করি ॥

রাধা আয়ান ঘোষের খাশের বাড়ি কেমনে নেও দখল করি।
মামা থাকতে ভাইগ্না কভু হয় না তার অধিকারী ॥

কৃষ্ণ ষোলো আনা চাই না আমি দুই আনা পাইতাম পারি।
মামা মরলে ষোলো আনার আমি তো হই অধিকারী ॥

রাধা প্রতিজ্ঞা করো অদ্যাবধি যাইবে না অন্যের বাড়ি।
উপরোধে মনের খেদে আইজের মান দিলাম ছাড়ি
হলো রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলন পূর্ব স্মৃতি নেই ধরি ॥

কৃষ্ণ জীবন থাকতে এ জীবনে যাইবো না অন্যের বাড়ি ॥"[২৭]

কবিগানের স্তবক ও সুর

মালশি থেকে লহর কবি পর্যন্ত কবিগানের গঠন সব অঞ্চলে প্রায় একরকম। কিন্তু গানগুলো স্তবক-নাম বা তুক-নামগুলো এক-এক অঞ্চলে এক-এক রকম। এর মধ্যে কোলকাতা এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলে তুকনামের সংখ্যা কম। কিন্তু উভয় অঞ্চলের তুকনাম ও তুকের বিন্যাস আলাদা। অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গ (বৃহত্তর যশোর, খুলনা, বরিশাল ও ফরিদপুর) এবং ঢাকা অঞ্চলের তুকনামের সংখ্যা বেশি। এই দুই অঞ্চলের তুকনামের মধ্যে সাদৃশ্যও বেশি। বস্তুত ঢাকা এবং দক্ষিণবঙ্গের কবিগানের প্রায় প্রতিটি চরণ আলাদা নামে চিহ্নিত। তবে এ কথাও স্মরণীয় যে, হরিচরণ আচার্য যখন তাঁর 'কবির ঝঙ্কার' বই প্রকাশ করেছিলেন, তখন এইসব তুককে তিনি মোট চারটি তুক দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন।[২৮] অঞ্চলভেদে তুকনাম কম-বেশি হলেও গানের দৈর্ঘ্য সব অঞ্চলে প্রায় সমান। তাই ইচ্ছা করলে কোলকাতা পর্বের কবিগান যেমন দক্ষিণবঙ্গ ও ঢাকা অঞ্চলের তুকনাম দিয়ে প্রকাশ করা যায়, একইভাবে ময়মনসিংহ অঞ্চলের কবিগানও কোলকাতারও তুকনাম দিয়ে উপস্থাপন করা সম্ভব।

---

২৭. যতীন সরকার, *বাংলাদেশের কবিগান*, পৃষ্ঠা ৪৫-৪৯

২৮. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ৩৬

কবিগানের সুর মিশ্র সুর। এর মধ্যে কীর্তনের সুর রয়েছে, রয়েছে শ্যামাসংগীতের সুর, রয়েছে বাউল-ভাটিয়ালি প্রভৃতি গানের সুর। তাছাড়া কবিগানের ডাকগান এবং ধুয়া গান কখনো কখনো রাগিণী-নির্ভর হলেও মূল কবিগান মিশ্র রাগিণীর। উনিশ শতকের পাঁচালি গান ও টপ্পা গান সাধারণত আড়ানা বাহার, আলেয়া, আশা ভৈরবী, ইমন, ইমন কল্যাণী, ইমন ঝিঁঝিট, ইমন ভূপালী, এলাইয়া, কল্যাণী, কানেড়া, কামোদ, কামোদ খাম্বাজ, কামোদ গোঁড়া, কামোদ গৌড়, কালাংড়া, কেদারা, কেদারা কামোদ, কেদারা খাম্বাজ, খট, খটভৈরবী, গারা ঝিঁঝিট, গুর্জরী টোড়ী, গৌরী, ছায়ানট, ঝিঁঝিট, ঝিঁঝিট খাম্বাজ, ঝিঁঝিট পিলু, জয়জয়ন্তী, টোড়ী, দরবারী কানাড়া, দরবারী টোড়ী, ধানেশ্রী পুরিয়া, পঞ্চম, পরজ, পাহাড়ী ঝিঁঝিট, পূরবী, বাগেশ্রী, বাগেশ্রী কানাড়া, বাগেশ্রী মুলতানী, বারোয়াঁ বাহার, বিভাস, বিভাস কল্যাণ, বেহাগ, বেহাগ ঝিঁঝিট, বেহাগ সরফরদা, ভীমপলাশি বাহার, ভৈরবী, মালকোষ, মালসী, মুলতান, মুলতানী, মোহিনী, রামকেলী ললিত, লগনী, ললিত, ললিত বিভাস, শ্যাম, শ্যাম পূরবী, সরফরদা, সরফরদা কালাংড়া, সিন্ধু, সিন্ধু কাফী, সিন্ধু খাম্বাজ, সিন্ধু ভৈরবী, সুরট, সুরট মল্লার সোখরাই বাহার, সোহিনী, সোহিনী কানাড়া, হাম্বির, হিন্দোল প্রভৃতি রাগে পরিবেশিত হত।[২৯] সমকালীন কবিগানের পাঁচালি অংশ এবং ডাক, টপ্পা ও ধুয়া গানগুলোতে এসব রাগিণীর প্রয়োগ ঘটা সম্ভব। যেমনটা পূর্বে দেখা গেছে, রাজেন্দ্রনাথ সরকার তাঁর ডাকগানগুলোতে এর মধ্যকার অনেকগুলো রাগের প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন।

কবিগানের তাল বিভিন্ন রকমের হয়। অনেক সময়ে স্তবকান্তরে তালের পরিবর্তন করা হয়। ব্যবহৃত তালগুলোর মধ্যে আড়খেমটা, আড়া, একতাল, কাওয়ালি, কাশ্মীরি, কাহারবা, খেমটা, ঝাঁপতাল, ঠুংরি, তেওট, তেতালা, তেলেনা, ধামার, পোস্তা, মধ্যমান, যৎ, হরি প্রভৃতি তাল অধিক জনপ্রিয়। নির্দিষ্ট কোনো গানের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো তাল নেই। অনেক সময়ে ঢুলির ইচ্ছা অনুযায়ী এসব তালের পরিবর্তন ঘটতে পারে অথবা লয় দ্রুত (জলদ) বা ঢিমে হতে পারে।

কবিগানের বিষয়

রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পৌরাণিক কাহিনিকে কবিগানের মূল বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা চলে। উনিশ শতকের সূচনায় প্রকাশিত 'করুণানিধানবিলাস' গ্রন্থে কবিগানের যে মুদ্রিত পাঠ পাওয়া যায়, সেটিই এ পর্যন্ত প্রকাশিত সবচেয়ে প্রাচীন কবিগানের পাঠ। এর বিষয়বস্তু রাধা-কৃষ্ণ-চন্দ্রাবলির প্রেম। যে ঝুমুর গানকে কবিগানের প্রধান উৎস হিসেবে দাবি করা হয়ে থাকে, সেটির আলোচ্যবিষয়ও রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনি। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় যেসব গান সংগ্রহ করেছেন, সেগুলোরও বড় একটি অংশ রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক। তবে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনি উনিশ ও বিশ শতকের কবিগানের অন্যতম আলোচ্য হলেও আরো নানা ধরনের বিষয় কবিগানের মধ্যে অঙ্গীভূত হয়। কবিগানের শুধুমাত্র সখীসংবাদ নামক অংশ এ পর্যায়ে সরাসরি রাধাকৃষ্ণ প্রেমবিষয়ক। এছাড়া ভোর, গোষ্ঠ, বসন্ত, বিরহ, প্রভাস, জোটের পাল্লা প্রভৃতি অংশের মধ্যেও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনি ব্যক্ত হয়ে থাকে। এছাড়া কবিগানের কবি, টপ্পা, পাঁচালি, ধুয়া প্রভৃতি অংশের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত কারণ ইহজাগতিক-পৌরাণিক নানা বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাই সেখানে রাধা-কৃষ্ণের প্রসঙ্গ দুর্লভ হয় না। রাধাকৃষ্ণ তথা কৃষ্ণলীলা বিষয় এভাবে কবিগানের প্রধান ও মূল বিষয়ে পরিণত হয়।[৩০]

কবিগানের আলোচ্য হিসেবে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কালী ও দুর্গাদেবী তথা চণ্ডীকেন্দ্রিক। কবিগানের ডাক, মালশি, ভবানীবিষয় প্রভৃতি অংশ এই কালী, দুর্গা বা চণ্ডীকে নিয়ে রচিত হয়ে থাকে। বিশ

---

২৯. দাশরথি রায়ের পাঁচালি এবং নিধুবাবুর টপ্পায় এসব রাগিণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। দাশরথি রায়ের পাঁচালির জন্য দ্রষ্টব্য, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, *রসভাণ্ডার* (কোলকাতা : বসুমতী, ১৮৯৯); নিধুবাবু বা রামনিধি গুপ্তের টপ্পার জন্য দ্রষ্টব্য, নিরঞ্জন চক্রবর্তী, *ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য*, পৃষ্ঠা ২৯৪-৩৩৫

৩০. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ৪০

শতকের সূচনা থেকে হরিচাঁদ ঠাকুরের মতুয়া ধর্মমত প্রবল হয়ে ওঠার পর থেকে মতুয়া বিষয় নিয়ে এই শ্রেণির গান রচিত ও গীত হতে শুরু করে।

কবিগানের কবি, টপ্পা, পাঁচালি, ধুয়া প্রভৃতি অংশ মোটামুটি ইহজাগতিকতা-কেন্দ্রিক। তবে হিন্দু পুরাণ প্রসঙ্গ এখানে ব্যাপক জায়গা দখল করে থাকে। বিশেষত কবি, অংশে কোনো একজন কবিয়াল পৌরাণিক, ঐতিহাসিক বা কাল্পনিক কোনো কাহিনির পটভূমিতে দু-একটি প্রশ্নের অবতারণা করেন। সেই প্রশ্নের জবাব প্রতি-জবাব প্রভৃতির মধ্য দিয়ে কবিগান অগ্রসর হতে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় কোনো পৌরাণিক প্রসঙ্গ নিয়ে শুরু হলেও আলোচনা শেষ পর্যন্ত কোন বিষয়ে গিয়ে থামবে, আগে থেকে সে সম্পর্কে আঁচ করা সম্ভব হয় না। অনেক সময়ে শ্রোতাদের অভিরুচি ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে কবি-অংশের বিষয় নির্ভর করে। টপ্পা-পাঁচালি প্রসঙ্গেও একই মন্তব্য করা যায়। টপ্পাতে কবিয়ালদ্বয় যেহেতু দ্বান্দ্বিক সম্ভাবনাপূর্ণ দুটি চরিত্রে নিজেদের আরোপ করে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে থাকেন, সেখানেও তাই বিষয় নির্ভর করে আয়োজন ও শোতাদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় অনুযায়ী।[৩১] আসরভেদে কবিগানের এই কবি ও টপ্পা অংশ আলাদা হয়ে থাকে বলে এখানে বৈচিত্র্যের অবকাশ খানিকটা বেশি থাকে।

কবিগানের মধ্যকার অংশের সাধারণ কিছু শিরোনাম, যেমন : রামু সরকারের 'শরাঘাতের কবি', তারকচন্দ্র সরকারের 'পাশাখেলার কবি', হরিচরণ আচার্যের 'কাক-কোকিলের কবি', রাজেন্দ্রনাথ সরকারের 'গাঁজার কবি', নকুলেশ্বর সরকারের 'জল ও কুম্ভের কবি', বিজয়কৃষ্ণ সরকারের 'পঞ্চ পাণ্ডবের কবি', অনাদিজ্ঞান সরকারের 'যোগতত্ত্বের কবি', স্বরূপেন্দু সরকারের 'নারী স্বাধীনতার কবি', নারায়ণ সরকারের 'যৌতুকের কবি', নিখিলচন্দ্র সরকারের 'পরিবার পরিকল্পনার কবি' প্রভৃতি।[৩২] এই শিরোনামগুলো থেকেও দেখা যাচ্ছে বিষয় কখনো পৌরাণিক, কখনো কাল্পনিক, কখনো সামাজিক, আবার কখনো একেবারেই সমকালীন সমস্যানির্ভর।

কবিগানের টপ্পা ও পাঁচালি অংশের জন্য তুলনামূলক বেশি সময়ের দরকার হয়। কেননা এই অংশে কবিয়ালদ্বয় সত্যিকারের বিতর্কে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। বিতর্কের বিষয় নির্ভর করে কবিয়ালদ্বয়কে কোন চরিত্রে নিজেদের আরোপ করেন, তার ওপরে। কয়েকটি টপ্পার বিষয় উল্লেখ করলেও কবিগানের এই অংশের বিষয় সম্পর্কে আন্দাজ করা সম্ভব। যেমন : রূপ ও সনাতন অর্জুন ও কৃষ্ণ, হনুমানও রাম, পদ্মাবতী ও জয়দেব, মীরা বাঈ ও জীব গোস্বামী, বালি ও রামচন্দ্র, বৈশম্পায়ন ও কৃষ্ণ, দ্বৈপায়ন শুক্রাচার্য ও কৃষ্ণ, নারদ ও নারায়ণ, জটায়ু ও রাবণ, যুধিষ্ঠির ও ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণাচার্য ও সাত্যকি, গান্ধারী ও কৃষ্ণ, নন্দী ও শিব, হরিদাস ও নিত্যানন্দ, চৈতন্যবালা ও তারকচাঁদ, আবুল কালাম ও জহরলাল; ধনঞ্জয় টিকাদার ও লুৎফর রহমান, চাষি ও বৈষ্ণব, ধন ও বিজ্ঞান, যুদ্ধ ও শান্তি, চাষি ও মজুতদার, কৃষক ও জমিদার, মহাজন ও খাতক, স্বৈরতন্ত্র ও গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রভৃতি।[৩৩]

কবিগানের শিল্পী

কবিগানের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় : কণ্ঠশিল্পী এবং যন্ত্রশিল্পী। কণ্ঠশিল্পীদের নাম দোহার এবং যন্ত্রশিল্পীদের মধ্যে রয়েছে ঢুলি, জুরিদার, কাঁসিবাদক, বংশীবাদক, সরোদবাদক, বেহালাবাদক, হারমোনিয়ামবাদক প্রভৃতি। কবিগানের মূল শিল্পীর নাম কবিয়াল বা সরকার। কবিয়াল বা সরকার একাধারে সংগীতচয়িতা, কণ্ঠশিল্পী– সকল কিছু। অনেক সময়ে এক

---

৩১. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ৫৬

৩২. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ৪১

৩৩. এইসব টপ্পার অনেকগুলো দীনেশচন্দ্র সিংহ তাঁর *"পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা"* গ্রন্থে সংকলন করেছেন, কয়েকটির উল্লেখ পাওয়া যায় সৈয়দ মোহাম্মদ সাহেদ সম্পাদিত *রমেশ শীল রচনাবলি* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩) গ্রন্থের ভূমিকা অংশে।

শ্রেণির সংগীতরচয়িতা কবিয়ালদের সহযোগিতা করে থাকেন, তাঁদের নাম বাঁধনদার। কবিগানের সংগীত-সহযোগী কণ্ঠশিল্পীগণ দোহার নামে পরিচিত। সখীসংবাদ, কবি, টপ্পা প্রভৃতি অংশে কম-বেশি চার জন দোহার আসরের চার দিকে মুখ করে দাঁড়ানোর নিয়ম। পেছন থেকে সরকার এক-একজনের পেছনে কানের কাছে গিয়ে গানের কলি বলে দেন, দোহারগণের কাজ হল নির্ধারিত সুর আরোপ করে সেই কলিগুলোকে পরিবেশন করা। এছাড়া কবিয়াল বা সরকার যখন ধুয়া গান পরিবেশন করেন, দোহারগণ তখন স্থায়ীর বিশেষ কলি সমস্বরে গাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। কবিগানের দলে দোহারদের পরেই যন্ত্রশিল্পীদের অবস্থান। উনিশ শতকের কবিগানে হারমোনিয়মের দেখা পাওয়া না গেলেও বিশ শতকের পূর্ববঙ্গের কবিগানে তা অনেকটা অপরিহার্য যন্ত্রে পরিণত হয়। কবিগানের তাল রক্ষার জন্য ঢোলের সঙ্গে আরো এক বা একাধিক যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এর মধ্যে কাঁসি এবং জুরির নাম সর্বাগ্রস্মরণীয়। দলের গুরুত্ব ও সঙ্গতি অনুযায়ী শুষীর ও ততজাতীয় আরো অনেক যন্ত্রের ব্যবহার হয়, সেগুলোর মধ্যে জুড়ি বা করতাল, খঞ্জনি, নূপুর, দোতারা, সরোদ, বেহালা, সানাই, আড়বাঁশি, খিলবাঁশি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে অনেকে শখ করেও কবিগানের দলে বাঁশি বাজাতেন। এমনই একজন ব্যক্তি হলেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী এস এম সুলতান। কবিয়াল বিজয়কৃষ্ণ সরকারের বেশ কয়েকটি আসরে তিনি বাঁশি বাজিয়ে আসর মাতিয়েছিলেন।[৩৪] একুশ শতকের সূচনায় পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো আসরে প্রচলিত যন্ত্রাদির অতিরিক্ত হিসেবে সিন্থেসাইজার, ক্যাসিও, ব্যাঞ্জো প্রভৃতি যন্ত্রের ব্যবহারও দেখা যায়।

কবিয়াল বা সরকার

উনিশ শতকে কবিগানের দলনেতা পরিচিত ছিলেন কবিয়াল, কবিওয়ালা বা কবিতাওয়ালা নামে। বিশ শতক নাগাদ কবিয়ালদের নাম হয় সরকার। এই কবিয়াল বা সরকার হলেন কবিগানের কেন্দ্রীয় ব্যক্তি। দলের যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ডের তিনি নিয়ন্ত্রক। তিনিই হলেন কবিগানের কবি। তিনি গান রচনা করেন, তাতে সুরারোপ করেন, স্বকণ্ঠে এবং দোহারদের মাধ্যমে তা পরিবেশন করেন। সর্বোপরি তাৎক্ষণিকভাবে ছন্দ, মিল, সুর ও তাল সহযোগে ছড়া কেটে কোনো বিশেষ বিষয়ে প্রশ্নোত্তর ও বিতর্ক চালিয়ে যান। কবিগান সংক্রান্ত এইসব দায়িত্ব পালন করাকে বলা হয় 'সরকারি করা'। অসাধারণ সৃজনশীলতা, প্রখর যুক্তিশীলতা, প্রচুর পঠন-পাঠন, সুললিত কণ্ঠ, সুরবোধ, তালবোধ এবং দল ব্যবস্থাপনায় দক্ষতায় সমন্বয় যাঁর মধ্যে যত বেশি ঘটে, সরকারি পেশায় তিনি ততো যশ লাভ করে থাকেন।

বিশ শতক নাগাদ কবিয়ালদের একটি সাধারণ পদবি তৈরি হয়ে যায়। কবিয়ালের প্রতিশব্দ হিসেবে যে 'সরকার' অভিধাটি তখন জনপ্রিয় হয় ওঠে, কবিয়ালগণ সেই 'সরকার' অভিধাকে তাঁদের কুলপদবির পরিবর্তে ব্যবহার করতে থাকেন। এর ফলে অনেক সময়ে কবিয়ালদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের বংশপেশা সম্পর্কে অবগত হওয়া কঠিন হয়। একই প্রক্রিয়ায় অনেক মুসলমান কবিয়ালও সরকার পদবি ধারণ করতে শুরু করেন। এক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যায় ব্রাহ্মণ কুলজাত কবিয়ালদের ক্ষেত্রে।[৩৫] সকল কালপর্বে শুধু এঁদের পূর্বপুরুষের কুলপদবি বজায় রাখতে দেখা যায়। 'সরকার' অভিধার সূচনা কিভাবে হল, সে সম্পর্কে যতীন সরকারের অনুমানটি বিবেচনাযোগ্য। তিনি মনে করেন,

> বাংলাদেশের গ্রামীণ বিশ্বাস অনুযায়ী লেখাপড়া জানা লোকই সরকার। এমনকি 'মহাজনের গতিতে হিসাবের খাতা কিংবা জমি বিক্রির দলিল লেখে যারা, তারাও সরকার।' তাই 'নানা শাস্ত্রে পারঙ্গম, পুরাণ কাহিনি ও ধর্মের নানা কথা তাঁরা প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন, আসরে উঠে তাৎক্ষণিক পদ্য ও গান রচনা করেন।

---

৩৪. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ৪৮

৩৫. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ৪৩

উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে প্রতিপক্ষকে বাকযুদ্ধে ঘায়েল করতে পারেন– এসবই গ্রামের লোকদের কবিয়ালদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে বলে লৌকিক পদবী নির্বিশেষে সকল কবিয়ালই "সরকার" আখ্যায় ভূষিত।[৩৬]

'কবিয়াল' অভিধা নিয়ে অনেক কবিয়ালের এবং কবিগান-অনুরাগীর আপত্তি জানা যায়। তাঁরা মনে করেন, এই অভিধা দিয়ে কবিগান-গায়কের কবিত্বকে খাটো করা হয়ে থাকে। 'কবিয়াল' শব্দকে তাঁরা মনে করেন 'কবিওয়ালা' শব্দের অপভ্রংশ, যা ফেরিওয়ালা, ভিস্তিওয়ালা ইত্যাদির সঙ্গে তুলনীয়। বিকল্প হিসেবে তাঁরা 'কবিগায়ক', 'লোককবি', 'চারণকবি', 'কবির সরকার' বা 'সরকার' প্রভৃতি অভিধা প্রস্তাব করেন।

কবিগানের আসর

নিয়মিত কবিগান পরিবেশিত হয় যেখানে তাকে কবি খোলা বা কবির আসর বলে। কবিগানের আসর সাধারণত চতুষ্কোণ হয়ে থাকে। সামিয়ানা টাঙানো বিরাট প্যান্ডেলের মাঝখানে মাটি বা কাঠের মঞ্চ করে অপেক্ষাকৃত উঁচু সমতলের উপরে কবিগানের জন্য আসর তৈরি করা হয়ে থাকে। এই আসর তৈরি করা হয় কখনো উন্মুক্ত জায়গায়, কখনো শ্মশানখোলায়, কখনো বড় গাছের নিচে, কখনো বাড়ির আঙ্গিনায়, কখনো বারোয়ারি মন্দিরের সামনে, কখনো মেলার মাঠে, কখনো খেলার মাঠে, কখনো হলঘরে, আবার কখনো অডিটোরিয়ামে। উন্মুক্ত জায়গায় মঞ্চ তৈরি করার সময়ে আয়তনের অন্তত একটা দিকে করা হয় এবং সেই দিকটা থেকে কবিয়াল এবং তাঁর সহযোগীগণ মঞ্চে প্রবেশ-প্রস্থান করেন। অপেক্ষাকৃত কম হলেও সেই দিকটাতেও অবশ্য শ্রোতাদের বসার ব্যবস্থা করা হয়। চতুষ্কোণ এই মঞ্চের একদিকে একটি দল এবং অন্যদিকে প্রতিপক্ষ দলের সদস্যগণ আসন গ্রহণ করেন। পালাক্রমে দল দুটিকে গান পরিবেশন করতে হয় বলে এবং গানের অনেক অংশ প্রশ্নোত্তরমূলক থাকায় গানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দলের অধিকাংশ সদস্যকে নিজ নিজ আসনে অবস্থান করতে হয়।[৩৭]

আসরের এই বর্ণনা বিশ শতকের শেষার্ধের দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশ অঞ্চলের। উনিশ শতকে সূচনায় কবিগানের আসর ঠিক কেমন ছিল, সে ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে জানা না গেলেও বিভিন্ন কারণে মনে হয়, তখনকার আসরও এর থেকে আলাদা কিছু ছিল না। প্রথম এবং প্রধান কারণ হল, ধ্বনিবিবর্ধক যন্ত্র ছাড়া এই পদ্ধতিতে একসঙ্গে সর্বাধিক সংখ্যক শ্রোতার মনোরঞ্জন করা সম্ভব।

কবিগানের সময় ও উপলক্ষ

সাধারণত আশ্বিন মাস থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত কবিগানের জন্য প্রশস্ত সময়। এই সময় বাঙালির যাবতীয় উৎসব-অনুষ্ঠান, এমনকি বাঙালি হিন্দুদের পূজাপার্বণেরও সময়। বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্ভবত এর মূল কারণ। জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত চার মাসে ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা থাকে। এর ফলে এই সময়ে গ্রামীণ অনুষ্ঠানসমূহ নির্ঝঞ্ঝাট হয় না। কবিগানের মতো সংগীতানুষ্ঠান যাঁরা উপভোগ করে থাকেন, সেই শ্রোতামণ্ডলীর সিংহভাগ অংশ এই কৃষিকাজের সঙ্গে এতটা নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকেন যে, কোনো ধরনের বিনোদনের সুযোগ তাঁদের থাকে না। কবিগানের এই কালপর্ব বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রায় সর্বত্র এক রকম। তবে শহর এলাকায় পরিবেশ, সুযোগ ও শ্রোতাদের কর্মসময় ভিন্ন থাকার কারণে অনেক সময়ে উল্লিখিত বর্ষাকালেও কবিগানের আয়োজন হয়ে থাকে।[৩৮]

---

৩৬. যতীন সরকার, *বাংলাদেশের কবিগান*, পৃষ্ঠা ৩৪

৩৭. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ৫৬

৩৮. জসীমউদ্‌দীন, *জীবনকথা* (ঢাকা : পলাশ প্রকাশনী, ১৯৬৪), পৃষ্ঠা ১২৫

কবিগানের নির্দিষ্ট কোনো আসরের কালপরিধি পালা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। ধারণা করা হয় যে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কোনো একটি পালা পরিবেশিত হতে কম-বেশি ১২ ঘণ্টা সময় লাগে। এই হিসেবে ভোররাত চারটার সময়ে কোনো গান শুরু হলে সাধারণত বিকেল চারটার দিকে তা শেষ হয়। কবিগানের অনেকগুলো পর্যায় আছে, সেগুলোর কালপরিধিও কম-বেশি আন্দাজ করা সম্ভব। টপ্পা, পাঁচালি, ধুয়া, ও জোটের পাল্লার জন্য কম-বেশি ছয় ঘণ্টা সময়ের দরকার হয়। বাকি ছয় ঘণ্টার মধ্যে কম-বেশি এক ঘণ্টা ব্যয় হয় দুই দলের ডাক ও মালশি গানের জন্য, কম-বেশি দুই ঘণ্টা ব্যয় হয় দুই দলের সখীসংবাদের জন্য, এবং কম-বেশি তিন ঘণ্টা ব্যয় হয় কবি বা লহর কবির জন্য।

বিশ শতকের শেষার্ধ থেকে কবিগানের এই কালপরিধিতে নানারকম পরিবর্তন ঘটে। কবিগানের আসর যেহেতু আর একমাত্র চণ্ডীমণ্ডপকে কেন্দ্র করে আবর্তিত থাকে না, যেহেতু কবিগান পরিবেশনের সময়ও পূজার সময় থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করে। তখন এক এক অঞ্চলে দেখা যায় এক-একরকম সময়ক্রম। একুশ শতকের সূচনায় তথ্যসংগ্রহ করতে গিয়ে দেয়া যায়, পশ্চিমবঙ্গের কোলকাতায় একটি আসর শুরু হয়েছিল দুপুর তিনটায়, বাংলাদেশের গোপালগঞ্জের সাতপাড়ে একটি আসর শুরু হয় সন্ধ্যা নাগাদ, ঢাকা শহরের জেলেপাড়ার কবিগানের আসর শুরু হয় বিকেল চারটায়, আবার একটি অডিটরিয়মে অন্য একটি অনুষ্ঠানে শেষে রাত দশটায় কবিগান শুরু হয়। উল্লিখিত আসরগুলোর মূল আকর্ষণ ছিল ধুয়া ও পাঁচালি। সাতপাড় এবং ঢাকার জেলেপাড়ার আসরে ডাক-মালশি, সখীসংবাদ ও টপ্পা শোনা গেলেও অধিকাংশ আসর শুধু ধুয়া ও পাঁচালিতে সীমাবদ্ধ ছিল। শেষোক্ত আসরগুলোর কালপরিধি কোনোটা দুই ঘণ্টার, এবং সবচেয়ে দীর্ঘটা পাঁচ ঘণ্টার।

কবিগানের এই বারোয়ারি বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে যে কোনো ধরনের গ্রামীণ উৎসব-অনুষ্ঠানে কবিগান একটি সর্বজনগ্রহণযোগ্য বিনোদনের উপায়ে পরিণত হয়। একই কারণে বিভিন্ন ধরনের বারোয়ারি পূজা-অনুষ্ঠান ও তৎসংশ্লিষ্ট মেলায় কবিগানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। বিশেষভাবে দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, রাসযাত্রা, মকর সংক্রান্তি, সরস্বতী পূজা, মাঘী পূর্ণিমা, দোলযাত্রা, বারুণী স্নান, চৈত্র সংক্রান্তি, নববর্ষ প্রভৃতি উপলক্ষে বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে এক দিন থেকে শুরু করে এই সপ্তাহব্যাপী যেসব মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে, কবিগান তার মধ্যে প্রধান একটি আকর্ষণ। আজকাল রাজনৈতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানের মর্যাদা বৃদ্ধি ও লোক-সমাগম বৃদ্ধির লক্ষ্যেও কবিগানে আয়োজন করা হয়ে থাকে।

বিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল কবিগানকে তাদের প্রচারণার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে। বিশেষভাবে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ পরিকল্পিতভাবে একাধিক কবিয়ালকে তাঁদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হন। এর ফলে রমেশ শীল প্রমুখ কবিয়াল কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন সভা-সমাবেশ উপলক্ষে কবিগান পরিবেশন করতে শুরু করেন। বিশশতকের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় কবিগান অনুষ্ঠিত হয়। এসব ক্ষেত্রে সরকারি কর্মসূচিই উপলক্ষ, তার সময়কালও সুনির্দিষ্ট। বিশ শতকের শেষার্ধে রেডিও এবং টেলিভিশনে কবিগান অনুষ্ঠান প্রচার হতে শুরু করে। সেসব অনুষ্ঠানের জন্যও বিশেষ কোনো উপলক্ষের প্রয়োজন হয় না।

কবিগানের এই রাজনৈতিক ব্যবহার একুশ শতকের সূচনার পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরায় অব্যাহত দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গের মহিলা কবিয়াল উমা সরকার যেমনটা জানান, ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের সময়ে তাঁকে সেখানে বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে কবিগানে অংশ নিতে যেতে হয়।[৩৯] ত্রিপুরা রাজ্যের একাধিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত খ্যাতিমান মন্ত্রী কবি অনিল সরকারও তাঁর একটি সাক্ষাৎকারে তাঁর এই কৌশলের কথা এবং এই কৌশলে কাজ হওয়ার কথা স্বীকার করেন।[৪০] তিনি

---

৩৯. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ৫৬

৪০. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ৫৬

জানান, নির্বাচনের পূর্বে অন্য নেতাদের মতো গতানুগতিক জনসভা তিনি করেন না। তাঁর জনসভায় নানা ধরনের লোকসংগীতের আয়োজন থাকে। লোকসংগীতের মধ্যে বিশেষ কোনো সংলাপ রসোত্তীর্ণ হতে পারলে, তা সাধারণ প্রচারণার চেয়ে অনেক বেশি কাজ দেয়। শিল্পী যখন 'খারে খা বক্কিলারে খা' বলে গান ধরে, সাধারণত মানুষ তখন বুঝে নেয়, বুর্জোয়া শ্রেণির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।[৪১]

পৃষ্ঠপোষক ও শ্রোতা

সূচনা পর্বের কবিগান সম্পর্কে যতটা জানা যায়, তাতে দেখা যায়, কোলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর তৎকালীন জমিদার ও বিত্তবান লোকজন এইজাতীয় গানের আয়োজন করতেন। কোলকাতায় তখন যাঁরা কবিগানের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশেষভাবে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জমিদার নবকৃষ্ণ দেব, গোপীমোহন ঠাকুর, শোভাবাজারের কালীশঙ্কর ঘোষের পুত্রগণও রামদুলাল সরকারের পুত্রগণ, দরজিপাড়ার মিত্ররা, হাটখোলার দত্তরা, বাগবাজারের বসুরা, কলুটোলার শীলেরা, পাইকপাড়ার জমিদারবৃন্দ, কাশিমবাজারের হরিনাথ কুমার বাহাদুর, পাথুরেঘাটার ঠাকুররা, জোড়াসাঁকোর সিংহরা, গরানহাটার কৃষ্ণমোহন বসাক, শ্যামপুকুরের দিগম্বর মিত্র ও হলধর ঘোষ, পটলডাঙার রূপনারায়ণ ঘোষাল, দয়েহাটার গুরুচরণ মল্লিক, বড়বাজারের মল্লিকরা, এবং বিখ্যাত ধনী ছাতুবাবু ও লাটুবাবু। এছাড়া তখন বর্ধমান, চন্দনগর ও কৃষ্ণনগরের রাজারাও কবিগানের পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে এসেছিলেন।[৪২]

পূর্ববঙ্গের কবিগান বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত জমিদার শ্রেণিই আয়োজন করেছেন। জমিদারি প্রথার অবসানের পরে প্রধানত বিত্তবান ব্যক্তিবর্ণ বা সংস্থা-সংগঠনের উদ্যোগে কবিগান চর্চা অব্যাহত থাকে। আর্থিক সচ্ছলতা থাকার কারণে জমিদারের পক্ষে কোনো ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা খুব একটা কঠিন ছিল না। একই কারণে অনেক জমিদার প্রতিবেশী ও প্রতিপক্ষ জমিদারদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। জমিদারি প্রথা লোপ পাওয়ার পরে গ্রাম ও শহরের বিত্তবান ব্যক্তি বা সংগঠন-সংস্থা আয়োজকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। একই প্রক্রিয়ায় এই ব্যক্তিবর্গ ও সংগঠন-সংস্থা নিজ নিজ এলাকার আঞ্চলিক ঐতিহ্যের অনুসরণ করতে গিয়ে কবিগান আয়োজন অব্যাহত রাখেন। বিশ শতকের শেষদিকে সরকারি উদ্যোগে নানা ধরনের জাতীয় দিবস উপলক্ষে কবিগানের আয়োজন করা হয়। শহর ও নগরের প্রদর্শনীকে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তুলতেও কবিগানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানাদি কবিগানের পৃষ্ঠপোষক হয়ে ওঠে।

আর্থিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে কোনোরকম সম্পর্ক থাক বা না-থাক, শ্রোতারাই যে কবিগানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শ্রোতাদের আগ্রহ, তাদের প্রাসঙ্গিক অনুরোধ-উপরোধ, সর্বোপরি শ্রোতাদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া কবিয়ালদের সৃজনশীলতা উৎসাহিত করে। শ্রোতাদের সঙ্গে এই চমৎকার মিথষ্ক্রিয়ায় রচিত হতে পারে এমনসব গানের কলি, যা হয়তো অন্য কোনো সময়ে ঐ কবিয়ালের পক্ষে রচনা করাই সম্ভব নয়। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পূর্ববঙ্গের কবিগানের এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন দীনেশচন্দ্র সিংহ, এ প্রসঙ্গে যা উদ্ধৃতিযোগ্য :

> "গানের মাধ্যমে একজনের কাছে একজনের মনোভাব প্রকাশ এবং কিয়ৎক্ষণের মধ্যে শ্রোতার পক্ষ অবলম্বন করে বিপক্ষ কবিয়াল কর্তৃক বক্তার বক্তব্যের ভাবরস বজায় রেখে বিপরীতধর্মী জবাব দান– পূর্ববঙ্গের কবিগানের এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য। যাঁরা প্রকৃত রসজ্ঞ শ্রোতা তাঁরা গানগুলির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একাগ্র মনে শ্রবণ করে ভাষান্তরালে লুক্কায়িত উত্তরদানযোগ্য ভাবগুলি স্মরণে রাখেন, এবং বিপক্ষ সরকারের কাছে ঐ জাতীয় পদগুলির সরস জবাব শোনবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকেন। এমন অনেক শ্রোতা ছিলেন যাঁরা

৪১. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ৫৬

৪২. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *গৌড়বঙ্গ-সংস্কৃতি* (কোলকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৯৭২), পৃষ্ঠা ১৩২ এবং প্রফুল্লচন্দ্র পাল, *প্রাচীন কবিওয়ালার গান*, পৃষ্ঠা– এগার।

> গানের জবাবে এমন আত্মহারা হয়ে থাকতেন যে, সরকার মহাশয়েরা জবাবের ফুকারের ত্রিপদীটি বলবার সময়ে দুটি পদ বলতেই তাঁরা শেষ পদটি বলে নেচে উঠতেন। একি সামান্য অনুভূতি! কবির মনের ভাব গ্রহণ করে সে ভাবের অভিব্যক্তি যাদের মুখে বক্তার বক্তব্য প্রকাশের পূর্বেই ব্যক্ত হয়, তাঁদের শ্রোতা না বলে রসজ্ঞ কবি বললেও অত্যুক্তি হয় না।"[৪৩]

পরিশেষে বলা যায় যে, কবিগানের আসরে কবিয়াল এবং দোহারগণ মিলে যা পরিবেশন করে থাকেন, তাকে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে : এক. গান; এবং দুই. ছড়া। আকারের দিক দিয়ে গানগুলোকে হ্রস্ব ও দীর্ঘ– এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। তবে সুরের দিক দিয়ে গানগুলো বৈচিত্র্যপূর্ণ। শ্যামাসংগীত, কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, শাস্ত্রী সংগীত প্রভৃতি নানা শাখার গান যেমন কবিগানে এসে মিশেছে, তেমনি বাংলাদেশের লোকযাত্রা ও লৌকিক ধরনের কথকতার এক ধরনের সমন্বয় কবিগানে ঘটেছে। এই মিশ্রণ ও সমন্বয় কোনো একজনের হাতে বা কোনো এক বিশেষ এলাকায় বা কোনো নির্দিষ্ট কালপর্বে হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়েছিল, এমন মনে হয় না। হয়তো ধীরে ধীরে বিভিন্ন এলাকার কবিয়ালদের আলাদা আলাদা উদ্যোগের মাধ্যমে কবিগান তার এই বৈচিত্র্যপূর্ণ আঙ্গিক ও প্রকরণ অর্জন করেছে। সেই সঙ্গে এ কথা হয়তো বলা যায় যে, এ-জাতীয় গানের কোনো উদাহরণ বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তাই মনে হয়, আঠারো শতকে কোলকাতার অভূতপূর্ব পরিবেশই কবিগানের মতো এমন জটিল একটি সংগীতশৈলী উদ্ভবের সবচেয়ে বড় কারণ।[৪৪]

কবিগানের উদ্ভব

কবিগানের উদ্ভবকাল সংক্রান্ত তথ্যাদি লিখিতভাবে না পাওয়ার কারণে অনুমানের ওপরে অনেকাংশে নির্ভর করতে হয়। তাতে নানা মতের জন্ম হয়। এই সব মত বিশ্লেষণ করে আসল তথ্য উপস্থাপন করা হয়তো কঠিন, তবে এর কোনো বিকল্প নেই। *পদ্মপুরাণ* বা *মনসা ভাসান* রচনার পূর্ব থেকে ময়মনসিংহ এলাকায় কবির প্রচলন ছিল বলে ঐ জেলার বিখ্যাত কবিয়াল বিজয় নারায়ণ আচার্য অনুমান করেছেন।[৪৫] তাঁর এই অনুমানের সপক্ষে তেমন কোনো জোরালো যুক্তি নেই। *পদ্মপুরাণ* রচিত হয়েছে ষোড়শ শতাব্দীতে যদি এই অনুমান সত্য হয়। তবে পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় পূর্ববঙ্গে কবিগানের প্রচলন অনেক আগেই হয়েছে।

কারণ পশ্চিমবঙ্গে কবিগানের প্রচলন সপ্তদশ শতাব্দীর আগে কেউই মনে করেন না। পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার পূর্বাঞ্চলে কবিগানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। এই বঙ্গের কবিয়ালরা এদেশের লোকজ পরিমণ্ডল থেকে কবিগানের উপাদান, ঐতিহ্য ও শিল্পরূপ ধারণ করেছেন। কবিগানের উদ্ভবকালে গানের জবাব গানে এবং টপ্পার জবাব টপ্পায় দেয়া হত। এখনকার মতো এত বেশি ছড়া বা পাঁচালি ঐ সময় প্রচলন ছিল না। সাধারণভাবে ধারণা করা হয় যে মধ্যযুগের শেষ এবং আধুনিক যুগের সূচনালগ্নে কবিগানের উৎপত্তি। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে বাংলার স্বাধীন নবাবের পরাজয় হয়। ১৭৬০ সালে বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের মৃত্যু হয়। ব্রিটিশরা বাংলার রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। বণিকের মানদণ্ড দেখা দেয় রাজদণ্ডরূপে। যেহেতু বাণিজ্য তাদের মূল লক্ষ্য তাই রাষ্ট্র পরিচালনায় তারা দক্ষতা দেখাতে পারে না। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। এদের সাথে ঘনিষ্ঠ বাঙালি সমাজ হঠাৎ ধনী হয়ে নতুন সংস্কৃতির সৃষ্টি করে। কোলকাতাকেন্দ্রিক এই নব্যসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকরা সুরা, নারী আর বুলবুলি বিলাসে মত্ত থাকত। প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত এদের বারবাড়িতে গান বাজনার আসর বসত। নব্য ইংরেজি শেখা তরুণরা আপ্রাণ ইংরেজি অনুকরণে ব্যস্ত ছিল। কাব্যচর্চা ছিল তাদের বিলাসিতার অংশ। এমনই এক সামাজিক

---

৪৩. দীনেশচন্দ্র সিংহ, *পূর্ববঙ্গের কবিয়াল কবি সঙ্গীত*, পৃষ্ঠা ২৯১

৪৪. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ৬০

৪৫. বিজয়নারায়ণ আচার্য, 'ময়মনসিংহের কবিগান' *সৌরভ*, জুন-জুলাই ১৯১৭, পৃষ্ঠা ২৬৬

প্রেক্ষাপটে নবোত্থিত শহর কোলকাতায় একবার কবির লড়াই অনুষ্ঠিত হয়। ওই সময়কে এবং এই কোলকাতা শহরকে কবিগানের উদ্ভবকাল এবং উৎপত্তিস্থল বলে মনে করা যায়।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকগণ প্রায় সকলেই কবিগান সম্পর্কে এবং প্রসঙ্গত এর উদ্ভবকাল সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। এঁদের অধিকাংশের মত ঈশ্বর গুপ্ত প্রদত্ত তথ্যের ওপরে নির্ভরশীল এবং তার ফলে সঙ্গত কারণেই তাঁরা কবিগানের জন্ম আঠারো শতকের পেছনে নিয়ে যেতে চান না। যাঁরাও-বা একটু যেতে রাজি থাকেন, তাঁরাও কোনোক্রমে সতেরো শতকের শেষার্ধের পূর্বে যেতে রাজি হন না। এ প্রসঙ্গে সুশীলকুমার দে-র একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেন,

> "কবিসঙ্গীতের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে আঠারো শতকের সূচনার অথবা বড়ো জোর সতেরো শত শেষদিকে।"

আঠারো শতক থেকে কবিগান পরিবেশন করে আসছিলেন, এমন কয়েকজন কবিয়ালের জীবনকথা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন।[৪৬] এটিই কবিগান ও কবিয়ালদের সম্পর্কে সর্বপ্রথম গ্রহণযোগ্য প্রামাণ্য তথ্য। আঠারো শতকের সূচনায় অর্থাৎ ১৭০০ সালের নিকটবর্তী সময়ে গোঁজলা গুঁইয়ের আবির্ভাবের কথা ঈশ্বরচন্দ্র উল্লেখ করেন। তাঁর ধারণা, গোঁজলা গুঁই পেশাদার কবিগানের দল গঠন করেছিলেন।[৪৭] ঈশ্বর গুপ্তসহ সংশ্লিষ্ট প্রায় সকল আলোচক গোঁজলা গুঁইকে আদিতম কবিয়াল হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাছাড়া কবিয়ালগণও তাঁদের টপ্পা-পাঁচালির প্রাসঙ্গিক অংশে গোঁজলা গুঁইকে কবিগানের প্রবর্তক হিসেবে বর্ণনা করেন। কবিগানে যেহেতু বিপক্ষ কবিয়ালের উপস্থিতি অপরিহার্য, তাই যৌক্তিকভাবে ধরে নিতে হয় যে গোঁজলা গুঁইকে তাঁর শিষ্যদের বিপক্ষে কবিগান করতে হয়েছিল। তাঁর শিষ্যদের প্রায় সকলেরই আবির্ভাবকাল ১৭২৫ সালের কাছাকাছি। তাই এমন অনুমান খুবই স্বাভাবিক যে, ১৭৫০ সালের দিকে গোঁজলা গুঁই এবং সহযোগীগণ কবিগানের উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন।[৪৮]

উদ্ভবস্থল

গোঁজলা গুঁইকে যদি কবিগানের আদিকবি হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, গোঁজলা গুঁইয়ের কর্মক্ষেত্রই কবিগানের উদ্ভবস্থল। কিন্তু সমস্যা হল, গোঁজলা গুঁইয়ের জন্মস্থান ও কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। তবে সুনিশ্চিতভাবে বলা না গেলেও প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য থেকে কবিগানের উদ্ভবস্থল সম্পর্কে আন্দাজ করা যায়। যেমন গোঁজলা গুইয়ের জন্মস্থান ও বংশপরিচয় সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্ত বিশেষ কোনো তথ্য প্রদান করতে না পারলেও তিনি তাঁর প্রধান শিষ্যদের জন্মস্থান ও কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে নানা ধরনের তথ্য সরবরাহ করেছেন। গোঁজলা গুঁই যদি আদিকবি হয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই তাঁকে তাঁর শিষ্যদের বিপরীতে গান করতে হয়েছে। অতএব তাঁর শিষ্যদের কর্মক্ষেত্রই পুরোপুরিভাবে তাঁরও কর্মক্ষেত্র ছিল। এই যুক্তিতে গোঁজলা গুঁইয়ের শিষ্যদের কর্মক্ষেত্রকে নিঃসন্দেহে কবিগানের উদ্ভবস্থল হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

গোঁজলা গুঁইয়ের প্রধান শিষ্য ছিলেন তিন জন। এঁদের জন্মস্থান নিয়ে কিছু বিতর্ক রয়েছে। যেমন রাজেন্দ্রলাল মিত্র লালু নন্দলালের জন্মস্থান নির্দেশ করেন হুগলি জেলার চুঁচুড়া অঞ্চলকে।[৪৯] কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র পালের ধারণা লালু নন্দলালের জন্মস্থান বীরভূম।[৫০] একইভাবে গোঁজলা গুঁইয়ের অন্যতম শিষ্য রঘুনাথ দাস তাঁর একটি গানে নিজেকে কোলকাতার শিমুলিয়াবাসী বলে দাবি করলেও ঈশ্বর

---

৪৬. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, *কবিজীবনী*, ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত (কোলকাতা : ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৫৮), পৃষ্ঠা ১৩৫-৩৬৫

৪৭. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, *কবিজীবনী*, পৃষ্ঠা ৩৪৫-৪৬

৪৮. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *গৌড়বঙ্গ-সংস্কৃতি* (কোলকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৯৭২), পৃষ্ঠা ১১৯

৪৯. প্রফুল্লচন্দ্র পাল, *প্রাচীন কবিওয়ালার গান* (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮), পৃষ্ঠা ৬৯

৫০. প্রফুল্লচন্দ্র পাল, *প্রাচীন কবিওয়ালার গান* (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮)– পৃষ্ঠা ৭০

গুপ্তের মতে তাঁর জন্মস্থান ছিল হুগলির চন্দননগর (ফরাসডাঙা)।[৫১] অন্যদিকে গবেষক নিরঞ্জন চক্রবর্তীর মতে তাঁর জন্মস্থান ছিল হুগলি জেলার চুঁচুড়া। গোঁজলা গুইয়ের অন্য এক শিষ্য রামজী দাসের জন্মস্থান নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। ঈশ্বর গুপ্ত মনে করতেন তিনি বীরভূম অঞ্চলের কবিয়াল, কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অভিমত অনুযায়ী তিনি হুগলি জেলার অধিবাসী ছিলেন।[৫২] গোঁজলা গুঁইয়ের শিষ্যত্রয়ের জন্মস্থান নিয়ে বিতর্ক থাকলেও সকলে অন্তত দুটি অঞ্চলের মধ্যে তাঁদের জন্ম হয়েছিল বলে মনে করেন : একটি হুগলি, অন্যটি বীরভূম। এই তথ্য বিবেচনায় রাখলে গোঁজলা গুঁইয়ের জন্মস্থানও এই দুটি জেলার মধ্যে অথবা এর নিকটবর্তী কোনো জেলায় হওয়ার কথা।

গোঁজলা গুঁইয়ের নাম এবং পদবি খানিকটা ব্যতিক্রমধর্মী। নাম-পদবির এই ধরন দেখে কোনো সন্দেহ থাকে না যে, তিনি আঠারো শতকের লোক, যখন বাংলা ভাষার সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়া জোরালোভাবে শুরু হয়নি। এছাড়া গুঁই পদবি থেকে মনে হয় তিনি আগুরি বা কায়স্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।[৫৩] আগুরি সম্প্রদায়ের বাস প্রধানত বর্ধমান অঞ্চলে। তাই এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, গোঁজলা গুঁই আঠারো শতকের সূচনায় বর্ধমান জেলার কোনো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

তিন প্রধান কবিয়ালের শিষ্যবর্গকে নিকটবর্তী অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করতে দেখা যায়। সমকালের যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা বিবেচনায় রাখলে এমন অনুমান খুবই স্বাভাবিক যে, প্রথমদিকে গোঁজলা গুঁই এবং তাঁর অনুসারীদের চারণক্ষেত্র বীরভূম, বর্ধমান, হুগলি প্রভৃতি জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অঞ্চলটিকে এক কথায় রাঢ় অঞ্চল নামে অভিহিত করা যায়। এই রাঢ় অঞ্চলে তখন এমন কিছু সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে ওঠা সম্ভব, যা কবিগান নামক সংগীতশাখার উদ্ভবের কারণ হয়।

এ প্রসঙ্গে গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্যের দাবি একটি দিক দিয়ে বিবেচনাযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, কবিগান যশোরের ভাটকলাগাছিতে উদ্ভূত হয়ে পরে শান্তিপুরে যায়, সেখান থেকে চুঁচুড়া হয়ে কোলকাতায় পৌঁছায়।[৫৪] উদ্ভব সংক্রান্ত গঙ্গাচরণের দাবি হয়তো গ্রহণযোগ্য নয়, কিন্তু তিনি স্থানানুক্রমের ভাটকলাগাছি-শান্তিপুর-চুঁচুড়া-কোলকাতার যে ধারাবাহিকতা উল্লেখ করেন এবং তাকে চুঁচুড়াকে যেভাবে গুরুত্ব দান করা হয়, তাতে মনে হয়, আঠারো শতক নাগাদ চুঁচুড়া অঞ্চলটি কবিগান বা এইজাতীয় সংগীত-সংগ্রামের একটির উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে।

হুগলি এবং বীরভূমের মধ্যে মাঝখানে বর্ধমান জেলা। একদিকে হুগলি একেবারে কোলকাতার নিকটে, অন্যদিকে বীরভূম বাংলার প্রত্যন্ত পশ্চিমে। কোনো এক ব্যক্তির জন্মস্থান নিয়ে যখন উভয় স্থানের দাবি ওঠে, তখন এমন মনে করা হয়তো স্বাভাবিক যে, একটি অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করলেও অন্য অঞ্চলের কর্মব্যাপদেশ ক্রমে তাঁকে অন্য অঞ্চলে স্থায়ী হতে বাধ্য করে। কালক্রমে সেই অঞ্চলই তাঁর জন্মভূমি হিসেবে মানুষের নিকট ধারণা সৃষ্টি করে। লালু নন্দলালের ক্ষেত্রে তেমনটা ঘটতে পারে। এমনও হতে পারে যে, কবিগান প্রথমে বীরভূম-বর্ধমান অঞ্চলে সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু হুগলি-চুঁচুড়া অঞ্চলের পৃষ্ঠপোষকতার কারণে বর্ধমান ও বীরভূম থেকে খ্যাতিমান কবিয়ালগণ হুগলি অঞ্চলে অভিবাসিত হতে শুরু করেছিলেন এবং হুগলি অঞ্চলের শ্রোতাদের চাহিদা অনযায়ী কবিগানের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন ঘটেছিল।[৫৫]

কবিগানের উদ্ভবপর্বে বিশেষভাবে আঠারো শতকে কবিগান পরিবেশন করেছিলেন বলে যাঁদের নাম পাওয়া যায়, তাঁদের অধিকাংশের জন্মস্থান বাঁকুড়া, বীরভূম, হুগলি প্রভৃতি অঞ্চলে। এ থেকে ধারণা

---

৫১. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, *কবিজীবনী*, পৃষ্ঠা ৩৪৬

৫২. নিরঞ্জন চক্রবর্তী, *ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য*, পৃষ্ঠা ৪৫

৫৩. লোকেশ্বর বসু, *আমাদের পদবীর ইতিহাস* (কোলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স ১৯৮১), পৃষ্ঠা ৮১

৫৪. নিরঞ্জন চক্রবর্তী, *ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলাসাহিত্য*, পৃষ্ঠা ২৯

৫৫. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ৬৫

করা যেতে পারে যে রাঢ় অঞ্চলকে ঘিরেই কবিগানের উদ্ভব ঘটেছিল। এর অব্যবহিত পরে অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রায় পুরোটা জুড়ে কোলকাতাই হয়ে উঠেছিল কবিগানের লালন ও চর্চার কেন্দ্রভূমি। সমকালীন জমিদারদের কল্যাণে এ সময়ের কবিগান বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায়।

রাঢ় অঞ্চলে উদ্ভূত এই কবিগানের গুণগত মান উনিশ শতকের সমৃদ্ধ কোলকাতার শ্রোতাদের আকৃষ্ট করে থাকবে। শ্রোতাদের সমৃদ্ধি গায়কের সমৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলার কারণে কোলকাতা এবং এর নিকটবর্তী অঞ্চলের অনেকে কবিগানের পেশায় আসতে শুরু করেছিলেন। এ সময়ে এই পেশার সঙ্গে যাঁরা নিজেদের জড়িত করেছিলেন, তাঁদের বেশ বড় একটি অংশ আর্থিকভাবে বিত্তবান, এমনকি সামাজিকভাবেও মর্যাদাবান ছিলেন। গোঁজলা গুঁই এবং তাঁর প্রধান শিষ্যের পদবি দেখে বোঝা যায়, তাঁরা কেউ ব্রাহ্মণ ছিলেন না। কবিগান কোলকাতায় স্থানান্তরের সঙ্গে সঙ্গে কবিয়ালদের বিত্ত ও সামাজিক মর্যাদায় পরিবর্তন ঘটে। অনেক ভূস্বামী শখের দল গঠন করেন, অনেক ব্রাহ্মণ-সন্তান এই পেশায় এগিয়ে আসেন, এমনকি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশীদার একাধিক ফিরিঙ্গিকেও এই পেশা আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়।

উনিশ শতকে কোলকাতার যেসব এলাকায় কবিগানের আসর বসত তার মধ্যে শোভাবাজার, বাগবাজার, জোড়াসাঁকো, বউবাজার, তারকেশ্বর, বরানগর, কাশিমবাজার প্রভৃতি এলাকার নাম বিশেষভাবে অবগত হওয়া যায়। এ সময়ে চন্দননগর (ফরাসডাঙা), চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর, সপ্তগ্রাম, বীরভূম জেলার সিউড়ি, নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর প্রভৃতি অঞ্চলেও কবিগান চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। পাশাপাশি কোলকাতার জমিদারদের মফস্বলের জমিদারি এলাকাগুলোতে কবিগান পরিবেশিত হতে শুরু করে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের অন্যতম খ্যাতিমান কবিয়াল ভোলা ময়রা এই সূত্রে প্রায় নিয়মিতভাবেই চব্বিশ পরগনা, হুগলি, মেদিনীপুর, হাওড়া, বাঁকুড়া, নদীয়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী প্রভৃতি এলাকায় কবিগান পরিবেশন করতেন। কবিগানের আবশ্যিকভাবেই যেহেতু দুইজন কবিয়াল ও দুইটি কবির দলের প্রয়োজন, সেহেতু এমন অনুমান খুবই স্বাভাবিক যে, ভোলা ময়রার প্রতিদ্বন্দ্বী কবিয়ালগণকেও ঐসব অঞ্চলে গিয়ে গান পরিবেশন করতে হয়েছে। কোলকাতার এই কবিয়ালগণের গ্রামবাংলায় নিয়মিত আগমনের ফলে যে শ্রোতৃমণ্ডলী তৈরি হয়, সেই শ্রোতৃমণ্ডলীর ক্রমবর্ধমান চাহিদায়ই গ্রামবাংলায় নতুন নতুন কবিয়ালের জন্ম হতে থাকে। উনিশ শতকের শেষার্ধ নাগাদ কবিগান এভাবে সমস্ত বঙ্গদেশে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায়। কিন্তু বিশ শতকের সূচনায় অন্যান্য বিনোদন মাধ্যমে প্রতি শোতৃমণ্ডলীর আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে খোদ কোলকাতা থেকে কবিগান লোপ পেতে শুরু করে। সঙ্গত কারণে মফস্বলে তার প্রভাব পড়ে। কিন্তু বাংলাদেশের সব অঞ্চলে থেকে লুপ্ত হতে শুরু করলেও ঠিক এই সময়ে পূর্ববঙ্গের একাধিক অঞ্চলে কবিগান নতুনভাবে উজ্জীবিত হয় এবং পুরো বিশ শতক জুড়ে পূর্ববঙ্গে কবিগানের চর্চা অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে হতে থাকে।

উদ্ভাবক

প্রাসঙ্গিক প্রায় সকল আলোচকই গোঁজলা গুঁইকে কবিগানের আদিপর্ব বা উদ্ভাবক হিসেবে স্বীকার করেন। কবিগানের পরিবেশনের রীতি বিবেচনায় রাখলে বিশেষ কোনো একজনকে কবিগানের উদ্ভাবক বলাটা খানিকটা অসঙ্গতিপূর্ণ; বিশেষভাবে যে গানের অন্তত দুজন কবিয়ালকে পরস্পরের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। এই যুক্তিতে গোঁজলা গুঁইয়ের ঘনিষ্ঠ নিকটবর্তী তিন শিষ্যকেও কবিগানের উদ্ভাবকের সারিতে নিয়ে আসা যায়। বিভিন্ন উৎস থেকে এঁদের সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়, তা নিম্নরূপ।

১৮৫৪ সালের নভেম্বর মাসে ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় আদি কবিয়াল হিসেবে গোঁজলা গুইয়ের নাম সর্বপ্রথম উত্থাপন করেন। তিনি জানান,

"১৪০ বা ১৫০ বর্ষ গত হইল 'গোঁজলা গুঁই' নামক এক ব্যক্তি পেসাদারি দল করিয়া ধনিদিগের গৃহে গাহনা করিতেন।"

ঠিক কোন অঞ্চলে তিনি কবিগান বসতেন, ঈশ্বর গুপ্ত তা উল্লেখ করেননি। তবে জন্মস্থান যেখানেই হোক-না কেন হুগলি জেলার বর্ধিষ্ণু অঞ্চলগুলোতে তিনি কবিগান পরিবেশন করতেন বলে মনে হয়। ঈশ্বরগুপ্ত গুঁইয়ের রচিত দুটি গানের অংশবিশেষ, গান পরিবেশনের রীতি এবং তাঁর প্রধান তিন শিষ্য সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যে মন্তব্য করেছেন, গুঁই সম্পর্কে এর বেশি জানা যায় না।

ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর পত্রিকায় গোঁজলা গুঁইয়ের দুটি গান উদ্ধৃত করেছিলেন। এর মধ্যে প্রথম গানটিকে মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ বলে মনে হয়। সেটি নিম্নরূপ :

"এসো এসো চাঁদবদনি
এ রসে নিরসো কোরো না ধনি ॥
তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ
তুমি কমলিনী আমি সে ভৃঙ্গ,
অনুমানে বুঝি আমি সে ভুজঙ্গ,
তুমি আমার তায় রতনমণি।
তোমাতে আমাতে একই কায়া,
আমি দেহপ্রাণ, তুমি লো ছায়া,
আমি মহাপ্রাণী, তুমি লো মায়া,
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি ॥"[৫৭]

আপাত দৃষ্টিতে উনিশ-বিশ শতকে কবিগানের প্রথমে পরিবেশনযোগ্য ডাক-জাতীয় গানের গঠনের সঙ্গে প্রথম গানটির খানিকটা মিল পাওয়া যায়, যদিও বিষয়ের কথা বিবেচনা করলে এটিকে সখীসংবাদ ধরনের মনে হতে পারে। কিন্তু সখীসংবাদ-জাতীয় গানে এক ধরনের প্রশ্ন থাকে, যা চাপান বা উতোর নামে পরিচিত, তা এখানে অনুপস্থিত।

গোঁজলা গুঁইকে আদি কবিয়াল বললেও প্রমাণের এই অভাব স্বয়ং ঈশ্বর গুপ্তকেও ভাবিত করেছিল বলে মনে হয়। কেননা টপ্পার মতো এই গানের প্রথমে মহড়া এবং পরে চিতেন অংশ রয়েছে। এ ব্যাপারে কৈফিয়ত দিতে গিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত জানান যে, গোঁজলা গুঁইয়ের সমকালে

'অগ্রে চিতেন ধরিয়া গাহনার প্রথা ছিল না। টপ্পার নিয়মানুসারে প্রথমে মহড়া ধরিয়া পর পরে চিতেন ও অন্তরা গাহিত।'[৫৮]

মহড়া এবং চিতেনের এই স্থানবদলের বিষয়টি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া কঠিন। আবার এমনও হতে পারে যে, কবিয়াল নিজেই মহড়া এবং চিতেনকে অদল-বদল করে লিখেছিলেন কিনা। বিশ শতকের কবিগান সংগ্রহ করতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র সিংহকে এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন,

"কবিয়ালদের গানের খাতায় এসব গান লিখবার বেলায় এক অদ্ভুত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে– যার সঙ্গে গাইবার ধারার কোনো মিল নেই। গান লিখবার ক্ষেত্রে এ রকম কিম্ভূত ধারা অবলম্বনের কারণ জিজ্ঞাসা করে জানা গেছে যে, গানের খাতা হারিয়ে গেলে বা চুরি হলে, অন্য দল যাতে গানের আদ্য মধ্য ও অন্ত অর্থাৎ কোথায় শুরু আর কোথায় শেষ বুঝতে না পারে, তাই তারা গানটিকে তিন অংশে বিভাজন করে উল্টেপাল্টে লিখে থাকেন।"[৫৯]

---

৫৭. উদ্ধৃত; ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, *কবিজীবনী*, পৃষ্ঠা ৩৪৭-৪৮

৫৮. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, *কবিজীবনী*, পৃষ্ঠা ৩৪৮

৫৯. দীনেশচন্দ্র সিংহ, *পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা* (কোলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭), পৃষ্ঠা ঞ

আবার এক এক ধরনের গানের তুকবিন্যাস এক-এক রকমের হয়ে থাকে। টপ্পা গানের যেটা মহড়া, কবিগানে সেটা চিতেন; অথবা টপ্পা গানে যেটা চিতেন, কবিগানে সেটা মহড়া নামে পরিচিত ছিল কিনা, সে সম্পর্কেও সুনিশ্চিত হওয়া কঠিন। ঈশ্বর গুপ্ত নিজে কবিগানের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাই বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর এমন কৈফিয়ত দিতে দেখে সন্দেহ হয়, গোঁজলা গুঁইয়ের নামে প্রচলিত গান দুটি আদৌ কবিগান কিনা।

কবিগানের পৃষ্ঠপোষক

'একাকী গায়কের নহে তো গান'– রবীন্দ্রনাথের এই চরণটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। বস্তুত কোনো গান তৈরি হয় তখন, যখন সেই গান শোনার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ও শ্রোতার জন্ম হয়। কবিগানের ক্ষেত্রেও তা সত্য। গোঁজলা গুঁই এবং তাঁর শিষ্যদের আবির্ভাবকাল বিবেচনা করে মনে করা যেতে পারে যে, আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে কোলকাতায় কবিগানের উদ্ভব ঘটে।

আঠারো শতকের কোলকাতায় নতুন এই বিত্তবান শ্রেণি প্রচলত শিক্ষা-দীক্ষায় কম-বেশি শিক্ষিত ছিলেন, তা অনুমান করা যায়। কারণ সমকালীন হিন্দু সমাজব্যবস্থা অনুযায়ী বিশেষ কিছু জাত, যেমন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ এবং অন্যান্য কিছু সৎ শূদ্র জাতের মধ্যে লেখাপড়ার অধিকার সীমিত ছিল। আবার এইসব জাতের লোকজনই মুসলিম শাসনামলে এবং ব্রিটিশ শাসনামলের প্রথমদিকে ক্ষমতাবলয়ের কাছাকাছি বাস করত। অর্থাৎ সামাজিকভাবে যারা মর্যাদা ভোগ করত, অর্থনৈতিকভাবেও তাদের উন্নতি করার সুযোগ থাকত। সেই সুযোগ যে যথাযথভাবে কাজে লাগে, তা বোঝা যায়, সমকালে কোলকাতায় বসবাসকারী জমিদারদের পদবি দেখে। দু-একটি ব্যতিক্রম বাদে এঁরা সকলেই ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ শ্রেণির। কয়েক শতাব্দী ধরে এই জাতগুলো এমন একটি সামাজিক বলয় সৃষ্টি করে রাখে, যাতে এঁরা ছাড়া আর কারো পক্ষে ক্ষমতার কেন্দ্রে উঠে আসা সম্ভব হয় না। তাই আঠারো শতকের জমিদারদের সম্পর্কে প্রচলিত যে ধারণা রয়েছে, এবং বলা হয়েছে এর ফলে অশিক্ষিত ও অমার্জিত লোক হঠাৎ জমিদার হয়ে ক্ষমতার বলয়ে প্রবেশ করেছে, তা আদপে সত্য নয়।[৬০] বস্তুত শাসকের বদল হলেও জমিদার শ্রেণির সামাজিক পরিচয়ে বিশেষ কোনো হেরফের ঘটেনি। নতুন কিছু জমিদারের সৃষ্টি হলেও আসলে তা অভিন্ন সামাজিক শ্রেণি থেকে উঠে আসা। ফলে মুসলিম শাসনামলের জমিদারদের শিক্ষাগত ও সংস্কৃতিগত যেসব বৈশিষ্ট্য ছিল, আঠারো শতকের জমিদারদের শিক্ষাগত ও সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য তার থেকে আলাদা কিছু হয় না।

আঠারো শতকে উদ্ভূত কবিগানের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে নতুন এই জমিদার শ্রেণির রুচিকে কটাক্ষ করা তাই অমূলক। কারণ মুসলিম শাসনামলের জমিদারগণও অভিন্ন রুচির অধিকারী ছিলেন। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত জমিদারদের তুলনায় তাঁদের রুচি ও জীবনবোধ অনুন্নত ছিল, তা বোধগম্য; কিন্তু তাই বলে ব্রিটিশ আমলে নতুন জমিদার তৈরি না হলে জমিদারদের রুচি ও সংস্কৃতি উন্নততর থাকত, এমন কল্পনা অযৌক্তিক।

প্রসঙ্গত নবদ্বীপের কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের (১৭১০–১৭৮৩) উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি কোলকাতা থেকে বেশ দূরে বাস করতেন। কিন্তু রুচির দিক দিয়ে কোলকাতার জমিদারদের চেয়ে তিনি খুব ভিন্ন ছিলেন না। জানা যায়, তাঁর রাজধানী কৃষ্ণনগরে দুর্গাপূজার নবমীর দিনে নবমী কীর্তন উপলক্ষে মহিষ বলিদানের পর উপলক্ষে কাদাখেউড় নামে একটি অনুষ্ঠান হত। এই অনুষ্ঠানে তিনি নিজে এবং তাঁর পুত্ররা অশ্লীল গান রচনা করতেন এবং গাইতেন।[৬১]

---

৬০. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলাসাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭

৬১. নগেন্দ্রনাথ বসু, সম্পাদিত, *বিশ্বকোষ*, 'কবি' ভুক্তি

আঠারো শতকে কোলকাতায় বসবাসকারী জমিদারদের প্রতি যেসব অভিযোগ উত্থাপন করা হয়ে থাকে, তাঁরা স্থূল রুচির, তাঁরা হৈ-হল্লা করে জীবন কাটাতে পছন্দ করেন, তাঁরা বারাঙ্গনাবিলাসী, তাঁরা ঘুড়ি ও কবুতর ওড়ানোর প্রতিযোগিতা করেন। এ পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু যখন অভিযোগ করা হয়, তাঁরা গানের আসর বসান, সারারাত ধরে গান শোনেন, তখন সেই অভিয়োগ প্রশংসার মতো শোনায়। বস্তুত আঠারো শতকের কোলকাতায় বসবাসকারী এইসব জমিদারই ছিলেন কবিগানের মূল উদ্ভাবক। তাঁরা তাঁদের সাংস্কৃতিক জীবনের শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে এই ধরনের একটি সংগীতমাধ্যমের জন্ম দিয়েছিলেন। অর্থাৎ আঠারো শতকের মাঝামাঝি যে-কবিগানের জন্ম হল, তা এই সময়ের জমিদারদের সাংস্কৃতিক আকাঙ্ক্ষার ফল। বস্তুত কবিগানের জন্ম সফল করতে তাঁরা অর্থ ব্যয় করেছেন, শ্রম দিয়েছেন, সময় দিয়েছেন। তার ফলে জন্ম হয়েছে বহু সফল কবিয়ালের, যাঁদের হাতে ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করেছে কবিগান। অর্থাৎ প্রথমদিকে শুরু হওয়া কবিগান এই জমিদারদের আগ্রহ অনুসারে পরিবর্তিত হয়েছে, সংশোধিত হয়েছে, পরিমার্জিত হয়েছে এবং ক্রমে কবিগান হয়ে উঠেছে তাঁদের সাংস্কৃতিক জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। কোনো কোনো জমিদার এর পৃষ্ঠপোষকতার সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলেন যে, অনেকে নিজের উদ্যোগে কবিগানের দল গঠন করেছিলেন।

কবিগানের প্রতি বিশেষ অনুরাগী জমিদারদের মধ্যে যাঁদের নাম জানা যায়, তাঁদের মধ্যে কাশিমবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণ দেববাহাদুর এবং তাঁর পুত্র রাজকৃষ্ণ দেববাহাদুরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬২) গ্রন্থে রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতার বিষয়টি নিম্নরূপে বর্ণনা করেন :

> "কবি। রাজা নবকৃষ্ণ কবির বড় পেট্রন ছিলেন। ইংলন্ডের কুইন এলিজাবেথের আমলে যেমন বড় বড় কবি ও গ্রন্থকর্তা জন্মান, তেমনি তাঁর আমলেও সেই রাম বসু, হরু, নিলু, রামপ্রসাদ ঠাকুর ও জগা প্রভৃতি বড় বড় কবিওয়ালা জন্মায়। তিনি কবিগাওনার মান বাড়ান, তাঁর অনুরোধে ও দেখাদেখি অনেক বড় মানুষ কবিতে মাতলেন। বাগবাজারের পক্ষীর দল এই সময় জন্মগ্রহণ করে। শিবচন্দ্র ঠাকুর (পক্ষীর দলের সৃষ্টিকর্তা) নবকৃষ্ণের একজন ইয়ার ছিলেন।"[৬২]

সমকালের জমিদার ও বিত্তবান শ্রেণি বিভিন্নভাবে কবিগানের পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে আসেন। কেউ শখের দল করেছিলেন, কেউ বিভিন্ন উপলক্ষে কবিগানের আয়োজন করেছিলেন, আবার খিদিরপুরের জমিদার জয়নারায়ণ ঘোষালের মতো কেউ কবিগান সংকলনের কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। যাঁরা কবিগানের দল গঠন করে কবিগানের বিকাশে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন পাথুরেঘাটার ঠাকুর বংশীয় জমিদারগণ, জোড়াসাঁকোর সিংহ বংশীয় জমিদারগণ, গরাণহাটার কৃষ্ণমোহন বসাক ও বাবুমোহন বসাক, শোভাবাজার কালীশঙ্কর ঘোষের উত্তরাধিকারীগণ, শ্যামপুকুরের দিগম্বর মিত্র ও হলধর ঘোষ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। যাঁরা কবিগানের আয়োজন করে কবিগানের বিকাশে সহায়তা করেছেন, তাঁদের মধ্যে বর্ধমানের মহারাজাগণ, নবদ্বীপের মহারাজাগণ, মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজারস্থ রাজা হরিনাথ কুমার বাহাদুর, পটলডাঙার রূপনারায়ণ ঘোষাল, কোলকাতা দয়েহাটার গুরুচরণ মল্লিক, ফরাসডাঙার শাসনকর্তা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, বড়বাজারর রামসেবক মল্লিক প্রমুখ প্রধান।[৬৩]

---

৬২. কালীপ্রসন্ন সিংহ, *হুতোম প্যাঁচার নকশা* (পুনর্মুদ্রণ, কোলকাতা : মনোমোহন প্রকাশনী, ১৯৮৩), পৃষ্ঠা ৩৮

৬৩. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা– ৭১

দ্বিতীয় অধ্যায়

কবিগানের বিকাশকাল

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী এই দুশো বছর ধরে কবিগান বিকাশ লাভ করেছে। ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়েছে এর বিষয়বস্তু, আঙ্গিক এবং পরিবেশন রীতি-পদ্ধতিও। এ পর্যন্ত একশরও বেশি কবিয়াল কবিগানের বিকাশের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। প্রথম যে কবিয়ালের নাম শোনা যায় তা বেশ বিচিত্র। গোঁজলা গুঁই। গোঁজলা গুঁইয়ের পরে কবিগানকে যাঁরা বিকাশ ঘটিয়েছেন তাঁরা হলেন– রামবসু, রাসু, নৃসিংহ, হরুঠাকুর, ভোলা ময়রা, নিধুবাবু, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, যজ্ঞেশ্বরী, গোবিন্দ তাঁতী, পাঁচু দত্ত, কাশীনাথ সরকার, তারক সরকার, হরিবর সরকার, কেষ্টমুচি, ভবানী, রামানন্দ নন্দী, বিজয় নারায়ণ আচার্য, হরিচরণ আচার্য, রমেশ শীল, গুমানি দেওয়ান, রাজেন্দ্র সরকার, মনোহর সরকার, নকুল দত্ত, বিজয় সরকার, নিশিকান্ত সরকার, রসিকলাল সরকার, নারায়ণ বালা, কালিদাস সরকার, স্বরূপেন্দু সরকার প্রমুখ কবিয়ালগণ।

কবিগানের এই দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় পরিবেশন-পদ্ধতিতেও এসেছে অনেক পরিবর্তন। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গে কবিগান পরিবেশন-পদ্ধতির সাথে পূর্ববঙ্গের পরিবেশন-পদ্ধতির রয়েছে অনেক পার্থক্য। আবার পূর্ববঙ্গের যশোর-খুলনা-ফরিদপুর-বরিশাল এলাকার পদ্ধতির সাথে ময়মনসিংহ এবং নোয়াখালী চট্টগ্রামের কবিগান পরিবেশন-পদ্ধতির পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। প্রথমকালে কোলকাতায় যে পরিবেশে এবং পদ্ধতিতে কবিগান গাওয়া হত পরে পশ্চিমবঙ্গে সকল এলাকাতেই তার পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই অঞ্চলে কবিগান বলতে অনেকেই এক সময় তরজাগানকে বুঝতেন। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং দেশভাগের কারণে পূর্ববঙ্গের কবিরা কোলকাতা এবং ওই বঙ্গে বহু গ্রামাঞ্চলে অবস্থান নেন এবং সংগীত পরিবেশন করার মাধ্যমে দুই বঙ্গের পরিবেশন-পদ্ধতির একটা সম্মিলন ঘটেছে। তাছাড়া ১৯৪৭ সালের পর পূর্ববঙ্গ থেকে দলে দলে দেশত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপক গ্রাম এলাকায় স্থায়ীভাবে স্থান নেয়া এবং তারা কবিগানের পৃষ্ঠপোষক হওয়ার দরুন ওদেশেও কবিগানের নানান পরিবর্তন এসেছে।

অষ্টাদশ শতকে কোলকাতায় যখন কবিগানের প্রচলন হচ্ছে তখন পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ এলাকায় ব্যাপকভাবে 'কবিগানের আনন্দস্রোত' বয়ে চলেছে। এর এই ব্যাপকতার কারণে অনুমান করা যায় যে এ অঞ্চলে কবিগান আরো পূর্বকাল থেকে প্রচলিত এবং তা কোলকাতার অনুকরণে পরিচালিত নয়। তবে পশ্চিমবঙ্গে যখন প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গিতে কবিগানের যে কালরূপ তা পূর্ববঙ্গের কবিগানে প্রভাব ফেলেছিল বলে অনুমিত হয়। 'কবিগান'– এই নামটিও নাকি পশ্চিমবঙ্গ থেকে নেয়া।

> "পূর্ববাংলার কবিগানের বহিরাঙ্গেও কিছু কিছু পশ্চিমবঙ্গীয় ছাপ পড়ে ছিল; কালক্রমে পশ্চিমবঙ্গীয় অনেক পারিভাষিক শব্দ পূর্ববঙ্গীয় শব্দকে স্থানচ্যুত করে ফেলে, এবং সমগ্র বিষয়টিকেই পশ্চিমবঙ্গজ বলে মনে হতে থাকে।"

উনিশ শতকে কোলকাতার কবিগানের যে রূপ তার সাথে পূর্বপারের মিল পাওয়া কঠিন। এ ব্যাপারে দৃষ্টান্ত হিসেবে রাম বসুর কথা উল্লেখ করা যায়। রাম বসুর (১৭৮৬-১৮২৮) পূর্বে কবিগানের যে চাপাতো-উতোর হত কবিয়ালগণ তা পূর্বেই রচনা করে দিতেন। রামবসু সর্বপ্রথম এটিকে সত্যিকার লড়াইয়ের পর্যায়ে নিয়ে আসেন– যে লড়াই কবিগানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ একজন কবিয়াল আসরে কোনো একটা সখিসংবাদ বা খেউড় পরিবেশন করার পর বিপক্ষ কবিয়ালকে তাতে ক্ষণিকভাবে তার জবাব গান তৈরি করার রীতি চালু করেন।

উনিশ শতকের চল্লিশের দশক থেকে বিশ শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত একশো বছরেরও বেশি সময়ের বাংলাদেশী (তৎকালীন পূর্ববাংলার) কবিগানের একটা স্পষ্ট রূপরেখা আমরা অঙ্কন করতে পারি। এই সময়সীমার মধ্যে এখানকার কবিগানের রূপে ও বিষয়ে অনেক বিবর্তন ঘটেছে, অনেক প্রতিভাবান কবি-সরকারের অবদানে কবিগান বিপুল সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। উনিশ শতকে অনেক শক্তিমান কবি-সরকারের হাতে বাংলাদেশের কবিগানের স্বকীয় রূপটি গড়ে ওঠে। এর পর বিশ শতকের শুরু থেকেই কবিগানে যুগান্তরের স্পর্শ লাগে, এবং এই নতুন যুগের প্রাণপুরুষ হলেন ঢাকা জেলার নরসিংদীর কবিয়াল হরিচরণ আচার্য। চল্লিশের দশকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, ব্রিটিশবিরোধী 'ভারত ছাড়'-আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে বিস্তৃতি ঘটে প্রগতিশীল কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনেরও। প্রগতিমুখী সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। পত্তন হয় 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ' নামক শক্তিশালী সাংস্কৃতিক সংগঠনের। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের কবিগানে চট্টগ্রামের রমেশ শীল রীতিমতো এক বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেন। লৌকিক ঐতিহ্যের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে থেকেই কবিগানে ঐতিহ্যের বৈপ্লবিক নবজন্ম ঘটে যায়।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্য গ্রন্থে 'কবি সংগীত' প্রবন্ধে কবিগানকে 'নতুন সামগ্রী', নষ্ট পরমায়ু বলেছেন যা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করা যায় না। এ প্রসঙ্গে যতীন সরকারের বক্তব্য গ্রহণীয়। তিনি বলছেন,

> "উদ্ভব থেকে পরিণতি পর্যন্ত সব সময়েই এ অঞ্চলের কবিগান ছিল আবহমান কালের লোকসংস্কৃতির মধ্যে দৃঢ়মূল। তাই রবীন্দ্রনাথ যে কবিগান সম্পর্কে বলেছেন, 'ইহা নতুন সামগ্রী'– তা নির্দ্বিধায় মেনে নেয়া চলে না; এবং বাংলার প্রাচীন কাব্যসাহিত্য এবং আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মাঝখানে কবিয়ালদের গান-এর স্থান অন্তত ময়মনসিংহের কবিগানের ক্ষেত্রে নির্দেশ করা চলে না। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ঢাকা-জয়দেবপুরে কবিগানের জমজমাট অবস্থাও বাংলাদেশের মাটিতে কবিগানের প্রাচীনতা ও সমৃদ্ধিরই দ্যোতক।"[১]

এই উদ্ভবকালে গান পরিবেশনার পদ্ধতির সাথে এখনকার পদ্ধতির রয়েছে বেশকিছু গরমিল। এখন কবিগানে ঢোল-কাঁসি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এ'দুটি যন্ত্র এবং এর যন্ত্রী ছাড়া বর্তমানে কবিগান অচল। বহু আসরে দেখা যায় ঢুলির সামান্য তাল কাটাতে কবিয়াল রেগে আগুন হয়েছেন। কাঁসি'র বাড়ি এতটুকু বেতালে পড়লে কবিয়ালের গানের ছন্দ নষ্ট হয়। উদ্ভবকালে কিন্তু এই ঢোল এবং কাঁসির কোনো প্রচলনই ছিল না। এর বদলে তাঁরা ব্যবহার করতেন খোল ও করতাল– যা এখন কবিগানে কল্পনাই করা যায় না। এখন যেমন ছড়া এবং পাঁচালিই কবিগানের মূল প্রসঙ্গ, তখন তা ছিল না। তখন কেবল বিশ্রামের জন্য ছড়ায় দু-চার কথা বলা হত। এখন যেমন নানান কৌশলপূর্ণ কথাকাটাকাটির মধ্য দিয়ে জিতে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায় তখন তা ছিল না। তখন সবকিছুই গান দিয়ে সমাধান করতে হত। গানের জায়গায় গান দিয়েই দিতে হত, টপ্পার জবাব টপ্পা দিয়েই দিতে হত। একইভাবে কালের টানে, পরিবর্তনের ধারায় এখন কবিগান একটি রুচিশীল, ছান্দিক, কাব্যময় সর্বজনের উপভোগ্য কাব্যসংগীতে পরিণত হয়েছে এবং তা সর্বজন-লোকশিক্ষায় মূল্যবান অবদান রেখে চলেছে।

কোলকাতা পর্বের কবিয়াল

আঠারো ও উনিশ শতকের কোলকাতায় কবিগান যেভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে, তাতে এটা খুব স্বাভাবিক যে, কোলকাতা এবং তার আশপাশ এলাকার বহু প্রতিভাবান লোক এই পেশার সঙ্গে জড়িত হন। কবিগানের দলপ্রধান, যাঁকে অসাধারণভাবে সৃজনশীল ও তাৎক্ষণিক বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হতে হত, তিনি তো বটেই, কবিগানের অন্যান্য সদস্য, যাঁরা গায়ক এবং বাদক হিসেবে দলের মধ্যে থাকতেন, তাঁদেরও যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়ে দলের মধ্যে স্থান করে নিতে হত। কোলকাতায় তখন অনেকগুলো কবিগানের দল গড়ে উঠতে দেখে মনে হয়, কবিগান তখন বেশ ভালো একটি পেশায় পরিণত হয়।

---

১. যতীন সরকার, *বাংলাদেশের কবিগান* (ঢাকা : বিভাস, ২০১০), পৃষ্ঠা ২৩

কবিয়ালগণ সাধারণত গুরুপরম্পরায় পরিচিত হয়ে থাকেন। আদিকবি হিসেবে গোঁজলা গুইকে (আ. ১৭০০-১৭৬০) স্বীকার করে নেওয়ার মানে হল, আঠারো-উনিশ শতকের সব কবিয়ালই গোঁজলা গুঁইয়ের পরম্পরার অংশ। গোঁজলা গুঁইয়ের প্রধান শিষ্য ছিলেন তিন জন : লালু নন্দলাল (আ. ১৭২৫-১৭৮৫), রঘুনাথ দাস (১৭২৫-১৭৯০) এবং রামজী দাস (আ. ১৭২৫-১৭৯০)। লালু নন্দলালের প্রধান শিষ্য দুই জন : নিত্যানন্দ দাস ওরফে নিতাই বৈরাগী (১৭৫১-১৮২১) এবং বলহরি রায় (১৭৪৩-১৮৪৯)। নিত্যানন্দ দাসের শিষ্য রামনন্দ নন্দী (১৭৭৩-১৮৫৩)। অন্যদিকে বলহরি রায়ের দুজন খ্যাতিমান শিষ্য হলেন নিতাই দাস ও রাইচরণ দাস। রঘুনাথ দাসের শিষ্য হরু ঠাকুর (১৭৩৮-১৮২৫)। হরু ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন প্রখ্যাত কবিয়াল ভোলাময়রা (১৭৭৫-১৮৫১)। রামজী দাসের বিখ্যাত শিষ্যের নাম ভবানীচরণ বণিক ওরফে ভবানী বেনে (আ. ১৭৩২-১৮২০)। ভবানী বেনের শিষ্য ছিলেন রাম বসু (১৭৮৬-১৮২৮)।[২] প্রথম পর্যায়ের কবিগানের এই পরম্পরাকে নিম্নের লতিকা দিয়ে প্রকাশ করা যায়।

এই পরম্পরা লতিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মোটামুটিভাবে আঠারো শতক ও উনিশ শতকের প্রধান কবিগণ অভিন্ন একটি পরম্পরা বহন করছেন। বিশেষভাবে ভোলা ময়রা, রাম বসু প্রমুখ কবি উনিশ শতকের মাঝামাঝি এতটা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন যে, এঁরা শুধু কোলকাতাতেই নন, বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলে কবিগান পরিবেশনের আহ্বান পেতেন।

এই কালপর্বের অনেক বিখ্যাত কবিয়ালের গুরুর নাম পাওয়া যায় না। এমন হতে পারে যে, তাঁরা কোনো অখ্যাত কবিয়ালের নিকট তালিম নিয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন বলে গুরুর নাম শিষ্যের খ্যাতির নিচে চাপা পড়ে গেছে। এমন কবিয়ালদের মধ্যে অন্তত কেষ্টা মুচি এবং অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কবিয়ালদের পরম্পরা লতিকা

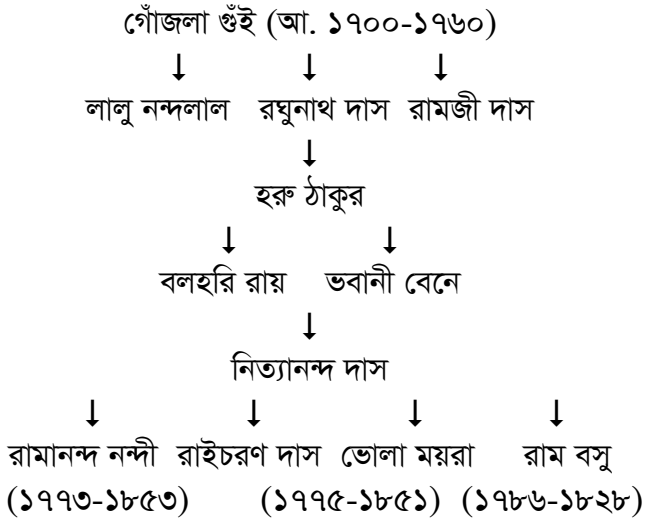

উৎস : মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, 'ভূমিকা', হারামণি, ৭ম খণ্ড (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৬৪), পৃ. আটষট্টি।[৩]

২. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ১০২
৩. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ১০৩

কবিয়ালদের সামাজিক অবস্থান নিয়ে একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় যে, তাঁরা প্রায় ক্ষেত্রেই সমাজের নিচুতলায় জন্মগ্রহণ করেছলেন। যেমন অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন :

> "সে যুগে, অধিকাংশ কবিওয়ালাই সমাজের অন্তেবাসী শ্রেণি থেকেই এসেছিলেন। হরু ঠাকুরই প্রথম ব্রাহ্মণ কবিওয়ালা।"[৪]

মন্তব্যটি সাধারণীকরণ দোষে দুষ্ট। ব্রাহ্মণ না হলেই সকলে অন্তেবাসী হয়ে যায় না। তাছাড়া অন্তেবাসী মানে হল অস্পৃশ্য সমাজের মানুষ। কিন্তু হরু ঠাকুরের সময়ে এবং তাঁর পূর্বে যাঁরা কবিগান করেছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলেই স্পৃশ্য সমাজের লোক ছিলেন বলেই মনে হয়, অন্তত পদবি থেকে তেমনটা ধারণা করা চলে। বস্তুত আদি কবি গোঁজলা গুঁই যেমন আগুরি বা কায়স্থ সম্প্রদায়ের অন্যরাও প্রায় ক্ষেত্রে কায়স্থ, বৈদ্য অথবা তথাকথিত উচ্চ বর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের ছিলেন, তাঁতি, শুঁড়ি, বা যুগি সম্প্রদায়ের, কবিয়ালের সংখ্যা সেই সারিতে একেবারে নগণ্য। অস্পৃশ্য সমাজের নেই বললে বলে। এই পরিসংখ্যানে কেষ্টা মুচি ছিলেন এবং এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। বিশেষভাবে যাঁরা শখের কবির দল করছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য অথবা যে-কোনো সৎশূদ্র বংশোদ্ভূত, যাঁরা ঐ সময়ে বিশেষ বিত্তের অধিকারী হতে পেরেছিলেন।

কোলকাতা পর্বের কবিগানের বেশ কয়েকজন মহিলা কবিয়ালের নাম পাওয়া যায়, যাঁদের মধ্যে যজ্ঞেশ্বরী নাম্নী কবিয়াল রাম বসুর শিষ্যা এবং প্রণয়নী ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। তিনি বাঁধনদার হিসেবেও বিশেষ নাম করেছিলেন। রাম বসু, ভোলা ময়রা প্রমুখের বিপক্ষে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে কবিগান পরিবেশন করতেন বলে জানা যায়। অন্য এক নারী কবিয়াল মোহিনী দাসীর বিপক্ষেও তাঁকে কবিগান করতে হত। কোলকাতা পর্বে যজ্ঞেশ্বরী ও মোহিনী দাসী ছাড়াও আরো অনেক নারী কবিয়ালের নাম জানা যায়, তাঁরা প্রধানত অন্তঃপুরে কবিগান পরিবেশন করতেন। এই দলগুলোতে সকল সদস্যই নারী থাকার কারণে এবং এই সদস্যরা প্রায় সকলে বৈষ্ণবী হওয়ার এই দলগুলোকে নেড়ি কবির দল বলা হত। এই ধরনের নেড়িকবির দলের কবিয়াল ছিলেন রত্নমণি, গোলোকমণি, দয়ামণি প্রমুখ। কোলকাতা পর্বের কবিগানে একমাত্র মুসলমান কবিয়ালের নাম পাওয়া যায়, যাঁর নাম হোসেন শেখ। তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার লোক ছিলেন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি কবিয়াল হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।[৫]

কোলকাতা পর্বে কবিগানের সংকলন

আঠারো ও উনিশ শতকের কোলকাতায় চাপান হিসেবে পরিবেশত কবিগানের অনেকগুলো সংকলন বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়। এসব গানের প্রথম সংকলন হিসেবে ঈশ্বর গুপ্তের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তিনি তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় (১৮৫৪-৫৫) প্রাচীন কবিওয়ালাদের জীবনী বর্ণনার পাশাপাশি তাঁদের রচিত বহু গান উদ্ধৃত করেন।

১৮৭৭ সালে গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'প্রাচীন কবিসংগ্রহ' গ্রন্থে ত্রিশ জন কবিয়ালের অনেকগুলো গান মুদ্রিত হয়। এঁদের প্রায় সকলেই ছিলেন উনিশ শতকের প্রথমার্ধের ও শেষার্ধের কবিয়াল। এই সংকলনে যেসব কবিয়ালের গান মুদ্রিত হয়, তাঁদের নাম হল : রাসু ও নৃসিংহ ভ্রাতৃদ্বয়, লালু নন্দলাল, রঘুনাথ দাস, গোঁজলা গুঁই, হরু ঠাকুর, রাম বসু, নিতাইদাস বৈরাগী, ভবানী বেণে, ভীমে মালাকার, নীলু ঠাকুর, রামপ্রসাদ ঠাকুর, ভোলা ময়রা, মোহন সরকার, লক্ষ্মীনারায়ণ যোগী, নীলমণি পাটনি, রামসুন্দর স্যাকরা, আন্টুনি ফিরিঙ্গি, গুরো দুম্বো, সৃষ্টিধর ছুতার, নারায়ণচন্দ্র

---

৪. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৭

৫. নিরঞ্জন চক্রবর্তী, *ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য*, পৃষ্ঠা ১৩২ ও অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৭ এবং দীপক বিশ্বাস, *কবিগান* (কোলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৪), পৃষ্ঠা ২৮

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরলাল হালদার, ঈশ্বরচন্দ্র হালদার, কালীচন্দ্র হালদার, গঙ্গাকান্ত মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮৯৪ সালে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবিগানের সংকলন প্রকাশ করেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠাফোলিওতে গ্রন্থটির নাম 'লুপ্তোরত্নোদ্ধার'। বইটি মুদ্রণের সময়ে জানা যায় যে, এই নামে আর একটি বই প্রকাশিত হয়েছে, তাই প্রচ্ছদপত্রে বইটির নাম করা হয় 'গুপ্তরত্নোদ্ধার'। এই সংকলনে যাঁদের কবিগান সংকরণ করা হয়, তাঁদের নাম : রাসু-নৃসিংহ, হরু ঠাকুর, রাম বসু, নিতাই ভট্টাচার্য, সাতু রায়, গদাধর মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়, গোরক্ষনাথ ও যজ্ঞেশ্বরী।

১৮৯৬ সালে মনুলাল মিশ্র কবিগানের যে সংকলন প্রকাশ করেন, তার নাম দেন 'প্রাচীন ওস্তাদি কবিগান'। এই সংকলনের রঘুনাথ দাস, রাম বসু, উদয়চাঁদ বৈরাগী, হরু ঠাকুর, আন্টনি, রামপ্রসাদ ঠাকুর, রাসু-নৃসিংহ, গোঁজলা গুঁই, নীলমণি পাটনি, লালু নন্দলাল, সৃষ্টিধর, নীলু ঠাকুর, নিতাইদাস বৈরাগী, লক্ষ্মীনারায়ণ যোগী, মোহন সরকার, পরাণচন্দ্র সিংহ, ভীমদাস মালাকার, ভবানী বেণে, নবাই ঠাকুর, গৌর কবিরাজ নীলকমল, ভোলা ময়রা, রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়, রামসুন্দর রায়, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রামপ্রসাদ ঠাকুর, রাসু সিংহ, গদাধর মুখোপাধ্যায়, রামকমল, রামজী দাস, গোবিন্দ্রচন্দ্র, সাতু রায়, ক্ষীরোদচন্দ্র, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, সীতানাথ মুখোপাধ্যায়, মাধব ময়রা, ঈশ্বর গুপ্ত প্রমুখের গান সংকলিত হয়। এঁদের মধ্যে সকলেই কবিয়াল ছিলেন না, কয়েকজন বাঁধনদারও ছিলেন।

১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হয় কবিগানের দুটি উল্লেখযোগ্য সংকলন। আয়তনের দিক দিয়ে পূর্ববর্তী যে কোনো সংকলনের চেয়ে এ দুটি বড়। এর একটির সংকলক ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র পাল। তাঁর বইয়ের নাম 'প্রাচীন কবিওয়ালার গান'। একটি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত। এখানে সত্তর জনের বেশি কবিয়ালের পাঁচশোর বেশি গান সংকলিত হয়েছে। অন্য সংকলকের নাম নিরঞ্জন চক্রবর্তী। তাঁর বইয়ের নাম 'ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য'। এখানেও সত্তর জনের বেশি কবিওয়ালার অর্ধসহস্রাধিক কবিগান সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্র পালের সংকলনে কোলকাতা ছাড়াও অন্যান্য অঞ্চল যেমন পূর্ববঙ্গের কিছু কবিগান সংকলিত হয়েছে।[৬]

আঠারো শতকের কোলকাতায় কবিগানের যে উদ্ভব ঘটে, তার চূড়ান্ত বিকাশ লক্ষণীয় হয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ। এই সময়ের কবিগানের সঙ্গে এমন কিছু প্রতিভা যুক্ত হয়, যা কবিগানকে অসাধারণ একটি শিল্পমাধ্যমে পরিণত করে। তার ফলে তা বাংলা সাহিত্যের মূল ধারাকে প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হয়। সেইসব গানের সাহিত্যিক মূল্যও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মূল্যায়িত হয়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ শুধু গানের কথাতেই নয়, কবিগানের সুরেও বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে কবিগানের মধ্যে বিভিন্ন রাগ-রাগিণী যুক্ত হয়। অসংখ্য তুকে বিন্যস্ত সেই কবিগান সাধারণ কবিয়ালের আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে হাফ-আখড়াই ও দাঁড়াকবির মতো দুটো আলাদা প্রকরণের জন্ম হয়। বস্তুত সেগুলো ছিল কবিগানের বৈঠকি সংস্করণ।

উনিশ শতকের কোলকাতায় ইউরোপীয় ধাঁচের আধুনিক সাহিত্য ও সংগীত সৃষ্টি হওয়ার কারণে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সমন্বয়ে গঠিত কবিগান ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে। যে কবিগান এক সময় দেশীয় সংজ্ঞায় সংস্কৃতিবান ব্যক্তিদের মনোরঞ্জন করে আসছিল, ইউরোপীয় ধাঁচের আধুনিক রুচির কারণে সেই কবিগান স্থূলতার অভিযোগ অভিযুক্ত হল। বিত্তবানরা আধুনিক হয়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে কবিগানের পৃষ্ঠপোষকতায় ভাটা পড়ল। নতুন পরিবেশে কবিগান যেহেতু পেশা হিসেবে লোভনীয় হয়ে উঠতে পারল না, সেহেতু প্রতিভাবান লোকদের আকৃষ্ট করতেও তা ব্যর্থ হল।

---

৬. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ১০৫-১০৬

কোলকাতা থেকে লুপ্ত হতে শুরু করলেও কবিগানের নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত হল গ্রামবাংলায়। কোলকাতার প্রভাবে উনিশ শতক থেকেই সেখানে এক ধরনের শ্রোতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সেই শ্রোতাদের চাহিদা মেটাতে গিয়ে সৃষ্টি হল নতুন নতুন দল আর নতুন নতুন কবিয়াল। বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে, বিশেষভাবে ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলে কবিগানের নবজন্ম ঘটল।[৭]

কবিগানের পূর্ববঙ্গ পর্ব

উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ কোলকাতা পর্বের কবিগানে ভাটা পড়তে শুরু করে। প্রধান কারণ কবিগানের শ্রোতা ও পৃষ্ঠপোষকতা হ্রাস পাওয়া। কবিগান চর্চার জন্য যে ধরনের সামাজিক বন্ধন দরকার, পরিবর্তনশীল কোলকাতা মহানগরীতে তার অভাব ঘটে। অন্যদিকে নতুন ধরনের একাধিক বিনোদন-মাধ্যমের প্রতি কোলকাতার বিত্তবান শ্রেণির ঝুঁকে পড়তে দেখা যায়। অন্যদিকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামীণ শহরগুলোতে, বিশেষভাবে যেসব অঞ্চলে বিখ্যাত জমিদারদের আবাস গড়ে উঠেছিল, সেসব অঞ্চলে কোলকাতার কবিগান পরিবেশিত হতে শুরু করে। এই কারণে ঐ সময়ের বিখ্যাত কবিয়াল ভোলা ময়রাকে কোলকাতা ছাড়াও হুগলি, হাওড়া, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, যশোর প্রভৃতি জেলার কবিগান করতে যেতে হত।[৮] কবিগানের সব সময়ে যেহেতু কমপক্ষে দুটো দলের প্রয়োজন হয়, তাই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, কোলকাতার ভোলা ময়রার প্রতিদ্বন্দ্বী কবিয়ালগণও এসব অঞ্চলে কবিগান পরিবেশন করতেন।

উনিশ শতকের শেষ নাগাদ কবিগান বাংলাদেশের গ্রাম পর্যায়ে জনপ্রিয় একটি বিনোদন-মাধ্যমে পরিণত হয়ে যায়। তাই উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কোলকাতায় যেমন শখের কবিগানের দল তৈরি হয়েছিল, একইভাবে পল্লিবঙ্গেও তা দেখা যেতে থাকে। এ প্রসঙ্গে ঢাকার ভাওয়ালের রাজা কালীনারায়ণ রায়ের গড়া কবিগানের দলের উল্লেখ করা যায়। জয়দেবপুরের রামকুমার সরকার ছিলেন তাঁর দলে কবিয়াল। কোলকাতার বিখ্যাত কবিয়াল সীতানাথ মুখোপাধ্যায়, মাধব ময়রা প্রমুখের বিপরীতে এই দল কবিগান পরিবেশন করে বলে জানা যায়।[৯]

বিশ শতকের সূচনা নাগাদ বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গের পল্লিগুলোতে কবিগান জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। এর ফলে পূর্ববঙ্গে কবিগান বিকাশের নতুন ক্ষেত্র তৈরি হয়। এক পর্যায়ে কোলকাতার প্রভাবে গোটা পশ্চিমবঙ্গ থেকে কবিগান বিদায় নেয়। কিন্তু ঠিক একই সময়ে পূর্ববঙ্গের পল্লিতে তা নতুন উদ্যমে বিকশিত হতে শুরু করে।

পূর্ববঙ্গে কবিগান জনপ্রিয় হতে শুরু করে উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ। প্রথমে হয়তো কোলকাতা অঞ্চলের শিল্পীরাই এসব অঞ্চলে গান গেয়ে বেড়াতেন। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ নাগাদ পল্লিবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পর্যাপ্ত সংখ্যক কবিগানের দল তৈরি হওয়ায়, কোলকাতা থেকে কবিগানের দল ভাড়া করার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়। সেইসঙ্গে সূচিত হয় কবিগানের মধ্যে আঞ্চলিক বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রক্রিয়া। এভাবে ময়মনসিংহ অঞ্চলের কবিগান, ঢাকা অঞ্চলের কবিগান, চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবিগান, বরিশাল অঞ্চলের কবিগান এবং যশোর অঞ্চলের কবিগানের মধ্যে আঙ্গিক ও বিষয়গত স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি হতে থাকে। এই স্বাতন্ত্র্য প্রথমদিকে যতটা স্পষ্ট না হয়, সময়ের ব্যবধানে ঢাকা অঞ্চলের কবিগান এবং যশোর অঞ্চলের কবিগানের মধ্যে আঙ্গিক ও বিষয়গত স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি হতে থাকে। এই স্বাতন্ত্র্য প্রথমদিকে যতটা স্পষ্ট না হয়, সময়ের ব্যবধানে তা ধীরে ধীরে বাড়ে। বিশ

---

৭. ধর্মানন্দ মহাভারতী, "ভোলা ময়রা", *সাহিত্য-সংহিতা*, মার্চ-এপ্রিল ১৯০৫, পৃষ্ঠা ৬৫৮

৮. হরিচরণ আচার্য, *বঙ্গের কবির লড়াই* (পুনর্মুদ্রণ; নরসিংদী : দীপকচন্দ্র দাস, ২০০৬), পৃষ্ঠা ৬

৯. হরিচরণ আচার্য, *বঙ্গের কবির লড়াই* (পুনর্মুদ্রণ; নরসিংদী : দীপকচন্দ্র দাস, ২০০৬), পৃষ্ঠা ০৬

শতকের সূচনায় দেখা যায়, ময়মনসিংহ অঞ্চলের কবিগান ঢাকা অঞ্চলের কবিগান থেকে বহু দিক দিয়ে আলাদা হয়ে উঠেছে। একইভাবে ঢাকা অঞ্চলের কবিগানের সঙ্গে চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবিগানে নানারকম স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি হচ্ছে। আবার পদ্মা নদীর দক্ষিণের জেলাগুলোতে পরিবেশিত কবিগান পাচ্ছে নতুন কিছু মাত্রা। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে এক অঞ্চলের কবিয়ালদের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের কবিয়ালদের আদান-প্রদান বা মিথষ্ক্রিয়া মন্থর হওয়ায় খুব কম ক্ষেত্রেই এই বৈচিত্র্য হ্রাস পায়। তবে এ কথাও ঠিক যে, অসাধারণ জনপ্রিয় কিছু কবিয়াল অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে গিয়ে কবিগান পরিবেশন করেছেন। যশোরের তারকচন্দ্র সরকার, ঢাকার হরিচরণ আচার্য, চট্টগ্রামের রমেশ শীল, খুলনায় রাজেন্দ্রনাথ সরকার বা বরিশালের নকুলেশ্বর দত্ত, নড়াইলের বিজয়কৃষ্ণ সরকার, বাগেরহাটের স্বরূপেন্দু সরকার ছিলেন এইজাতীয় ব্যতিক্রমী কবিয়াল। তবে মধ্যম মানের কবিয়ালগণ প্রায়ই নিজ নিজ এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকতেন বলে বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে তাঁরা বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। এভাবে বিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ পূর্ববঙ্গের কবিগানকে অন্তত তিনটি ভাগে বিভক্ত করে বর্ণনা করা সম্ভব :

এক. পদ্মার উত্তরাঞ্চল অর্থাৎ ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চলের কবিগান;
দুই. পদ্মার দক্ষিণাঞ্চল অর্থাৎ যশোর-খুলনা-বরিশাল-ফরিদপুর অঞ্চলের কবিগান; এবং
তিন. মেঘনার পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ নোয়াখালী-কুমিল্লা-চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবিগান।[১০]

পদ্মার উত্তরাঞ্চলের কবিগান

পূর্ববঙ্গে পদ্মার উত্তরাঞ্চল বলতে বৃহত্তর ময়মনসিংহ এবং বৃহত্তর ঢাকা জেলাকেই বোঝায়। যমুনা, মেঘনা এবং পদ্মা নদী দিয়ে ঘেরা এই অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি মোটামুটি অভিন্ন, উপভাষাও এক। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এই অঞ্চলে কবিগান জনপ্রিয় হতে শুরু করে। প্রথমদিকে কোলকাতার কবিয়ালগণ এসে এখানে কবিগান পরিবেশন করতেন। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এই অঞ্চলের চাহিদা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে এই অঞ্চলেও কবিয়ালের জন্ম হতে থাকে। যাঁদের জন্মসাল সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়, তাঁদের মধ্যে ময়মনসিংহের রামগতি শীল (১৮৪০-১৯০১) এবং রামু মালী (১৮৪১-১৯১৪) হলেন এই অঞ্চলের প্রাচীনতম কবিয়াল। এছাড়া এই অঞ্চলের যেসব কবিয়াল অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ঢাকার হরিচরণ আচার্য (১৮৪১-১৯৪১) এবং ময়মনসিংহের বিজয় নারায়ণ আচার্যের (১৮৬৯-১৯২৭) নাম বিশেষ উল্লেখের দাবিদার।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে ময়মনসিংহের কবিগান সম্পর্কে বহু তথ্য জানা যায় ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত 'সৌরভ' পত্রিকার মাধ্যমে। এই পত্রিকায় চন্দ্রকুমার দে, বিজয়নারায়ণ আচার্য, মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য কবিভূষণ, রাজেন্দ্রকিশোর সেন, দেবেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ এবং যোগেশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের অনেকগুলো রচনা থেকে জানা যায়, ময়মনসিংহের কবিগান তখন কী কী বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল এবং কিভাবে তা পরিবেশিত হত।[১১] এছাড়া ঢাকা অঞ্চলের কবিগান সম্পর্কে জানার জন্য এই অঞ্চলের বিখ্যাত কবিয়াল হরিচরণ আচার্যের নিজের রচনা যেমন রয়েছে, তাঁর সম্পর্কেও অনেকে লিখেছেন। এমনকি ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত 'সৌরভ' পত্রিকাতেও ঢাকার হরিচরণ আচার্য সম্পর্কে আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়।[১২]

প্রায় ক্ষেত্রে দক্ষিণাঞ্চলের কবিয়ালগণ এ সময়ে পদ্মার উত্তরাঞ্চলে গিয়ে গান পরিবেশন করতে থাকেন। যেমন অনাদিজ্ঞান সরকার, স্বরূপেন্দু সরকার, নারায়ণ সরকার, গৌরাঙ্গ সরকার, সন্ধ্যা সরকার প্রমুখ কবিয়াল বিশ শতকের শেষ কয়েক দশক প্রায় প্রতি বছরই সিলেট ময়মনসিংহ, ঢাকা

---

১০. যতীন সরকার, *বাংলাদেশের কবিগান* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫), পৃষ্ঠা ৬৪

১১. কেদারনাথ মজুমদার সম্পাদিত, *সৌরভ*, এপ্রিল ১৯১৪- জানুয়ারি ১৯২৮ (বৈশাখ ১৩২১ থেকে পৌষ ১৩৩৪)

১২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৪র্থ খণ্ড (কোলকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সি, ১৯৭৩), পৃষ্ঠা ৭৬-৭৭

অঞ্চলে কবিগান করেছেন। বিশেষভাবে বাংলাদেশ হওয়ার পর ঢাকা মহানগরীতে আয়োজিত কবিগানের প্রায় সব সময়ে দক্ষিণাঞ্চলের কবিয়ালগণ কবিগান পরিবেশন করেছিলেন। একুশ শতকের সূচনাতেও তা দেখা যায়। ২০০৭ সাল ও ২০০৮ সালে ঢাকা শহরের রামকৃষ্ণ মিশনে, পোস্তগোলায়, দয়াগঞ্জে, ফার্মগেট খ্রিস্টান মিশনারি মিলনায়তন প্রভৃতি স্থানে যেসব কবিগান হয়েছে, তার সবগুলোর কবিয়ালই ছিলেন পদ্মার দক্ষিণাঞ্চলের।

ময়মনসিংহের কবিগান

ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকসংগীত সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে-এর ধারণা, উনিশ শতকের সূচনার কোলকাতা থেকে কবিগান ময়মনসিংহে আসে।[১৩] ঐ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ময়মনসিংহে যাঁরা কবিগান পরিবেশন করতেন তাঁদের মধ্যে রামগতি শীল এবং রামু মালীর নাম তিনি উল্লেখ করেছেন। এঁদের তিনি যথাক্রমে দাশরথি রায় (দাশু রায়, ১৮০৬-১৮৫৭) এবং রামনিধি গুপ্তের (নিধু বাবু, ১৭৪১-১৮৩৯) সঙ্গে তুলনা করেন।[১৪] এই তুলনা যথাযথ কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। কেননা দাশু রায় এবং নিধু বাবু প্রথমজীবনে কবিগান গাইলেও এঁরা দুজনে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন যথাক্রমে পাঁচালিকার ও টপ্পাগায়ক হিসেবে। তা সত্ত্বেও কোলকাতার খ্যাতিমান সংস্কৃতিকর্মীদের নাম দিয়ে ময়মনসিংহের কবিয়ালদের পরিচিত হওয়ার এই ঘটনা কোলকাতার সঙ্গে ময়মনসিংহের নিবিড় সাংস্কৃতিক সম্পর্ক প্রমাণ করে।

কোলকাতা থেকে কবিগান ময়মনসিংহে আসে প্রধানত রাজা, জমিদার ও নানা শ্রেণির বিত্তবান মধ্যস্বত্বভোগীদের পৃষ্ঠপোষকতায়। এই শ্রেণির মধ্যে রয়েছেন ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার রাজা জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরী, গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুসঙ্গের রাজা রাজকৃষ্ণ, কমলকৃষ্ণ, জগৎকৃষ্ণ ও শিবকৃষ্ণসহ বিভিন্ন স্থানীয় জমিদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকজন। ময়মনসিংহ অঞ্চলে সাধারণ বিত্তবান লোকেরাও কবিগানের পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে এসেছিলেন। যেমন ময়মনসিংহের খ্যাতিমান কবিয়াল রামগতি শীল একবার আর্থিক সংকটে পড়লে ফতেপুর গ্রামের দাশু বিশ্বাস তাঁকে কিছু জমি দান করেছিলেন।[১৫]

উনিশ শতকের শেষার্ধে ময়মনসিংহ অঞ্চলে রচিত কবিগানের আঙ্গিক কিছুটা স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। অন্তত পঙ্‌ক্তি বা তুকগুলোর নামকরণের দিক দিয়ে তা কোলকাতার চেয়ে আলাদা হয়। কোলকাতায় কবিগান যখন (১৮৯৬) বিন্যস্ত ছিল 'চিতেন, পাড়ন মেলতা, মহড়া, খাদ, মেলতা, অন্তরা, পাড়ন, ফুঁকা, মেলতা'[১৬] প্রভৃতি নামে, ময়মনসিংহে তখন তা বিন্যস্ত ছিল 'চিতান, পরচিতান, ধুয়া, লহর, মহরা খাদ, ঝুমুর'[১৭] প্রভৃতি নামে। ভিন্ন নামে হলেও গানের গঠনকাঠামো প্রায় অভিন্ন ছিল বলে মনেহয়। সুরের দিকে দিয়েও হয়তো উভয় অঞ্চলের গান প্রায় অভিন্ন ছিল। যদিও এ ব্যাপারে সুনিশ্চিতভাবে কোনো মন্তব্য করা কঠিন। প্রধান কারণ উভয় অঞ্চলের গানগুলোর কথাই শুধু রক্ষা পেয়েছে, সুর রক্ষা করার কোনো উপায় তখনো আবিষ্কৃত হয়নি।

ময়মনসিংহে অঞ্চলে এক সময়ে কবিগানকে ঝুমুর গানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে হয়েছিল। কবিয়াল বিজয়নারায়ণ আচার্যের বরাতে জানা যায়, উনিশ শতকের শেষার্ধের ময়মনসিংহে ঝুমুর গান বেশ জনপ্রিয় হয়। ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, পাবনা, রাজশাহী প্রভৃতি জেলা থেকে ঝুমুরওয়ালীরা ময়মনসিংহে ঝুমুর গান পরিবেশন করতে যেত। এই সময়ের ময়মনসিংহের বিখ্যাত কবিয়াল রামগতি শীল এবং রামু মালীকে এসব ঝুমুরওয়ালীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হত। তবে

---

১৩. চন্দ্রকুমার দে, "ময়মনসিংহের দাশুরায়", *সৌরভ*, মে-জুন ১৯১৪, পৃষ্ঠা ২৪৩
১৪. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬০৯-২৭৯
১৫. চন্দ্রকুমার দে, ময়মনসিংহের দাশুরায়, *সৌরভ*, মে-জুন ১৯১৪, পৃষ্ঠা ২৪৫
১৬. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭২
১৭. চন্দ্রকুমার দে, "মালীর জোগান", *সৌরভ*, এপ্রিল-মে ১৯১৪, পৃষ্ঠা ২১৮

রামগতি এবং রামুর প্রতিভাবলে ময়মনসিংহের মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে, ঝুমুর গান কবিগানের তুলনায় নিম্ন মানের। এই বোধ প্রবল হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ময়মনসিংহের ঝুমুর গানের শ্রোতারা ক্রমে কবিগানের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ময়মনসিংহ থেকে ঝুমুর গান চিরবিদায় গ্রহণ করে।

উনিশ শতকের শেষার্ধে এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে ময়মনসিংহ অঞ্চলে কবিয়াল হিসেবে যাঁরা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সেরা ছিলেন রামগতি শীল (১৮৪০-১৯০১) এবং রামু মালী (১৮৪১-১৯১৪)। এঁদের চেয়ে কিছুটা প্রবীণ ছিলেন কিশোরগঞ্জের দগদগা গ্রামের কানাই নাথ ও বলাই নাথ নামের দুই সহোদর কবিয়াল। এঁরা উনিশ শতকের শেষদিকে বৃদ্ধাবস্থায় মারা যান। তাই অনুমান করা যায় উনিশ শতকের ত্রিশের দশকে এঁদের জন্ম হয়েছিল। কবিগানের মালশি গানকে এঁরা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করেন বলে জানা যায়, যথা : ডাক মালশি এবং লহর মালশি। উভয় ধরনের গানের পরিচয় দিতে গিয়ে যতীন সরকার লিখেছেন,

> "ভাববস্তুর দিক থেকে 'ডাক মালসী' ছিল সরল ও সংক্ষিপ্ত, আর 'লহর মালসী' ছিল তত্ত্বমূলক গান।"[১৮]

কিন্তু বাস্তবে মালশি গানগুলো কখনো সংক্ষিপ্ত হয় না, যেগুলো সংক্ষিপ্ত, কোলকাতা পর্বে সেগুলো বন্দনা গান হিসেবে পরিচিত ছিল, বিশ শতক নাগাদ তা ডাক গান নামে পরিচিতি পায়। অন্যদিকে মালশি গানগুলো কোলকাতার পর্বেই দীর্ঘাকার এবং তখন তা ভবানীবিষয় নামে পরিচিত ছিল।[১৯]

রামগতি সরকারের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী রামু মালীর জন্ম হয়েছিল ১৮৪১ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে (চৈত্র ১২৪৭)।[২০] তাঁকেও দারিদ্র্যের সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করে বাঁচতে হয়েছে। এসব তথ্যে মনে হয়, ময়মনসিংহে কবিগান জনপ্রিয় হলেও পেশা হিসেবে কবিগান তখন লাভজনক ছিল না। ময়মনসিংহ অঞ্চলে যাঁরা এঁদের সমকক্ষ এবং সমকালীন ছিলেন তাঁদের মধ্যে শম্ভু মালী, কালীচরণ দে, পরান কর্মকার, রামদয়াল নাথ, হরচন্দ্র আচার্য, গোবিন্দ আচার্য, কৃষ্ণমোহন মালী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, হরিহর আচার্য, কালীকুমার ধর, সাধু শেখ, ঈশান দত্ত, লাল মামুদ এবং বিজয়নারায়ণ আচার্যের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২১]

এই কবিয়ালগণের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল নাম বিজয়নারায়ণ আচার্য। তাঁর কণ্ঠস্বর যেমন সুমিষ্ট ছিল, তেমনি যে কবিপ্রতিভা কবিয়ালের জন্য অত্যাবশ্যক তা-ও তাঁর পর্যাপ্ত ছিল।[২২] শুধু কবিগান রচনাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তাই নয়, গদ্য রচনাতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। পূর্ববঙ্গের কবিগান এবং বিশেষত ময়মনসিংহ অঞ্চলের কবিগানের ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে বিজয়নারায়ণ আচার্যের রচনাই প্রধান সম্বল। তিনি অত্যন্ত সাবলীল গদ্যভাষায় তাঁর সমসাময়িক কবিয়ালদের পরিচয় 'সৌরভ' পত্রিকায় তুলে না ধরলে পূর্ববঙ্গের কবিগান সম্পর্কে অনেক তথ্য অজানা থেকে যেত। কবিগান রচনায় তিনি কত পারদর্শী ছিলেন তা তাঁর প্রাসঙ্গিক আলোচনা থেকে বোঝা যায়। অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়ার জন্য তিনি তাঁর সমকালের কবিয়ালদের রচিত গানগুলোকে মনে রাখতে পারতেন। 'সৌরভ' পত্রিকায় তিনি যে তাঁর সমকালের বেশ কয়েকজন কবিয়াল সম্পর্কে মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, তা তাঁর সেই স্মৃতিশক্তির প্রমাণ বহন করে।

ময়মনসিংহ পর্বে একাধিক মুসলমান কবিয়ালের আবির্ভাব ঘটে। এঁদের মধ্যে বিশেষ প্রতিভাবান ছিলেন লাল মামুদ (১৮৬০-১৮৯৭)। নেত্রকোনা জেলার ঠাওইডহর গ্রামে তাঁর জন্ম। সমকালে তিনি ভক্তকবি হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রথমজীবনে তিনি ছিলেন একজন গাজির গানের বয়াতি। পরে

---

১৮. বিজয়নারায়ণ আচার্য, "রামগতির টপ্পা", *সৌরভ*, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯১৪, পৃষ্ঠা ৪৯

১৯. যতীন সরকার, *বাংলাদেশের কবিগান*, পৃষ্ঠা ৭২

২০. বিজয়নারায়ণ আচার্য, রামু সরকার, পৃষ্ঠা ১১৭

২১. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ১২২

২২. চন্দ্রকুমার দে, "রামগতির টপ্পা", *সৌরভ*, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯২৭, পৃষ্ঠা ২১১

কবিগানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কবিগান গাইতে শুরু করেন। বিজয়নারায়ণ আচার্যের সঙ্গেও তিনি কবিগান করতেন। অল্প বয়সে মারা যাওয়ার জন্য তাঁর কবিপ্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেনি।

ময়মনসিংহ অঞ্চলে বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কবিগানে সক্রিয় ছিলেন মদন আচার্য, কালীকুমার ধর, ঈশান দত্ত, ঈশান নাথ, ক্ষেত্রমোহন শীল, কালীকুমার দাস, উপেন্দ্র সরকার, উপেন্দ্রমোহন সরকার, সূর্যমোহন সরকার, চাঁদকিশোর সূত্রধর। দেশভাগের পর এঁদের প্রায় সবাই দেশত্যাগ করে ভারতে অভিবাসী হওয়ায় কবিয়ালদের সংকট দেখা দেয়। তখন আবুল সরকার, আলী হোসেন সরকার, ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখ কবিয়ালকে নিয়ে মদন আচার্য কবিগান চালিয়ে যান। ময়মনসিংহ অঞ্চলের কবিয়ালদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিভাবান নেত্রকোনার মদন আচার্য (জ. ১৯১৭)। তিনি ছিলেন ছিলেন পূর্ববঙ্গ পর্বের বিখ্যাত কবিয়াল বিজয়নারায়ণ আচার্যের ভ্রাতুষ্পুত্র।

ময়মনসিংহ অঞ্চলের কবিয়ালদের মধ্যে নেত্রকোনা জেলায় কবিগানের চর্চা সবচেয়ে পুরনো। কবিগানেও এই জেলার আনন্দকিশোর চক্রবর্তী, আবুল সরকার, আলী হোসেন, ঈশান দত্ত, কালীচরণ সরকার, ক্ষেত্রেমোহন শীল, জীবন মজুমদার, দুলাল মিয়া, নারায়ণ চক্রবর্তী, বাবুল ঠাকুর, ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার, মকরম আলী, সাধু শেখ, হরেন্দ্র আচার্য প্রমুখ কবিয়াল বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে কবিগান ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠতে থাকে। এ সময়ে কবিগানের আবশ্যিক অংশ হিসেবে দেবদেবী-কেন্দ্রিক গানগুলো উঠে যেতে থাকে, প্রাধান্য পায় ধুয়া-পাঁচালি নির্ভর কবিগান। এই পরিবেশে মুসলমান কবিয়ালগণ কবিগানের প্রতি ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট হতে শুরু করেন এবং নতুন ধরনের কবিগানের মুসলমান অনুষঙ্গের অনুপ্রবেশ ঘটাতে থাকেন। ঢাকার উত্তর অঞ্চলে এর ফলে বহু মুসলমান কবিগানের জন্ম হয়।

এ সময়ে টাঙ্গাইল জেলায় একাধিক কবিয়ালগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে, যা মূলত মুসলমান কবিয়ালকেন্দ্রিক। এমনই একটি গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা কবিয়াল আফাজউদ্দিন। তিনি বিশ শতকের প্রথমার্ধে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তাঁর প্রধান শিষ্য ছিলেন শান্তিরঞ্জন সেন। শান্তিরঞ্জন সেনের শিষ্য তিনজন : সুবল সরকার, ননীগোপাল দে এবং হেমন্ত সরকার। আফাজউদ্দিনের সমসাময়িক কবিয়ালদের মধ্যে তাঁর মতোই বিখ্যাত ছিলেন শের আলী। শের আলীর শিষ্য-প্রশিষ্য না থাকলেও বিশ শতকের শেষার্ধে নাগাদ আফাজউদ্দিন এবং শের আলীর অনুসরণে টাঙ্গাইল জেলায় বেশ কয়েকজন মুসলমান কবিয়ালের আবির্ভাব ঘটে, এঁদের মধ্যে আবদুল গনি সরকার, আবদুল সরকার, আবদুল ফকির, নহর চাঁদ ফকির, রওশন আলী সরকার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে টাঙ্গাইলে যেসব হিন্দু কবিয়াল বিশ শতকের শেষার্ধে এবং একুশ শতকের সূচনায় কবিগান করেন, যেমন অনিল শীল, কালাচাঁদ সরকার, গণেশ রক্ষিত, চিত্র রঞ্জন সরকার, জীবন সরকার, ননীগোপাল দে, ননী কাপালী, বঙ্কুবিহারী বসাক, বলরাম দেবনাথ, বাবুলাল সরকার, যোগেন্দ্র সূত্রধর, শচীন্দ্রনাথ বর্মণ, শান্তি রঞ্জন সেন, সতীশ সরকার, হেমন্ত সরকার প্রমুখ, সকলেই গুরুপরম্পরা বা শিষ্যপরম্পরা কোনো-না-কোনোভাবে পূর্বোক্ত মুসলমান কবিয়ালদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। টাঙ্গাইলের কবিয়ালদের পরম্পরার ক্ষেত্রে এ এক অসাধারণ অসাম্প্রদায়িক চিত্র। পদ্মার উত্তর অঞ্চলে এভাবে মুসলমান কবিয়ালদের আগমন ঘটলেও কবিগানে মুসলমান সমাজে অংশগ্রহণ সেই তুলনায় বৃদ্ধি পায় না। তাঁদের শিষ্য হিসেবেও মুসলমানদের থেকে হিন্দুরাই এগিয়ে থাকে।

ঢাকায় কবিগান

উনিশ শতকের শেষার্ধে ঢাকার ভাওয়ালের রাজা কালীনারায়ণ রায় একটি কবিগানের দল গঠন করেছিলেন।[২৩] সেই দলে সরকারি করতেন রামকুমার সরকার নামে এক কবিয়াল। কোলকাতার কবিয়ালদের সঙ্গে একবার এই দলের কবির লড়াই হয়েছিল। হরিচরণ আচার্যের সাক্ষ্য থেকে জানা

২৩. হরিচরণ আচার্য তাঁর বাল্যবয়সে এই কবিগান শুনেছিলেন। তিনি যদি চৌদ্দ বছর বয়সেও এই গান শুনে থাকেন, তাহলে ঐ গান পরিবেশনের সাল হয় ১৮৭৫ সালে

যায়, কালীনারায়ণ একবার কোলকাতার সীতানাথ মুখোপাধ্যায় এবং মাধব ময়রাকে কবিগানের বায়না করেছিলেন। তাঁরা তখন পূর্ববঙ্গের কোনো কবিয়ালের বিপক্ষে কবিগান করতেন না। এই পরিস্থিতিতে কালীনারায়ণ রায় সতীনাথ মুখোপাধ্যায়কে পাঁচ শত টাকা পুরস্কাররূপ ঘুষ দিয়ে বশ করেন এবং তাঁর বিপক্ষে তাঁর নিজের দলের একপালা গান পরিবেশনের সুযোগ পান।[২৪] রামকুমার সরকার রচিত কবিগানের একটি সংকলন রাজা প্রকাশ করেছিলেন বলে জানা যায়। তবে এই গানগুলোতে রামকুমার নিজের নামের ভণিতার বদলে রাজা কালীনারায়ণের ভণিতা ব্যবহার করেছিলেন।

প্রথমেই বলে নেওয়া প্রয়োজন যে উনিশ-বিশ শতকের সন্ধিলগ্নে ময়মনসিংহ অঞ্চলের কবিগান এবং ঢাকা অঞ্চলের কবিগানের মধ্যে আঙ্গিক ও বিষয়গত বিশেষ কোনো তফাত ছিল না। ভৌগোলিকভাবে ঢাকা এবং ময়মনসিংহ আলাদা নয়। উপভাষাগত তফাতও তখন খুব একটা প্রবল ছিল বলে মনে হয় না।

ঢাকার মহেশ্বরদী পরগনার ডৌকাদী গ্রামের হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্তী বা হরিশ্চন্দ্র মাস্টার ছিলেন রামকুমার সরকারের মতোই প্রতিভাবান কবিয়াল। তাঁর কণ্ঠ সুমধুর না থাকলেও বিভিন্ন ধরনের কবিগান রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি একবার কোলকাতায় কবিগান করার সুযোগ পেয়েছিলেন। কোলকাতার কবিয়াল তাঁকে 'পুবদেশের বাঙাল' হিসেবে ব্যঙ্গ করলে তিনি তাঁর উচিত জবাব দিয়েছিলেন। বলেছিলেন,

> "তোমরা পশ্চিমা বলে অনর্থক করো অহংকার।
> দুঃখ বলব কত আর ॥
> এক কথা সত্য বটে, পূর্ব দিকে সূর্য ওঠে।
> তোমরা সকলে সকালে উঠে পূর্বদিকে কর নমস্কার।"[২৫]

হরিশ্চন্দ্র মাস্টারের সমকালে ঢাকায় আরো অনেক কবিয়ালের আবির্ভাব ঘটে। যেমন– পাগলা গ্রামের নিমচাঁদ ঠাকুর, মহেশ্বরদী পরগনার আলগী গ্রামের পঞ্চানন আচার্য ও কানাই আচার্য, ভুলতা গ্রামের নীলমণি চক্রবর্তী, মহেশ্বরদীর বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী, দয়াগঞ্জের মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, পারুলিয়ার জয়হরি সরকার ও বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ। এঁদের মধ্যে দু-একজন শুধু কবিগান রচনা করেছেন, কবিগানের আসরে দাঁড়িয়ে কবিগান পরিবেশন করেননি। যেমন মহিমচন্দ্র নন্দী ও বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী। মহিমচন্দ্র নন্দী কবিগান রচনার পাশাপাশি লোকসাহিত্য সংগ্রাহক ও আঞ্চলিক ইতিহাস রচয়িতা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তীও বিশেষ প্রতিভাবান ছিলেন। 'দ্বিজদাস' ছদ্মনামে তিনি বহু তত্ত্বসংগীত রচনা করেন। তবে বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী বিশেষভাবে স্মরণীয় হরিচরণ আচার্যের (১৮৬১-১৯৪১) মতো কবিয়ালের গুরু হিসেবে। হরিচরণ আচার্য তাঁর 'বঙ্গের কবির লড়াই' (১৯৩০) বইটি তাঁর এই গুরুর নামে উৎসর্গ করেছিলেন।

ঢাকার মুন্সীগঞ্জ অঞ্চল তখন পরিচিত ছিল বিক্রমপুর নামে। উনিশ শতকের শেষদিকে এখানেও বেশ কয়েকজন গুণী কবিয়ালের আবির্ভাব ঘটে। এঁদের মধ্যে জয়পাড়া গ্রামের ভৈরব মজুমদার, রামকানাই ভুঁইমালী, রামরূপ আচার্য, মাওয়া গ্রামের চণ্ডী আচার্য বা চণ্ডী ঠাকুর, রসিক আচার্য প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে চণ্ডী আচার্যের বিপরীতে হরিচরণ আচার্য বহুবার কবিগান করেছেন।

ঢাকা অঞ্চলের কবিয়ালের মধ্যে হরিচরণ আচার্য ছিলেন সর্বাধিক প্রতিভাবান কবিয়াল। উনিশ শতকের শেষার্ধ এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধ ছিল তাঁর কবিগান পরিবেশের কাল। তাঁর পূর্বে পূর্ববঙ্গের কবিগান কোলকাতার কবিগান থেকে খানিকটা আলাদা হয় ঠিকই, তবে তাঁর হাতেই পূর্ববঙ্গের কবিগান বহু দিক দিয়ে নতুন হয়ে ওঠে। তাছাড়া তিনিই প্রথম কবিয়াল যিনি বাংলার প্রায় সব অঞ্চলে কবিগান পরিবেশন করেছিলেন তথা বাংলার সর্বত্র পূর্ববঙ্গের কবিগানের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি নিজে যেমন বাংলার সব অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন, তাঁর কবিয়াল শিষ্যরাও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাঁর নিকটে এসে কবিগান শিখেছিলেন।

---

২৪. হরিচরণ আচার্য, *বঙ্গের কবির লড়াই*, পৃষ্ঠা ৬-৭

২৫. হরিচরণ আচার্য, *বঙ্গের কবির লড়াই*, পৃষ্ঠা ২

হরিচরণ আচার্যের জন্ম নরসিংদীতে ১৮৬১ সালের ১৬ নভেম্বর। প্রথমজীবনে কিছুকাল রামায়ণ গান পরিবেশন করার পর ক্রমে কবিগানের প্রতি আকৃষ্ট হন হন এবং উনিশ শতকের শেষ পাদেই কবিয়াল হিসেবে আসরে কবিগান গাইতে শুরু করেন। কবিগান করার জন্য যে সৃজনশীলতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রয়োজন, হরিচরণ আচার্যের তা পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। বিশ শতকে প্রথমদিকে তাঁর কবিখ্যাতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। বাংলার প্রায় সব অঞ্চলে তাঁর জনপ্রিয়তা সৃষ্টি হয়। একই কারণে বাংলা বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁকে কবিগান পরিবেশন করে বেড়াতে হত। বিশ শতকের প্রথমদিকে পূর্ববাংলার প্রধান যোগাযোগ মাধ্যমই ছিল নদীপথ। এজন্য হরিচরণ একটি পানসি নৌকা তৈরি করেছিলেন এবং সেই নৌকায় তিনি সর্বত্র যাতায়াত করতেন।

হরিচরণ আচার্য তাঁর কবিজীবনের শেষদিকে (১৯৩০) 'বঙ্গের কবির লড়াই' নামে একটি বই লিখেছিলেন। এ বইয়ে তিনি পূর্ববঙ্গের বহু কবিয়ালের নাম উল্লেখ করেছেন, এবং যশোর থেকে ত্রিপুরা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে তিনি এঁদের বিপরীতে কবিগান পরিবেশন করেছিলেন। বাস্তবে হরিচরণ আচার্য তাঁর এ বইয়ে কোথাও পরাজিত হওয়ার কথা লেখেননি। হরিচরণ আচার্যের এমন প্রবণতার সাক্ষ্য দিয়েছেন তাঁর অন্যতম ছাত্রের বরাতে দীনেশচন্দ্র সিংহ। প্রসঙ্গত তিনি লিখেছেন :

> "আচার্যকর্তা ছিলেন অত্যন্ত যশপিপাসু ব্যক্তি। এত যে রাজ্যজোড়া যশ প্রতিষ্ঠা সুনাম সুখ্যাতি অর্জন করেছেন তবু যেন তাঁর পিপাসা মিটেনি। বিপক্ষ দলের গানে যদি একটা বাহবা পড়ে যেত তবে আর রক্ষা নেই!"[২৬]

তারকচন্দ্রের প্রিয় শিষ্য ফরিদপুরের (গোপালগঞ্জের) দুর্গাপুর গ্রামের হরিবর সরকারের বিপরীতে হরিচরণ আচার্য কবিগান করেছেন, বইটিতে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া বাগেরহাটের যে মধুর দেব সরকারের বিপরীতে তারকচন্দ্র সরকার নিয়মিত কবিগান করতেন, তাঁর ছোট ভাই বিধুভূষণ দেব সরকারের বিপক্ষেও হরিচরণ আচার্য কবিগান করেছেন, সে তথ্যও বইটিতে প্রদান করা হয়েছে। তবে তারকচন্দ্রের কবিপ্রতিভা সম্পর্কে হরিচরণ আচার্য যথেষ্ট অবহিত ছিলেন, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

হরিচরণ আচার্য তাঁর কবিয়াল-জীবনে খুলনার (বাগেরহাটের) লালচন্দ্রপুর গ্রামের বিধুভূষণ দেব সরকারের বিপরীতে; বরিশালের নবগ্রাম গ্রামের উমেশ শীল ও (পিরোজপুরের) রঘুনাথপুর গ্রামের কুঞ্জ দত্তের বিপরীতে; নোয়াখালীর বচুরা গ্রামের কালীকুমার মাস্টারের বিপরীতে; ত্রিপুরার (চাঁদপুরে) পাইকপাড়া গ্রামের জগবন্ধু দত্ত ও রামচন্দ্র মাস্টারের বিপরীতে, (কুমিল্লার) হোসেনপুর গ্রামের হরকুমার শীল ও (কুমিল্লার) আন্দিকোট গ্রামের অর্জুনচন্দ্র দেবনাথের বিপরীতে; ঢাকার (মুন্সীগঞ্জের) মাওয়া গ্রামের চণ্ডী আচার্যের বিপরীতে, (নরসিংদীর) পলাশ গ্রামের ভগবান আচার্যের বিপরীতে এবং (গাজীপুরের) রেণুপুর গ্রামের অম্বিকা পাটনীর বিপরীতে; ময়মনসিংহের (কিশোরগঞ্জের) বিরুনিয়া গ্রামের হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্তী ও একই গ্রামের হরিহর আচার্য প্রমুখের বিপরীতে কবিগান পরিবেশন করেছেন বলে জানা যায়।

হরিচরণ আচার্যের পরিবেশিত কবিগানের ধরন বিশ্লেষণ করে মেনে হয়, প্রকরণগত দিক দিয়ে তা কোলকাতা পর্বের কবিগানের থেকে অনেকটা বদলে গেছে। পরিভাষাগত তো বটেই বিষয়ের দিক দিয়েও ঘটেছে বহু ধরনের পরিবর্তন। আবার অভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও ময়মনসিংহ অঞ্চলের কবিগান থেকেও হরিচরণ আচার্যের কবিগান নানা দিক দিয়ে আলাদা ছিল।

হরিচরণ আচার্যের কবিগান সম্পর্কে সাধারণত দাবি করা হয় যে, অশ্লীলতা থেকে কবিগানকে তিনি মুক্তি দিয়েছিলেন।[২৭] এই দাবির মধ্যে যতটা অতিশয়োক্তি রয়েছে, বাস্তবতা ততোটা নেই। কেননা, 'বঙ্গের কবির লড়াই' গ্রন্থে হরিচরণ আচার্য তাঁর প্রতিপক্ষের কবিয়ালদের সঙ্গে তাঁর লড়াইয়ের যেসব

---

২৬. দীনেশচন্দ্র সিংহ, *কবিয়াল কবিগান* (চব্বিশ পরগনা : সৌদামিনী সিংহ, ১৯৭৭), পৃষ্ঠা ৩৩০

২৭. বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, "ভূমিকা", *কবির ঝঙ্কার*, হরিচরণ আচার্য প্রণীত (পুনর্মুদ্রণ; নরসিংদী : হরিপদ সাহা, ১৯৮৬), পৃষ্ঠা জ

বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, তার মধ্যে অশ্লীল প্রসঙ্গ অনুপস্থিত থাকেনি। শুধু অশ্লীলতা নয়, জাতপাত বিষয়ক গালাগালি আঞ্চলিক-বিদ্বেষ প্রভৃতিও তাঁর কবিগানের মধ্যে লুকিয়ে থাকে।

একবার সদাশিবদি গ্রামে বৃদ্ধ চণ্ডী আচার্যের সঙ্গে যুবক হরিচরণ আচার্যের একবার কয়েক দিনব্যাপী কবিগান হয়। শেষ দিনে হরিচরণ আচার্য মালফুকার নামের যে গান পরিবেশন করেন, তার চাপান-উতোর ছিল এ রকম :

হরিচরণ আচার্য :
"চণ্ডী ঠাকুর বার্ষিক পেলো আর পেলো কুমার রঘুনাথ।
তাদের একই বিক্রমপুর বাড়ি মাইল দশেক তফাত।
এক বরণ, এক আকৃতি, এক বয়স, এক প্রকৃতি
কেবল হামানদিস্তায় গুঁতাগুঁতি, এই দুইটার একটারও নাই দাঁত ॥"

চণ্ডী আচার্য :
"মোদের হামানদিস্তার গুঁতাগুঁতি এই কথা তুমি গেয়ে যাও।
আমার তো বৃদ্ধাবস্থা, তোমার কি থাকবে আস্তা
তোমার নৌকায় আছে হামানদিস্তা, তথা গিয়ে পান ছেঁচিয়া খাও।"[২৮]

ঢাকা অঞ্চলের কবিগানে নারী দোহারের উপস্থিতি একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। বিশেষত হরিচরণের দলে একাধিক নারী দোহার ছিল বলে জানা যায়। এই নারী দোহারগণ যে জনসমাজের মধ্যেও কখনো কখনো স্থূল রসিকতার বিষয় হয়ে উঠতেন, তবে পারিশ্রমিক বিবেচনা করলে এঁরা বেশ ভালো অবস্থানে ছিলেন। অনেক সময়ে কবিয়ালদের চেয়েও তাঁদেরও পারিশ্রমিক বেশি হত।[২৯]

হরিচরণ আচার্যের একটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হল পূর্ববঙ্গের প্রায় সব অঞ্চলে তাঁর শিষ্য তথা উত্তরসূরি সৃষ্টি হওয়া। এর ফলে পূর্ববঙ্গের প্রায় সব অঞ্চলে তাঁর আদর্শের কবিগান জনপ্রিয় হয়। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন প্রহ্লাদ সরকার (নরসিংদী), হরেন্দ্র চক্রবর্তী (নরসিংদী), সর্বানন্দ আচার্য (নরসিংদী), দ্বারিক সরকার (কিশোরগঞ্জ), অম্বিকা পাটনী (গাজীপুর), মধুসূদন সাহা (ঢাকা), তারিণীচরণ সরকার (নারায়ণগঞ্জ), অর্জুন দেবনাথ (কুমিল্লা), বৈষ্ণবচরণ দাস (কুমিল্লা), রমেশচন্দ্র আচার্য (নোয়াখালী), কালীকুমার দে (নোয়াখালী), রাজেন্দ্রনাথ সরকার (বাগেরহাট), নকুলেশ্বর দত্ত (ঝালকাঠি) প্রমুখ।

কবিগানের সূচনা থেকে শুরু করে হরিচরণ আচার্যের সময় পর্যন্ত কবিগানের যত সংগ্রহ রয়েছে, তার মধ্যে হরিচরণ আচার্যের রচনার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। তিনি জীবিত থাকতে 'কবির ঝঙ্কার' নামে দুই খণ্ডে তাঁর প্রায় সব কবিগান সংকলিত হয়। ১৯৮৪ সালে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ঢাকা, বাংলা একাডেমি থেকে পূর্ববঙ্গের কবিগানের যে সংকলন প্রকাশ করেছিলেন, তার প্রায় সব গানই হরিচরণ আচার্যের। একইভাবে ১৯৯৭ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দীনেশচন্দ্র সিংহ পূর্ববঙ্গের কবিগানের যে সংকলন প্রকাশ করেন, তারও সিংহভাগ হরিচরণ আচার্যের।[৩০]

কবিগানের পূর্ববঙ্গে পর্বে ঢাকা শহরের ভূমিকাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কালভেদ, অঞ্চলভেদ ও বক্তিভেদে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের কবিগানের নানা ধরনের স্বাতন্ত্র্য দেখা দেবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সব অঞ্চলের মানুষ যদি নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলে এসে কবিগান করেন, তাহলে সব অঞ্চলের কবিয়ালদের মধ্যে এক ধরনের মিথস্ক্রিয়া ঘটে। উনিশ শতকের শেষার্ধ এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে

---

২৮. দীনেশচন্দ্র সিংহ, *কবিয়াল কবিগান*, পৃষ্ঠা ৩২৮

২৯. দীনেশচন্দ্র সিংহ, *কবিয়াল কবিগান*, পৃষ্ঠা ১

৩০. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, *হারামণি*, ১০ম খণ্ড (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪); দীনেশচন্দ্র সিংহ, *পূর্ববঙ্গের কবিগান : সংগ্রহ ও পর্যালোচনা* (কোলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭)

এই মিথস্ক্রিয়া ঘটানোর দায়িত্ব পালন করে ঢাকা। তখন প্রতি বছর আশ্বিন মাস পড়তে না-পড়তে নড়াইল, বাগেরহাট, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বরিশাল, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চাঁদপুর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, নাটোর, পাবনা প্রভৃতি এলাকা থেকে পানসি নৌকায় করে কবিয়ালগণ ঢাকায় আসতেন। উনিশ শতকের শেষদিকে নৌকাগুলো ভিড়ত সোয়ারিঘাটে এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে ভিড়ত সদরঘাটে। যাঁরা কবিগানের শ্রোতা, তাঁরা এইসব ঘাটে এসে কবিয়ালদের সঙ্গে চুক্তি করে যেতেন। কবিয়ালদের এই মিলনমেলায় পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান ঘটা স্বাভাবিক ছিল। তাছাড়া এই সুযোগে ভিন্ন অঞ্চলের দুই কবিয়ালের মধ্যে গানের আয়োজন হলে তাঁরা পরস্পরের শৈলীর সঙ্গে পরিচিত ও প্রভাবিত হতে পারতেন।

ঢাকা জেলার সাভারের কৃষ্ণগোপাল পাল (জ. ১৯৫২) একজন উল্লেখযোগ্য কবিয়াল। এই পর্বের কবিয়াল হলেও তাঁর রচিত বেশ কয়েকটি ডাক গান মালশি গান রয়েছে, যা বিভিন্ন আসরে তিনি পরিবেশন করে থাকনে। তাঁর কবিগানের গুরু ননীগোপাল সরকার, স্বরূপেন্দু সরকার, জগদীশ সরকার, মনীন্দ্রনাথ সরকার, টাঙ্গাইলের দুই সুবল সরকার, নিতাই সরকার প্রমুখের বিপক্ষে তিনি কবিগান করেন। তাঁর শিষ্য রণজিৎ সরকার একুশ শতকের সূচনায় কবিগান পরিবেশন করেন থাকে।

সত্তর ও আশির দশকে নরসিংদী জেলার মহাদেব সরকার কবিয়াল হিসেবে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তবে তাঁর এলাকায় অন্য কোনো কবিয়াল না থাকায় প্রতিপক্ষের কবিয়ালের সন্ধানে তাঁকে পদ্মা নদীর দক্ষিণাঞ্চলে যেতে হয়। অনেক সময়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ-সিলেট অঞ্চলে গানের বায়না রেখে তিনি দক্ষিণাঞ্চল থেকে কবিয়াল এনে সেসব অঞ্চলে গান করতে যান।

ঢাকার মানিকগঞ্জ অঞ্চলে বেশ কয়েকজন বিখ্যাত কবিয়ালের জন্ম হয় এবং তাঁরা বিশ শতকের শেষার্ধে এই অঞ্চলে সুনামের সঙ্গে কবিগান পরিবেশন করতে থাকেন। এঁদের মধ্যে অমূল্যরতন সরকারের (জ. ১৯৩৪) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর গুরু ছিলেন উপেন্দ্রনাথ কাপালী। তিনিও মানিকগঞ্জ অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। অমূল্যরতন যাঁদের বিপক্ষে কবিগান করেছেন, তাঁদের মধ্যে নকুলেশ্বর সরকার, গোপাল সরকার, অমরেন্দ্রনাথ সরকার, রাধাবল্লভ সরকার, শের আলী সরকার, জগদীশ সরকার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। মানিকগঞ্জের অমর সরকারও (জ. ১৯৪০) একজন খ্যাতিমান কবিয়াল। তাঁর গুরু ছিলেন জগদীশ সরকার। মানিকগঞ্জের নিতাই সরকার, মনীন্দ্রনাথ সরকার, যোগেশ সরকার, সহদেব সরকার, রণজিৎ সরকার , রাধাবল্লভ সরকার, হরেন্দ্র সরকার প্রমুখের বিপক্ষে তিনি গান করেছেন।

পদ্মার দক্ষিণাঞ্চলের কবিগান

পদ্মার দক্ষিণাঞ্চল বলতে যশোর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলকে বোঝায়। ভৌগোলিক কারণে, বিশেষত পদ্মার মতো বড় নদীর ব্যবধানে পদ্মার উত্তর অঞ্চলের থেকে দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষের সংস্কৃতিগত কিছু তফাত থাকায় কবিগানে কিছু স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি হয়। দক্ষিণ অঞ্চল কোলকাতার নিকটবর্তী হওয়ায় উত্তর অঞ্চলের তুলনায় কোলকাতা পর্বের কবিগান দ্বারা দক্ষিণ অঞ্চলের কবিগান অধিক প্রভাবিত হওয়াও স্বাভাবিক।

পদ্মা নদীর দক্ষিণাঞ্চলের বিশ শতকীয় কবিগানকে যশোরের (নড়াইল জেলার) তারকচন্দ্র সরকারের একটি শাখা, যা মূলত ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ কেন্দ্রিক এবং বরিশালের একটি শাখা, যা মূলত ঝালকাঠি কেন্দ্রিক– এই প্রধান দুই শাখায় বিভক্ত করা যায়। কিন্তু এই দুই শাখার কোনোটাই গুরুপরম্পরায় সুস্পষ্টভাবে কোলকাতার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়।

ভৌগোলিক কারণে গোপালগঞ্জ অঞ্চলে কবিগান কোলকাতা পর্বের কবিগানের প্রত্যক্ষ উত্তরসূরি হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু পদ্মার দক্ষিণাঞ্চলের প্রখ্যাত কবিয়ালদের গুরুপরম্পরা বিশ্লেষণ করে সেই অনুমানের পেছনে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না।

সাতচল্লিশের দেশভাগের পরে এই অঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায়ের বড় একটি অংশ দেশত্যাগ করায় খুলনা, যশোর এবং ফরিদপুর অঞ্চলেও সাতচল্লিশ সাল থেকে অন্তত দশ বছর পর্যন্ত সাংস্কৃতিক শূন্যতা বিরাজ করে। এইসব এলাকার খ্যাতিমান কবিয়ালও দেশত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সমকালের সবচেয়ে খ্যাতিমান কবিয়াল রাজেন্দ্রনাথ সরকারও (১৮৯২-১৯৭৪) দেশত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গের বনগাঁয়ে বসবাস করতে থাকেন। ১৯৫৭ সালে রাজেন্দ্রনাথ সরকারকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসতে হয়। ততোদিনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক অস্থিরতা অনেকটা প্রশমিত হয়ে আসে। সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়, যাঁরা কবিগানের পৃষ্ঠপোষক, তাঁরাও দু-এক পালা করে কবিগানের আয়োজন করতে শুরু করেন।

নতুন এই পরিস্থিতিতে ১৯৫৮ সাল থেকে রাজেন্দ্রনাথ সরকার, বিজয়কৃষ্ণ সরকার (১৯০৩-১৯৮৫), নিশিকান্ত সরকার (১৯১৩-১৯৯৩) প্রমুখের নেতৃত্বে পদ্মার দক্ষিণাঞ্চলে কবিগানের একটি নতুন বলয় গড়ে ওঠে। এ সময়ে তাঁদের নিকট থেকে শিক্ষা পেয়ে আরো কয়েকজন নতুন কবিয়াল তাঁদের দলে যুক্ত হন। এঁদের মধ্যে রাজেন্দ্রনাথ সরকারের শিষ্য কালীপদ সরকার; বিজয় সরকারের শিষ্য অনাদিজ্ঞান সরকার, রসিকলাল সরকার, বিনয় সরকার, রবীন্দ্রনাথ সরকার, দিগেন্দ্রনাথ সরকার; এবং নিশিকান্ত সরকারের শিষ্য ছোট রাজেন্দ্রনাথ সরকার, স্বরূপেন্দু সরকার প্রমুখ। এই গুরু-শিষ্যগণ সকলেই পাকিস্তান আমলের প্রথম দিকের কয়েক বছর বাংলাদেশে কবিগান করেছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটতে শুরু করায় এঁদের মধ্য থেকে বেশ কয়েকজন কবিয়াল শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে চলে যান। যেমন নিশিকান্ত সরকার ১৯৬০ সালে, রসিকলাল সরকার ১৯৬৮ সালে, বিজয় সরকার ১৯৮২ সালে, এবং অনাদিজ্ঞান সরকার ১৯৮৯ সালে দেশত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে পূর্ব থেকেই নকুল দত্ত ছিলেন, তাঁর কৃতি শিষ্য সুরেন্দ্রনাথ সরকার ছিলেন। এঁদের সঙ্গে নিশিকান্ত সরকার, রসিকলাল সরকার প্রমুখ যুক্ত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের কবিগানে নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটান। অবশ্য অনাদিজ্ঞান সরকার বৃদ্ধাবস্থায় সেখানে গিয়েছিলেন বলে তাঁর পক্ষে সেখানে খুব বেশিদিন গান করা সম্ভব হয় না।

দেশভাগের পরে রাজেন্দ্রনাথ সরকার কবিগান করলেও নতুন কালের সঙ্গে তিনি ততোটা তাল মিলিয়ে চলতে পারেননি। তাঁর কবিগানের রীতি এবং গায়কি ছিল শতাব্দীর প্রথম দিককার। সেই রীতি থেকে তিনি বের হয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন বটে, তবে সনাতনি রীতির প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল সর্বাধিক। ১৯৫৭ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসার পর তিনি অল্প কয়েক বছর মাত্র কবিগান করেছেন। ১৯৭৪ সালে বাগেরহাটে নিজ বাড়িতে তিনি মারা যাওয়ার আগে প্রায় এক যুগ তাঁর কোনো কবির দল ছিল না, তবে কখনো কোনো আসরে তাঁকে আহ্বান করা হলে তিনি কবিগান গাইতেন।

পূর্ববঙ্গ পর্বে বিশেষভাবে ব্রিটিশ বাংলায় যেসব কবিয়ালের বিকাশ ঘটে, এবং বিশ শতকের শেষ পর্যন্ত কবিগান চর্চায় নিয়োজিত থাকেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল নাম বিজয়কৃষ্ণ সরকারের। তাঁর জন্ম ১৯০৩ সালে নড়াইল জেলার ডুমদি গ্রামে। কবিগানকে সর্বসাধারণে উপভোগ্য করে তুলতে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এটি তিনি করেছিলেন দুইভাবে। প্রথমত, কবিগানের টপ্পা-পাঁচালি অংশে যে ধুয়া গানের প্রচলন তারকচন্দ্র সরকারের সময় থেকে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, অসাধারণ কণ্ঠের অধিকারী হওয়ায় সেই ধুয়া গান দিয়ে তিনি সাধারণ শ্রোতার মন জয় করতে সক্ষম হন। উভয়ের জন্মস্থানও ছিল কাছাকাছি– নড়াইল জেলার মধ্যে। দ্বিতীয়ত, তাঁর সময়ে তিনি কবিগানের ডাক, মালশি, সখীসংবাদ এবং কবি অংশের আধুনিকায়ন ঘটেছিলেন এবং সেগুলোকে সংক্ষিপ্ত করে টপ্পা-পাঁচালিকে কবিগানের প্রধান আকর্ষণে পরিণত করেছিলেন। বিজয় সরকারের সময়ে কবিগান আর ধুয়া গান প্রায় সমার্থক হয়ে যায়। এর পেছনে তাঁর সুমধুর কণ্ঠস্বরও যেমন ভূমিকা রাখে, তেমনি তাঁর রচিত গানের কথার সরলতা ও সহজবোধ্যতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বিজয় সরকারের গুরু ছিলেন গোপালগঞ্জের দুর্গাপুর গ্রামের মনোহর সরকার। সতীর্থ নিশিকান্ত সরকারকে নিয়ে বিজয় সরকার বহু বছর জোট গঠন করে কবিগান করেছেন। পল্লিকবি

জসীমউদ্‌দীনের সঙ্গে কবিয়াল বিজয় সরকারের ঘনিষ্ঠতা ছিল। ১৯৩২ সালে জসীমউদ্‌দীন তাঁকে কোলকাতায় নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানে রাজেন্দ্রনাথ সরকারের বিপক্ষে কবিগানের ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৯৩৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ ভবনে কবিগান পরিবেশন করেন তিনি সমকালের বিদগ্ধ পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ সময়ে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, মুকুন্দ দাস প্রমুখের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁদের গান শোনানোর সৌভাগ্য অর্জন করেন। বিজয় সরকার সম্পর্কে জসীমউদ্‌দীন লিখেছেন,

> "মাঝে মাঝে দেশীয় গ্রাম্য গায়কদের মুখে বিজয়ের রচিত বিচ্ছেদ গান শুনিয়া পাগল হই। এমন সুন্দর সুর বুঝি কেহই রচনা করিতে পারে না। ছাপাখানা বা রেডিও গ্রামোফোনের সাহায্য ব্যতিরেকে বিজয়ের নতুন সুরের গানগুলি গ্রামবাংলার সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে।"[৩১]

বিজয় সরকারের সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি ধুয়া গানের প্রথম কয়েকটি চরণ নিম্নরূপ :

"পোষা পাখি উড়ে যাবে সজনী একদিন ভাবি নাই মনে।
ও সে যে আমায় ভুলবে জীবনে ॥

থাকতো পাখি সোনালি খাঁচায়, কতো কি বলিত আমায় বসে রুপালি আড়ায়।
ফটিকের বাটি ভরে, কতো খাবার দিতাম থরে থরে, পাখি খেতো আনমনে ॥"

ধুয়া গানে তাঁর কৃতিত্ব কবিগানকে যেমন হারিয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছে, একইভাবে ডাক, মালশি প্রভৃতি গানকে তিনি পৌরাণিক আবহ থেকে বের করে এনে সমকালীন সমাজের প্রেক্ষাপটে রচনা করেছেন। এছাড়া তাঁর লহর কবিও সমকালীন প্রসঙ্গে নিয়ে এমনভাবে রচিত, যাতে তা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের যেমন আকর্ষণ করে, আবার নিরক্ষর সাধারণ মানুষকেও আকর্ষণ করার ক্ষমতা রাখে।

বিজয়কৃষ্ণ সরকার তাঁর খ্যাতির চূড়ায় অবস্থান করেন পঞ্চাশের দশকের শেষ দিক থেকে শুরু করে সত্তরের দশক পর্যন্ত। এ সময়ের মধ্যে বিশেষভাবে ষাটের দশক ও সত্তরের দশকে প্রায় প্রতি বছর তিনি পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে গান করে এসেছেন। তবে এই এলাকার মধ্যেই তিনি তাঁর অধিকাংশ গান পরিবেশন করেছিলেন। অবশ্য তিনি তাঁর জীবনের শেষ দুই দশকে উভয় দেশে সমানভাবে সমাদৃত ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ সরকার যাঁদের বিপক্ষে কবিগান করেছেন, তাঁদের মধ্যে নিশিকান্ত সরকার, ছোট রাজেন্দ্রনাথ সরকার, কালীকৃষ্ণ সরকার, রসিকলাল সরকার, কালীদাস সরকার, গৌর সরকার, নিতাই সরকার প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিশিকান্ত সরকার ছাড়া এঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন তাঁর শিষ্য বা শিষ্য সমতুল্য।

বাংলাদেশের কবিগানে বিজয় সরকারের অবদান অসামান্য। কবিগানের পাঁচালিতে বিভিন্ন আঙ্গিকের ধুয়া গান পরিবেশনে তাঁর জুড়ি ছিল না। তাঁর রচিত, সুরারোপিত এবং পরিবেশিত এইসব ধুয়া গানের মান ছিল অসাধারণ। সঙ্গত কারণে এক্ষেত্রে তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বস্তুত বাংলাদেশে এবং পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে যাঁরা কবিগান পরিবেশন করেন, তাঁদের প্রায় সকলেই বিজয় সরকারের রচিত ধুয়া গান দিয়ে পাঁচালি পরিবেশন করে থাকেন। অনেক আসরে শ্রোতারাই বিজয় সরকারের ধুয়া গান শোনার জন্য অনুরোধ করে থাকেন। বিজয় সরকার এভাবে কবিগানের অসামান্য এক উদাহরণ হয়ে ওঠেন।

বিজয় সরকারের অন্যতম সহযোগী ছিলেন গোপালগঞ্জের নিশিকান্ত সরকার (১৯১৩-১৯৯৩)। নিশিকান্ত সরকার তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য 'সিদ্ধান্তবিশারদ' উপাধি পেয়েছিলেন। ষাটের দশকের পূর্বে বেশ কয়েক দশক বিজয় সরকার এবং নিশি সরকার জোট গঠন করে কবিগান পরিবেশন করতেন বলে পদ্মার দক্ষিণাঞ্চলে কবিগানের সঙ্গে বিজয়-নিশির নাম একীভূত হয়ে যায়।

---

৩১. জসীমউদ্‌দীন, *জীবনকথা* (ঢাকা : পলাশ প্রকাশনী, ১৯৬৪), পৃষ্ঠা ১২৬

এই দুজনের মধ্যে বিজয় সরকার যেমন তাঁর ধুয়া গানের জন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন, একইভাবে নিশিকান্ত সরকার বিখ্যাত ছিলেন তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান, পাণ্ডিত্য, সৃজনশীলতা ও কবিপ্রতিভার জন্যে।

পিরোজপুর জেলার কাঁঠালিয়া গ্রামের দ্বিজবর সরকার (১৯১৯-২০০০) ছিলেন রাজেন্দ্রনাথ সরকারের প্রিয় শিষ্যদের একজন। কিন্তু বাচনভঙ্গি ও ভাষাশৈলীর দিক দিয়ে তিনি ছিলেন তাঁর গুরুর ঠিক বিপরীত। তাঁর গুরুর ভাষা ছিল সংস্কৃতানুসারী, অত্যন্ত শুদ্ধ ভাষায় তিনি কথা বলতেন, তাঁর রচিত গানে কোনো আঞ্চলিক শব্দ থাকত না। কিন্তু দ্বিজবর সরকার যেমন আঞ্চলিক ভাষায় গান লিখতেন, তেমনি পাঁচালি অংশেও পিরোজপুরের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করতেন। বরিশাল অঞ্চলের সাধারণ শ্রোতার মানসিক সমর্থন আদায় করার ক্ষেত্রে ও কৌশল অনেক সময়ে কাজে লাগত। দ্বিজবর সরকারের মা একজন সুকণ্ঠী গায়িকা ছিলেন, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মতুয়া সংগীত পরিবেশন করতেন। দ্বিজবর সরকারের জ্যেঠতুতো ভাই বিশ্বেশর সরকারও খ্যাতিমান কবিয়াল ছিলেন। দ্বিজবর সরকারের একটি বিখ্যাত ধুয়া গান রয়েছে, তাতে তাঁর সমকালের খ্যাতিমান কবিয়ালদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

বাগেরহাটের ভাগা গ্রামের রসিকলাল সরকার (১৯২৮-১৯৯০) ছিলেন যেমন সুকণ্ঠের অধিকারী, তেমনি তাঁর সৃজনশীলতার মানও ছিল খুব উন্নত। তাঁর প্রথম গুরু ছিলেন বাগেরহাটের গৌরপদ সরকার, পরে তিনি বিজয়কৃষ্ণ সরকারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বিজয়কৃষ্ণ সরকারের মতো রসিক সরকারও প্রচুর ধুয়া গান রচনা করেছেন। তাঁর ধুয়া গানের সুর সমকালে খুব জনপ্রিয়তা পায়। তাঁর 'চিঠি লিখি তোমার কাছে ব্যথার কাজলে/ আশা করি পরান বন্ধু আছো কুশলে' ধুয়া গানটি অসাধারণ জনপ্রিয়। রসিকলাল সরকার ১৯৬৮ সালে দেশত্যাগ করেন এবং পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেন। দীর্ঘদিন সেখানে তিনি কবিগান করেছেন।

কবিগানে, বিশেষভাবে পদ্মার দক্ষিণাঞ্চলে ছোট রাজেন্দ্রনাথ সরকার (১৯২৩-২০০৯) ও কালীদাস সরকার (১৯৩৫-২০০৮) নামের দুই সহোদর বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এঁদের জন্মস্থান গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়ায়। ছোট রাজেন্দ্রনাথ সরকারের শিষ্য বাংলাদেশে বর্তমানে যাঁরা কবিগান পরিবেশন করেন, তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন এই দুজনের উত্তরসূরি– বংশগত দিক দিয়ে এবং শিষ্য-পরম্পরার দিক দিয়ে। এঁদের দুইজন ভাগিনেয় পিরোজপুরের মণিলাল সরকার এবং গোপালগঞ্জের যতীন্দ্রনাথ সরকার, শুকচাঁদ সরকার, বাগেরহাটের সন্ধ্যা সরকার; এবং কালীদাস সরকারের শিষ্যদের মধ্যে মাদারীপুর জেলার মনোরঞ্জন বসু, প্রশান্ত সরকার, রুহিদাস সরকার প্রমুখ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। দুই ভাইয়ের মধ্যে রাজেন্দ্রনাথ সরকারের কবিপ্রতিভা ছিল অসাধারণ, অন্যদিকে কালীদাস সরকার ছিলেন অসাধারণ সুকণ্ঠের অধিকারী।

এ সময়ের অধিকাংশ কবিয়ালের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা খুব কম। ক্বচিৎ মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পাস কবিয়াল দেখা যায়। এঁদের মধ্যে ব্যতিক্রম সঞ্জয় মল্লিক। তিনি এমএ পাস এবং একটি বেসরকারি কলেজের শিক্ষক। নারায়ণ সরকার তাঁর কবিগানের গুরু। গানের মরশুম শুরু হলে তাঁকেও কবিগান করতে হয়। তাঁর রচিত ধুয়া গানের সংখ্যা যথেষ্ট। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এই কবিয়াল অন্যান্য কবিয়ালের তুলনায় যথেষ্ট ভিন্ন রুচির পরিচয় দেন। তাঁর গুরু অনেক অশ্লীল কথা আসরে উচ্চারণ করলেও তিনি এ ব্যাপারে যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়ে থাকেন।

পদ্মার দক্ষিণাঞ্চলে বেশ কয়েকজন মহিলা কবিয়ালের দেখা পাওয়া যায়। কোলকাতা পর্বের মহিলা কবিয়াল বা ঝালকাঠি পর্বের মহিলা কবিয়ালের তুলনায় এঁদের সামাজিক মর্যাদা সম্পূর্ণ আলাদা। এই মহিলা কবিয়ালদের মধ্যে সন্ধ্যা সরকার এবং মীরা সরকার বিশেষ জনপ্রিয়।

বাগেরহাট জেলার বেড়গজালিয়া গ্রামের সন্ধ্যা সরকার (জ. ১৯৫৪) বাগেরহাট মহিলা কলেজে পড়ার সময়ে কবিগানের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ছোট রাজেন্দ্রনাথ সরকারকে গুরু করে কবিগানের দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৮২ সালে তিনি গুরু রাজেন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসী হন। সেখানে

শ্রীনিবাস সরকার, অমূল্য সরকার, নারায়ণ সরকার, অসীম সরকার, কালাচাঁদ সরকার, শুকচাঁদ সরকার, তমাল সরকার, প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অল্প দিনেই তিনি এতটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন যে, কোলকাতার 'বর্তমান', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'সানন্দা' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর সাক্ষাৎকার মুদ্রিত হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া তাঁর ভালো না লাগায় অচিরে বাংলাদেশে ফিরে আসনে। চিরকুমারী সন্ধ্যা সরকার বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কবিগান করছেন।

সন্ধ্যা সরকারের একজন যোগ্য উত্তরসূরি বাগেরহাটের হলদিবুনিয়া গ্রামে মীরা সরকার (জ. ১৯৭৭)। খুব অল্প বয়সে তিনি কবিগানের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং কবিগান শেখার জন্য পশ্চিমবঙ্গে অনাদিজ্ঞান সরকারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অনাদিজ্ঞান সরকারের শিষ্য হিসেবে ১৯৯০-এর দশকে তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ, এমনকি নেপালে পর্যন্ত কবিগান করার সুযোগ পেয়েছেন। বর্তমানে তিনি তাঁর শ্বশুরবাড়ি বাগেরহাটের দুর্গাপুর গ্রামে বাস করেন। কবিগান শেখা শেষ করে একুশ শতকের সূচনায় তিনি বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং নিয়মিতভাবে কবিগান পরিবেশন করতে থাকেন।

প্রারম্ভিক পর্যায়ে গোপালগঞ্জ অঞ্চলের সবচেয়ে খ্যাতিমান কবিয়াল তারকচন্দ্র সরকারের জন্ম উনিশ শতকের প্রথমার্ধে– ১৮৪৫ সালের ২৭ নভেম্বর শনিবার নড়াইল জেলার জয়পুর গ্রামে। তাঁর মৃত্যু হয় বিশ শতকের সূচনায়– ১৯১৪ সালের ১৫ নভেম্বর মঙ্গলবার। এই সময়ে কোলকাতায় কবিগান বহাল তবিয়তে চালু ছিল। তখনকার পল্লিবঙ্গেও তা সম্প্রসারিত হয়ে যায়। তাই গ্রামাঞ্চলে তখন খ্যাত-অখ্যাত বহু কবিয়াল কবিগান পরিবেশন করতেন। তারকচন্দ্র সরকারের প্রথম গুরু ছিলেন তাঁর পিতা কাশীনাথ কাঁড়ার এবং দ্বিতীয় গুরু গোপালগঞ্জের মল্লকান্দি গ্রামের মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস। তারকচন্দ্র সরকারের বয়স যখন ১৪ বছর তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। কাশীনাথের জন্ম তাই আঠারো শতকের শেষদিকে হওয়া স্বাভাবিক। এই উদাহরণ থেকে মনে হয়, উনিশ শতকের সূচনায় যশোর-খুলনা-ফরিদপুর অঞ্চলে কবিগান জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তারকচন্দ্র সরকারের পিতৃব্যগণ কোলকাতায় চাকরি করতেন। সেই সূত্রে তারকচন্দ্র ছোটবেলায় এক বা একাধিকবার কোলকাতার গিয়ে থাকবেন। এর ফলে কোলকাতা অঞ্চলের কবিগানের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটা সম্ভব।

তারকচন্দ্র সরকার তাঁর সমকালে যেসব কবিয়ালের বিপক্ষে কবিগান করেছিলেন, তাঁর মধ্যে নরসিংদীর হরিচরণ আচার্য; শেরপুরের আনন্দ সরকার; গোপালগঞ্জের বেচারাম সরকার, আনন্দ সরকার, বিষ্ণুপদ সরকার, অম্বিকাচরণ বিশ্বাস, রজনী সরকার, ঝিনাইদহের পাগলা কানাই, ইদু বিশ্বাস; মাগুরার গোবিন্দ তাঁতি, হাকিমচাঁদ; নড়াইলের রাইচরণ সরকার, ফজর আলী বয়াতি; পিরোজপুরের দ্বারিক বিশ্বাস; বাগেরহাটের নদীয়ারচাঁদ সরকার, মধুর দেব সরকার প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তারকচন্দ্র সরকার তাঁর প্রিয় শিষ্য হরিবর সরকার, মনোহর সরকার প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেছেন, এমনকি প্রশিষ্য রাজেন্দ্রনাথ সরকারের বিপক্ষেও তিনি কবিগানে করেছেন।[৩২]

ঢাকার কবিয়াল হরিচরণ আচার্যের কবিগানে ময়মনসিংহ অঞ্চলের রীতি এবং তারকচন্দ্র সরকারের রীতির সম্মিলন ঘটাতে দেখা যায়। অর্থাৎ যেমন তিনি টপ্পা গানের পরে প্রথম ছড়া কাটতে শুরু করার পূর্বে ময়মনসিংহ অঞ্চলের মতো 'দিশা' ব্যবহার করতেন, আবার ত্রিপদীর ছড়া শেষ করে পয়ার ছন্দে পাঁচালি শুরু করার মাঝখানে তারকচন্দ্র সরকারের মতো পুরো একটা গান পরিবেশন করতেন। হরিচরণ আচার্য ময়মনসিংহ অঞ্চলে যেমন কবিগান করেছিলেন, একইভাবে তরুণ বয়সে তারকচন্দ্র সরকারের বিপক্ষেও কবিগান করেছিলেন। তাই এভাবে উভয় রীতির সম্মিলন ঘটা তাঁর গানে স্বাভাবিক ছিল। পূর্ববঙ্গের সব অঞ্চলে তাঁর প্রভাব ব্যাপক হওয়ায় সব অঞ্চলেই টপ্পা-পাঁচালির এই রীতি আদর্শ-রীতিতে পরিণত হয়। এভাবে কবিগানের মধ্যে সম্পূর্ণ একটি ধুয়া গান পরিবেশনের যে রীতি তারকচন্দ্র সরকার সৃষ্টি করেন, হরিচরণের মাধ্যমে তা সর্ববঙ্গীয় গ্রহণযোগ্যতা পায়।

---

৩২. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ১৩২

অর্ধশতাব্দীর ব্যবধানে কবিগানের টপ্পা-পাঁচালিতে ব্যবহৃত ধুয়া গানগুলো কবিগানের প্রধান আকর্ষণে পরিণত হয়ে ওঠে। বিশ শতকের শেষ নাগাদ এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, অনেক সাধারণ শ্রোতা মনে করতে শুরু করেন যে, ধুয়া গানগুলোই প্রকৃত কবিগান।

তারকচন্দ্র সরকারের শিষ্য-পরম্পরার কবিয়ালগণ বিশ শতকের বৃহত্তর যশোর, খুলনা, ফরিদপুর ও বরিশালের প্রতিনিধিত্ব করেন। নিম্নের লতিকায় তারকচন্দ্র সরকারের এই পরম্পরাকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হল :

তারকচন্দ্র সরকারের শিষ্য-পরম্পরা

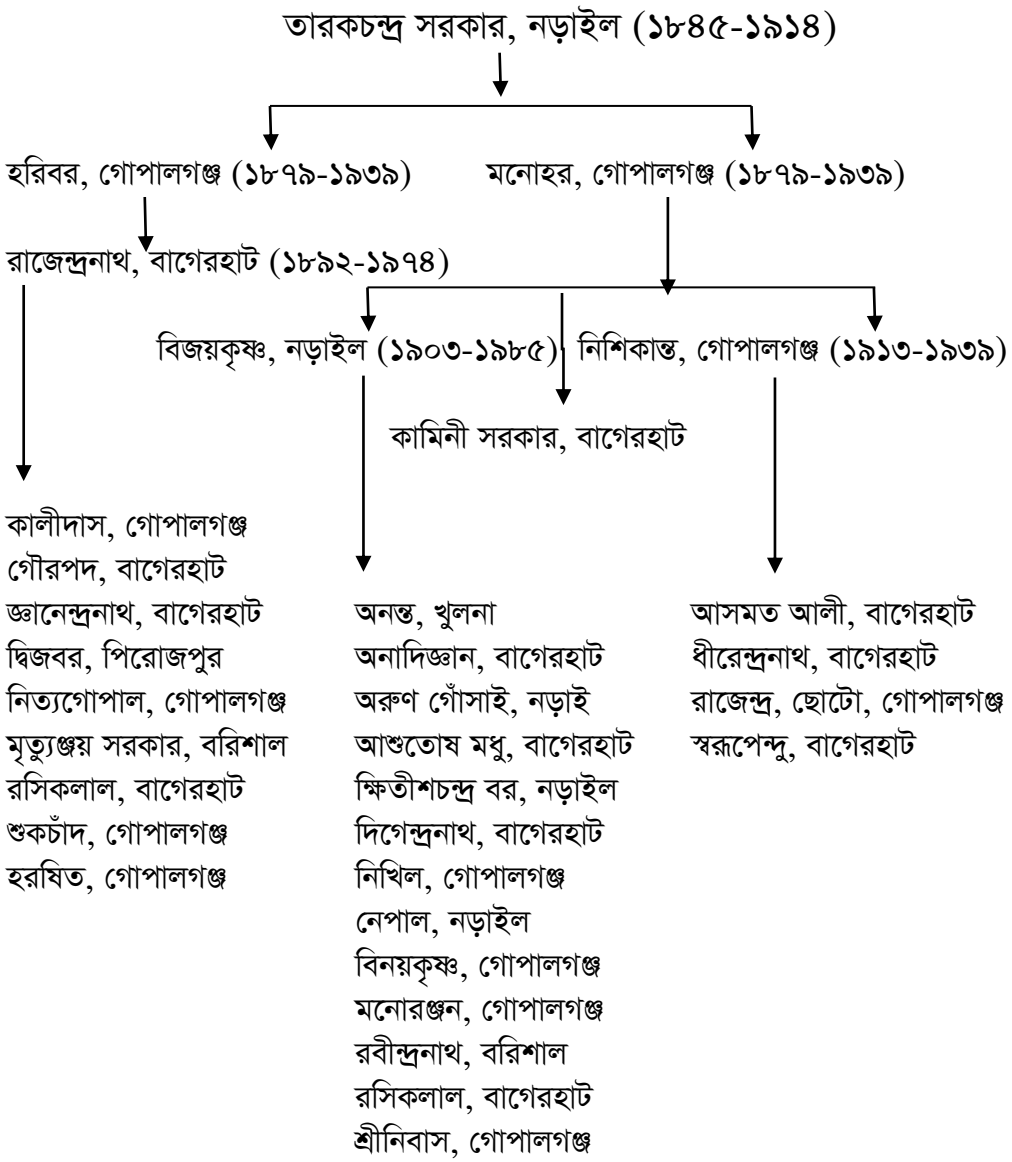

টীকা : একুশ শতকের সূচনায় রাজেন্দ্রনাথ সরকার, বিজয়কৃষ্ণ সরকার এবং নিশিকান্ত সরকারের প্রশিষ্যরা বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের কবিগানের প্রধান ধারার কবিয়াল, যাঁদের নাম এই তালিকায় পাওয়া যাবে না, তাঁদের গুরুদের নামই শুধু এখানে রয়েছে।[৩৩]

৩৩. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ১৩৪

বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, তারকচন্দ্র সরকারের এই শিষ্য-পরম্পরার মধ্যে যাঁদের নাম উল্লেখ করা হল, তাঁরা সকলেই বিশেষ একটি অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করেন। এঁদের বাড়ি গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট, নড়াইল, খুলনা, বরিশাল এবং পিরোজপুর। আলোচনার সুবিধার্থে এই অঞ্চলকে গোপালগঞ্জ অঞ্চল বলা হয়েছে। এই নামকরণের পিছনে প্রধান যুক্তি হল, যশোরের নড়াইলে এই ধারার সূচনা হলেও এই পরম্পরার অধিকাংশ কবিয়ালের বাড়ি গোপালগঞ্জ। এছাড়া এই পরম্পরার অধিকাংশ কবিয়াল গোপালগঞ্জের ওড়াকান্দি হরিচাঁদ ঠাকুরের অনুসারী ছিলেন। সেটিও বিবেচ্য। অনেকে এই ধারাকে মতুয়া ধারা নামে চিহ্নিত করে থাকেন, তা-ও গোপালগঞ্জের প্রাধান্য স্বীকারের শামিল।[৩৪]

ব্যবস্থাপনাগত তাৎপর্যপূর্ণ গভীর কিছু অনৈক্য থাকলেও গোপালগঞ্জ অঞ্চলের কবিগানের বিষয় ও প্রকরণের সঙ্গে ঝালকাঠি অঞ্চলের বিষয় ও প্রকরণের মিল ঘনিষ্ঠ। তারকচন্দ্র সরকারের সমকালীন ছিলেন গোপালগঞ্জের দুর্গাপুর গ্রামের আনন্দ সরকার। আনন্দ সরকারের শিষ্য ছিলেন বাগেরহাটের বৈঝাকি গ্রামের নদীয়ারচাঁদ সরকার (১৮৪৯-১৯২৬)। নদীয়ারচাঁদ সরকার ছিলেন অত্যন্ত সমাজসচেতন ও রাজনীতিসচেতন একজন কবিয়াল।

তারকচন্দ্র সরকারের প্রধান তিন শিষ্যের নাম গোপালগঞ্জের দুর্গাপুর গ্রামের হরিবর সরকার, মনোহর সরকার, এবং বাগেরহাটের জেলার গঙ্গচর্না গ্রামের অশ্বিনী সরকার।[৩৫] এঁদের সমসাময়িক ছিলেন পিরোজপুরের রঘুনাথপুর গ্রামের কুঞ্জলাল দত্ত। কুঞ্জলাল দত্তের গুরু ছিলেন তারকচন্দ্র সরকারের সমকালীন ও প্রতিপক্ষের কবিয়াল বাগেরহাটের বিধুভূষণ দেব সরকার।[৩৬] বিশ শতকের প্রথমার্ধে যাঁরা কবিগানে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন এই হরিবর সরকার, মনোহর সরকার এবং কুঞ্জলাল সরকারের শিষ্য। এঁদের মধ্যে হরিবর সরকারের শিষ্য রাজেন্দ্রনাথ সরকার (১৮৯২-১৯৭৪), কুঞ্জলাল সরকারের শিষ্য নকুলেশ্বর দত্ত (১৮৯৪-১৯৮৭), এবং মনোহর সরকারের শিষ্য বিজয়কৃষ্ণ সরকারের (১৯০৩-১৯৮৫) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রাজেন্দ্রনাথ সরকারের কবিপ্রতিভা ছিল অসাধারণ। তাঁর সম্পর্কে যতীন সরকার লিখেছেন :

> "তিনি যেমন ছিলেন সুদক্ষ নায়ক, বাদ্যযন্ত্রেও তাঁর ছিল তেমনই অধিকার। সঙ্গীতের রাগরাগিণী বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর, ছড়া কাটাতেও ছিলেন কুশলী।"[৩৭]

রাজেন্দ্রনাথ সরকার সম্পর্কে এ মন্তব্য যথার্থ। পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীনের সঙ্গে রাজেন্দ্রনাথ সরকারের বিশেষ পরিচয় ছিল। কোলকাতার মানুষকে পূর্ববঙ্গের কবিগান শোনানোর লক্ষ্যে রাজেন্দ্রনাথকে তিনি ১৯৩২ সালে কোলকাতায় নিয়ে গিয়েছিলেন এবং কোলকাতার অ্যালবার্ট হলে কবিগানের আয়োজন করেছিলেন। যদিও সে বারে কোলকাতায় তাঁর কবিগান পরিবেশন যথেষ্ট সুখকর হয়নি।[৩৮] এরপর ১৯৩৭ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর কোলকাতার আশুতোষ ভবনে রাজেন্দ্রনাথ সরকার এবং বিজয়কৃষ্ণ সরকারের কবির লড়াই হয়। এই গানের বিষয় ছিল নারী ও পুরুষ। রাজেন্দ্রনাথ ছিলেন পুরুষ পক্ষে এবং বিজয়কৃষ্ণ সরকার ছিলেন নারী পক্ষে। সেখানে শ্রোতা হিসেবে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেনের মতো বিদগ্ধ লোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা এই কবিয়ালদ্বয়কে আলাদা দুটি প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন। রাজেন্দ্রনাথকে দেওয়া প্রশংসাপত্রে তাঁরা লিখেছিলেন,

---

৩৪. বিরাট বৈরাগ্য, *মতুয়া সাহিত্য পরিক্রমা* (কোলকাতা : অশোককুমার রায়, ১৯৯৯), পৃষ্ঠা ৫২৫-৬৮৭

৩৫. যতীন সরকার, *বাংলাদেশের কবিগান*, পৃষ্ঠা ২৯

৩৬. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ১৩৫।

৩৭. যতীন সরকার, *বাংলাদেশের কবিগান*, পৃষ্ঠা ৯৮

৩৮. জসীমউদ্‌দীন, *জীবনকথা* (ঢাকা : পলাশ প্রকাশনী, ১৯৬৪), পৃষ্ঠা ১২৪-১২৫ ও মনিমণ্ডল ঠাকুর ও গোপাল বিশ্বাস সম্পাদিত, (কোলকাতা; চতুর্থ দুনিয়া, ২০০২), পৃষ্ঠা ২৮২

'আমরা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথের কবিত্বশক্তি, শাস্ত্রজ্ঞান, বাগ্মিতা, এবং সংগীতশক্তি দেখিয়া সাতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। তাঁহার মতো সুযোগ্য কবিগায়ক দেশের সর্বত্র সমাদৃত হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।'[৩৯]

বিজয়কৃষ্ণ সরকারকেও অনুরূপ প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়েছিল। কাছাকাছি সময়ে তাঁরা কাশিমবাজার মহারাজের পুত্র শ্রীশ নন্দীর বাসভবনে এবং পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীনের সহায়তায় আকাশবাণী কোলকাতা কেন্দ্রে কবিগান পরিবেশনের সুযোগ পেয়েছিলেন।

রাজেন্দ্রনাথ সরকার অত্যন্ত সমাজসচেতন কবি ছিলেন। তিনি নিজে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের ছিলেন, তাই হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যতা, বর্ণবৈষম্য প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি হিন্দু সমাজের কঠোর সমালোচনা করতেন। অনেক সময়ে তাঁর সেই সমালোচনা আক্রমণাত্মক হয়ে উঠত। ডাক-মালশি প্রভৃতি গানের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর সেই সংস্কারমুখী মনোভাবের প্রতিফলন ঘটান। যেমন রাজেন্দ্রনাথ সরকারের মালশি গানের বিখ্যাত এই অংশ :

"কত মদের নেশায় বদের দশায় ব্রাহ্মণ খায় বেশ্যাবাড়ির ভাত
তাতে হয় না জাতিপাত, মা মাগো, বেশ্যালয় কি ঠাকুর জগন্নাথ ॥
নটীর হুঁকায় তামাক খেয়ে কুলীন কোলায় বাড়ি গিয়ে
এসব ব্রাহ্মণকে না প্রণাম দিয়ে নটীর পদে কোটি দণ্ডবৎ ॥"[৪০]

তাঁর সমকালের প্রায় সকল কবিয়ালের বিপক্ষে রাজেন্দ্রনাথ সরকার কবিগান করেছেন। তাঁর গুরু ছিলেন হরিবর সরকার। হরিবর সরকারের গুরু তারকচন্দ্র সরকারের বিপরীতেও কবিগান করার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে। রাজেন্দ্রনাথ সরকার পর পর কয়েক বছর হরিচরণ আচার্যের দলে কোল-সরকার হিসেবে কাজ করেছেন। এক বছর নকুলেশ্বর দত্তও ঐ দলে কোল-সরকার হিসেবে কাজ করেছিলেন। দলে আরো একজন কোল-সরকার ছিলেন কাশী নট্ট নামে। হরিচরণ আচার্য তখন নিজে গান না করে শুধু কোল-সরকারকে দিয়ে গান করাতেন। যেমন এক বছর কাশী নট্টকে বলেছিলেন পাঁচালি বলতে এবং রাজেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন টপ্পা এবং ডাক-ছড়া বলতে।[৪১] ডাক-ছড়া হল ত্রিপদী ছন্দের ছড়া। টপ্পা রচনা করাও বেশ কঠিন কাজ। রাজেন্দ্রনাথকে এই দুটি কঠিন দায়িত্ব প্রদান করার অর্থ তাঁর সৃজনশীলতার ওপরে হরিচরণ আচার্যের যথেষ্ট আস্থা থাকা। হরিচরণ আচার্য রাজেন্দ্রনাথ সরকারকে খুব স্নেহ করতেন। রাজেন্দ্রনাথ ও তাঁর পরিচয় দেওয়ার সময়ে হরিচরণ আচার্যকে তাঁর গুরু হিসেবে উল্লেখ করতেন। রাজেন্দ্রনাথ সরকারের সৃজনশীলতা এবং কবিপ্রতিভা তাঁর সময়ে তুলনাহীন। শব্দচয়নে এবং কবিত্বগুণে তিনি তাঁর সমকালীন সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর রচিত ডাক, মালশি, সখীসংবাদ প্রভৃতির মান খুব উন্নত, কবিতা হিসেবেও সেগুলো মূল্যবান। সংখ্যার দিক দিয়েও তা সমকালীন কবিয়ালদের চেয়ে বেশি ছিল। উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষাদির প্রয়োগে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর রচনার অনেক গান উত্তরসূরিদের নিকট মুখস্থ। বিশ শতকের কবিগানের আসরেও তাঁরা এগুলো পরিবেশন করে থাকেন।

ঝালকাঠি অঞ্চল

উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে পদ্মার দক্ষিণাঞ্চলের ঝালকাঠিতে কবিগানের বিশেষ একটি কেন্দ্র গড়ে ওঠে। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে পূর্ববঙ্গের কবিগান আলোচনায় ঝালকাঠির এই কেন্দ্র বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার।[৪২]

---

৩৯. স্বরোচিষ সরকার, "কবিগান : অতীত ও বর্তমান", *সাহিত্য পত্রিকা*, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ১৮৯
৪০. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ১৩৮
৪১. দীনেশচন্দ্র সিংহ, *কবিয়াল কবিগান*, পৃষ্ঠা ২৮৬
৪২. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ১৩৯

ঝালকাঠিতে গড়ে ওঠা কবিগানের দলগুলো ছিল পরিপূর্ণভাবে পেশাদার। এখানে বেশ কয়েকটি কবিগানের দল ছিল। তার মালিকানা ছিল সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির হাতে। দলগুলোতে কবিয়াল, দোহার, যন্ত্রসঙ্গতকারীরা বৎসর ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ হতেন। প্রতিবছর রথযাত্রার সময়ে নতুন চুক্তি হওয়া ও পুরাতন চুক্তি নবায়নের কাজ হত। গানের মরশুম শুরু হত দুর্গাপূজার দশ দিন পূর্ব থেকে। গান আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে শিল্পী আসরে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হতেন অথবা গান চলা অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়তেন, তাহলে অপরাধ অনুযায়ী সাত দিন অথবা পনেরো দিনের বেতন কাটার নাম 'হেমারতি'। অন্যদিকে কেউ যদি কোনো বায়নার তিন পালা গানের দ্বিতীয় পালা গান করার পর অনুপস্থিত থাকতেন এবং পরবর্তী বায়নার শুরুতে উপস্থিত হতেন, তাহলে এক বায়না থেকে অন্য বায়না পর্যন্ত সময়ের বেতন পেতেন না, নতুনভাবে কাজে যোগ দিতে হত, এর নাম হল'কামাই'।[৪৩] ঝালকাঠি অঞ্চলের কবিগানে এমন কঠোর পেশাদারি ব্যবস্থাপনা চালু ছিল।

পেশাদারি এই কবির দলের অনেকগুলোরই মালিক ছিলেন নারী। এইসব দলে মহিলা দোহার থাকতেন। অনেক সময়ে দলের মালিক দোহারের কাজ করতেন। দলে নারী নৃত্যশিল্পীও থাকতেন। ঐকতান বাদনের সময়ে নারী নৃত্যশিল্পীরা আসরে গিয়ে নাচতেন। অনেক দোহার এই নাচে অংশগ্রহণ করতেন, আবার বিশেষভাবে খেমটাওয়ালি নামে পরিচিত নারীশিল্পীরা এই ধরনের নাচে পটু থাকতেন। নাচতে জানা দোহার এবং খেমটাওয়ালিদের বেতন সাধারণ দোহারদের থেকে বেশি হত। অনেক নারী দোহার এতটাই সচ্ছল ছিলেন যে, অনেকের সঙ্গে পঞ্চাশ ভরির বেশি সোনার গয়না থাকত এবং সেই পরিমাণ গয়না পরেই তাঁরা আসরে নাচ-গান করতেন।[৪৪]

কবিগানের এই ঝালকাঠি-ব্যবস্থাপনা পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চল থেকে খানিকটা আলাদা ছিল। এই আলাদা হওয়ার পেছনে ঝালকাঠিতে অবস্থিত অন্যান্য কিছু সাংস্কৃতিক উপাদান এবং তার ব্যবস্থাপনা প্রভাবক হিসেবে কাজ করে থাকতে পারে। বিশ শতকের প্রথমদিকে ঝালকাঠি হয়ে উঠেছিল বিভিন্ন লোকশিল্পের একটি কেন্দ্রভূমি। এসব লোকশিল্পের মধ্যে ছিল যাত্রাগান, কবিগান, জারিগান, রামায়ণগান, কীর্তনগান, ভাসাযাত্রা গান, গাজির গান প্রভৃতি। এসব লোকশিল্পের শিল্পীরা যেমন এখানে এসে জড় হতেন, তেমনি পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে যাঁরা এসব গানের আয়োজন করতে চাইতেন, তাঁরাও এখানে এসে ঐসব গানের বায়না করে যেতেন। এই সুযোগে কিছু অর্থবিনিয়োগকারী ব্যক্তি এইসব দল সংগঠনে ভূমিকা রাখতেন। এর ফলে কবিগানের ব্যবস্থাপনাও যাত্রা, কীর্তন ইত্যাদির অনুরূপ হয়ে উঠেছিল।

বিশ শতকের সূচনায় ঝালকাঠিতে কবিগানের দল ছিল আট-দশটি। এর মধ্যে একটির মালিক ছিলেন কামিনীকান্ত নট্ট। তাঁর দলের সরকার ছিলেন যষ্ঠীচরণ করাতী, পরে তাঁর শিষ্য রাখাল আচার্য। যষ্ঠীচরণ করাতী বরিশালের বানারীপাড়ার নিকটবর্তী আলতা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। যষ্ঠীচরণ করাতী নরসিংদীর বিখ্যাত কবিয়াল হরিচরণ আচার্যের বিপক্ষে কবিগান করেছেন। হরিচরণ আচার্য তাঁকে বিশেষ সমীহ করতেন বলে জানা যায়।

অধরমণি বৈষ্ণবীর দলে কবিয়াল ছিলেন পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর থানার রঘুনাথপুর গ্রামের কুঞ্জলাল দত্ত। বিশ শতকের বিখ্যাত কবিয়াল নকুল দত্ত ছিলেন এই কুঞ্জলাল দত্তের পালিত পুত্র। নকুল দত্ত মূলত ছিলেন নলছিটি থানার সুয়াকাঠি গ্রামের বেচারাম দাসের পুত্র। কুঞ্জলাল অপুত্রক ছিলেন বলে নকুলকে তিনি নিজ পুত্ররূপে গ্রহণ করেন এবং কবিগান শেখান। দলের মালিক অধরমণির সঙ্গে কুঞ্জ দত্তের সম্পর্ক কতটা গভীর ছিল তা বোঝা যায়, নকুল দত্ত তাঁকে 'মা' বলে ডাকতেন। বস্তুত কুঞ্জ দত্ত এবং অধরমণি স্বামী-স্ত্রীর মতো বসবাস করতেন। নকুল দত্ত তাঁর দত্ত পদবিটি গ্রহণ করেছিলেন এই গুরুপিতার পদবি থাকে।

---

৪৩. দীনেশচন্দ্র সিংহ, *কবিয়াল কবিগান*, পৃষ্ঠা ৫২

৪৪. দীনেশচন্দ্র সিংহ, *কবিয়াল কবিগান*, পৃষ্ঠা ১২৭

এ সময়ে ঝালকাঠিতে কবিয়াল হিসেবে যাঁরা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কুঞ্জলাল দত্ত, শরৎ বৈরাগী, উমেশ শীল, ভারত শীল, বিধুভূষণ দেব, কুসুমকুমারী, মনোমোহিনী, অম্বিকা পাটনী, ষষ্ঠী সরকার, নকুলেশ্বর দত্ত, চন্দ্রকান্ত দাস, অনাথবন্ধু নাগ, রাখাল আচার্য প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৪৫]

ঝালকাঠিতে যেসব নারীশিল্পী কবিগানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অধরমণি, গোলোকমণি, গোলোকমণির মেয়ে কালা যামিনী, রাঙা যামিনী, রাঙা যামিনীর বোন কামিনী, কামিনীর মেয়ে বোঁচা বা সুরধুনী, সরলা, মনোমোহিনী, মনোমোহিনীর কন্যা হরিদাস, কালা সুখদা, মানদা, রাধি, লাভি, অনন্তবালা, সাহেবগঞ্জের ক্ষীরোদা, ক্ষীরোদা, খেমটাওয়ালি লক্ষ্মী বৈষ্ণবী, রাধালক্ষ্মী, দক্ষবালা, মনোহরা, শরৎবালা বা শরতী, প্রিয়বালা বা ঢেড়া বোঁচা, গৌরী, হিরণবালা প্রমুখ ছিলেন জনপ্রিয়। এঁদের মধ্যে শরৎবালা বা শরতী ছিলেন নপুংসক। মেয়েদের নাম গ্রহণ করলেও সব সময়ে তিনি পুরুষের পোশাক পরে থাকতেন।[৪৬] ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময়ে এই শিল্পীদের প্রায় সকলে দেশত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসী হন। এই নারীশিল্পীদের বৈবাহিক জীবন ছিল না। তবে তাঁরা কোনো-না-কোনো পুরুষ সহকর্মীর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মতো বসবাস করতেন।[৪৭] এঁদের মধ্যে অন্তত দুজন, যথা প্রিয়বালা এবং হিরণবালা যথাক্রমে বিশ শতকের প্রথমার্ধের দুজন বিখ্যাত কবিয়াল রাজেন্দ্রনাথ সরকার এবং নকুলেশ্বর দত্তের সঙ্গিনী হয়েছিলেন। এর মধ্যে প্রিয়বালা বা ঢেড়া বোঁচা প্রথম জীবনে হরিচরণ আচার্যের দলে দোহার হিসেবে কাজ করতেন। রাজেন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে সেখানে তাঁর পরিচয় হয়ে থাকবে। প্রিয়বালা বিশ শতকের চল্লিশের দশকে রাজেন্দ্রনাথ সরকারের ছায়াসঙ্গিনীতে পরিণত হন। এমনকি সাতচল্লিশের দেশভাগের পরে রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি দেশত্যাগ করেন, আবার কয়েক বছর ভারতে কাটিয়ে রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসেন।

অনদিকে দেশভাগের পর নকুল দত্ত তাঁর স্ত্রী পুত্র নিয়ে বর্ধমানে বাসা নিলেও বছরের অধিকাংশ সময়ে থাকতেন কোলকাতায় বিডন স্ট্রিটে হিরণবালার প্রশস্ত বাসায়। কবিয়াল স্বরূপেন্দু সরকার কবিগান শেখার আশায় নকুল দত্তের সঙ্গে সেই বাসায় বেশ কয়েকদিন বাস করেছেন।[৪৮]

ঝালকাঠি পর্বের কবিগানের গায়িকা সরলা একটি নাটকীয় ব্যক্তিত্বের নাম। দীনেশচন্দ্র সিংহের 'কবিয়াল কবিগান' বই পড়ে মনে হয়, প্রথমদিকে সরলা ছিলেন কবিয়াল নকুল দত্তের অনুপ্রেরণার উৎস। নকুল দত্তের কবিয়াল হয়ে ওঠার পেছনে সরলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৯১৬ সালে নকুল দত্ত যখন প্রথম দল গঠন করেন, তখনও তাঁর অবস্থান ছিল সরলা'র বাড়িতে। ঝালকাঠি অঞ্চলে তিনি 'শেখ সরলা' নামে পরিচিত ছিলেন। কবিয়াল রাখাল আচার্যের মতো অনেকে তাই মনে করতেন তিনি মুসলমান-কন্যা। কিন্তু দীনেশচন্দ্র সিংহ জানান, সরলা আসলে রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া অজ্ঞাতকুলশীল একটি মেয়ে। একজন মুসলমান মিস্ত্রি তাঁকে কুড়িয়ে পেয়ে কোনো এক বৈষ্ণবীকে উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ শতকের সূচনায় আঠারো বছর বয়সী সরলা'র স্বার্ণালঙ্কারের পরিমাণ (প্রাই দুইশত ভরি), ঝালকাঠি শহরে তাঁর বাড়িঘরের অবস্থা (দেড় বিঘা জমির উপর পুকুরসহ) দেখে মনে হয়, তিনি আসলে কোনো এক বিত্তবান বৈষ্ণবীর কন্যা।

ঝালকাঠি অঞ্চলের কবিগানের স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনা সত্ত্বেও কবিগানের গঠন-কাঠামোগত দিক দিয়ে তা গোপালগঞ্জ অঞ্চলের কবিগানের থেকে মোটেই আলাদা ছিল না। ঝালকাঠির দলের সঙ্গে প্রায়ই

---

৪৫. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ১৪৩

৪৬. স্বরোচিষ সরকার , *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ১৪৩

৪৭. মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, "ভূমিকা", *হারামণি*, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-চুয়াত্তর

৪৮. স্বরোচিষ সরকার, "বাগেরহাটের লোককবি স্বরূপেন্দু সরকারের কবিয়াল জীবন ও তাঁর গান", *স্থানীয় ইতিহাস*, সংখ্যা, জুন-২০০৯, পৃষ্ঠা ১৫৪

গোপালগঞ্জ অঞ্চলের কবির দলের লড়াই হত। এমনকি ঢাকা-নোয়াখালীতে যখন ঝালকাঠির দল কবিগান করতে যেত, তখনও দেখা যেত প্রায় ক্ষেত্রে বিপক্ষের কবিয়াল গোপালগঞ্জ অঞ্চলের।[৪৯]

ঝালকাঠি অঞ্চলের সবচেয়ে খ্যাতিমান ও প্রতিভাবান কবিয়াল ছিলেন নকুলেশ্বর দত্ত বা নকুল দত্ত বা নকুল সরকার। তাঁর গুরু ছিলেন প্রথমে পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর থানার রঘুনাথপুরের কবিয়াল কুঞ্জলাল দত্ত। নকুলেশ্বর দত্ত বিশেষ সৌভাগ্যবান এইজন্য যে তিনি দীনেশচন্দ্র সিংহের মতো একজন গবেষকের ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তার ফলে তাঁর কবিয়াল জীবন বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ হতে পেরেছে।

নকুলেশ্বর দত্ত মাত্র একটি বছর হরিচরণ আচার্যের কোল-সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাতেই তিনি তাঁর প্রথম গুরু কুঞ্জলাল দত্তের পাশাপাশি হরিচরণ আচার্যকে গুরু হিসেবে স্বীকার করে নেন। নকুল দত্তের কবিয়াল জীবন অন্য কবিয়ালদের থেকে খানিকটা আলাদা ছিল। তিনি খুব অল্পদিন ডাক-সরকারি করেছিলেন, তাঁকে কখনো দোহারি করতে হয়নি, মাত্র বাইশ বছর বয়সে নিজে দল করেছেন, দলের দোহারদের মধ্যে তিনজন ছিলেন তরুণী। দল গঠনের পর অল্পকালের ব্যবধনে একটি পানসি নৌকা তৈরি করেন এবং নৌকায় যাতায়াত শুরু করেন।

নকুল দত্ত তৎকালীন পূর্ববঙ্গের প্রায় সব অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছেন। কবিগান করেছেন উনিশ শতকের শেষার্ধের এবং বিশ শতকের প্রধান সব কবিয়ালের সঙ্গে। পূর্ববঙ্গের কবিয়ালদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে দীর্ঘায়ু ছিলেন, জন্ম হয়েছিল উনিশ শতকের শেষ দশকে ব্রিটিশ ভারতে বরিশালের একটি প্রত্যন্ত গ্রামে, আর ৯৩ বছর বয়সে মৃত্যু হয় স্বাধীন ভারতে উদ্বাস্তু হিসেবে কোলকাতার উপকণ্ঠে। নকুল দত্তের কবিপ্রতিভা ছিল অসাধারণ। অল্প বয়স থেকেই তিনি কবিগানের বিভিন্ন অংশ, যথা– ডাক, মালশি, সখীসংবাদ, কবি, টপ্পা, ধুয়া প্রভৃতি রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর রচনার পরিমাণও প্রচুর।

মেঘনার পূর্বাঞ্চলের কবিগান

মেঘনার পূর্বাঞ্চল বলতে বৃহত্তর ত্রিপুরা, নোয়াখালী এবং চট্টগ্রামকে বোঝায়। কুমিল্লা-নোয়াখালী অঞ্চলের কবিগানের আসরে ঢাকা অঞ্চলের কবিয়ালরা যেমন কবিগান পরিবেশন করেছেন, গোপালগঞ্জ-ঝালকাঠি অঞ্চলের কবিয়ালগণও সেখানে কবিগান পরিবেশন করতে গেছেন। অনেক সময়ে কুমিল্লা-নোয়াখালী অঞ্চলের কবিয়ালগণের বিপক্ষেও ঐসব অঞ্চলের কবিয়ালগণ কবিগান পরিবেশন করেছেন। উনিশ শতকের শেষদিক নাগাদ কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চল এবং সেখানকার কবিয়ালদের সঙ্গে যেভাবে পদ্মার উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের কবিয়ালদের ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়, চট্টগ্রামের কবিয়ালগণ সেক্ষেত্রে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেন। মনে হয়, রমেশচন্দ্র শীলের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবিয়ালগণ চট্টগ্রাম এবং মিয়ানমারের ইয়াঙ্গুন শহরের মধ্যে তাঁদের যাতায়াত সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চলের স্থানীয় কবিয়ালদের মধ্যে প্রথমেই যাঁর নাম করতে হয়, তিনি হলেন চাঁদপুরের কালোশশী চক্রবর্তী (জ. ১৯২৫)। নোয়াখালীর রমেশচন্দ্র আচার্য (১৯০৭-১৯৭৪) এবং কুমিল্লার শচীন্দ্রকুমার শীলও (১৯১১-১৯৭৫) এই কালপর্বে বাংলাদেশে ছিলেন এবং কবিগান করেছেন। তবে এঁদের পরবর্তী প্রজন্ম হিসেবে কুমিল্লা, নোয়াখালীতে বিশেষ কোনো কবিয়ালগোষ্ঠীর জন্ম হয়নি। শতাব্দীর মাঝামাঝি এঁরা কুমিল্লা-নোয়াখালী অঞ্চলে গান করলেও শতাব্দীর শেষদিকে এই অঞ্চলের অধিকাংশ কবিগানের আসরে বায়না পেতেন বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের কবিয়াল।এইসব অঞ্চলের কবিগানের যাঁরা শ্রোতা তাঁদের বড় একটি অংশ পুরনো ধারার কবিগান শুনতে আগ্রহী হওয়ায়, পদ্মার দক্ষিণাঞ্চলের কবিয়ালগণ এখানে কবিগান পরিবেশনে অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন এবং সঙ্গত কারণেই পদ্মার দক্ষিণ অঞ্চলের কবিয়ালরাই এই অঞ্চলে বেশি

৪৯. দীনেশচন্দ্র সিংহ, *কবিয়াল কবিগান*, পৃষ্ঠা ২৯-৩৩

বায়না পেতেন। বিশ শতকের শেষার্ধে এখানে দক্ষিণাঞ্চল থেকে বিজয়কৃষ্ণ সরকার, অনাদিজ্ঞান সরকার, স্বরূপেন্দু সরকার, বিনয়কৃষ্ণ সরকার, রবীন্দ্রনাথ সরকার, নারায়ণ সরকার, গৌরাঙ্গ সরকার, সন্ধ্যা সরকার প্রমুখ এসে কবিগান করেন।

কুমিল্লা-নোয়াখালী অঞ্চল

বিশ শতকের সূচনায় বৃহত্তর কুমিল্লা পরিচিত ছিল ত্রিপুরা নামে, বর্তমানে যা চাঁদপুর, কুমিল্লা এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া নামে পরিচিত। অন্যদিকে নোয়াখালী জেলা ভেঙে হয়েছে নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও ফেনী। মেঘনা নদীর অপর তীরে হলেও উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় নাগাদ যশোর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহের সঙ্গে এসব অঞ্চলের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ প্রবল ছিল। কবিগান চর্চার ক্ষেত্রেও এই যোগাযোগ অব্যাহত থাকে। বিশেষভাবে কুমিল্লা এবং নোয়াখালীর জমিদারগণ যশোর-খুলনা-বরিশাল থেকে যেমন কবিয়াল নিয়ে যেতেন, একইভাবে ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকেও কবিয়াল নিয়ে গিয়ে কবির লড়াইয়ের ব্যবস্থা করতেন। এই যোগাযোগের ফলে কুমিল্লা-নোয়াখালী অঞ্চলের কবিয়ালগণ পদ্মার উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের কবিয়ালদের অনুরূপ রীতিতে অভ্যস্ত হন, তাঁদের গানের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুতে তাই লক্ষণীয় কোনো স্বাতন্ত্র্য তৈরি হয় না। বিশ শতকের আশির দশকের সূচনায় ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশনে চাঁদপুর জেলার কবিয়াল কালোশশী চক্রবর্তী (জ. ১৯২৫) বাগেরহাটের কবিয়াল স্বরূপেন্দু সরকারের (১৯৩৩-২০০৯) বিপক্ষে কবিগান করেছিলেন। সেই আসরে স্বরূপেন্দু সরকারের পরনে ছিল সাদা ধুতি এবং পাঞ্জাবি, অন্যদিকে কালোশশী চক্রবর্তীর দলের সঙ্গীগণ রঙিন পোশাক পরেছিলেন এবং তাঁদের পায়ে নূপুর ছিল।[৫০]

বিশ শতকের প্রথমার্ধে কুমিল্লা অঞ্চলে যাঁরা খ্যাতিমান ছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় জয়চন্দ্র মজুমদারের নাম। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে চাঁদপুর জেলার পাইকপাড়া গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর সমকালীন অন্য এক কবির নাম গৌর সরকার। কুমিল্লা অঞ্চলে এঁরাই প্রথমদিককার কবি। জয়চন্দ্রের শিষ্যদের মধ্যে পাইকপাড়ার জগবন্ধু দত্ত, হুসেনপুরের হরকুমার শীল, নোয়াখালীর বচৈর গ্রামের কালীকুমার মাস্টার (দে) প্রমুখের নাম জানা যায়। উনিশ শতকের শেষার্ধে জয়চন্দ্র তাঁর অন্যতম দোহার দয়ারামকে নিয়ে কোলকাতায় যান এবং সেখানে একাধিক পালা কবিগান পরিবেশন করেন। এভাবে কোলকাতা অঞ্চলের কবিগানের সঙ্গে কুমিল্লা অঞ্চলের কবিগানের একটা সরাসরি সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

নোয়াখালী অঞ্চলে যাঁরা বিশেষ খ্যাতিমান হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ঢাকার হরিচরণ আচার্যের শিষ্য রমেশচন্দ্র আচার্যের (১৯০৭-১৯৭৪) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নোয়াখালীর প্রবীণ কবিয়ালদের মধ্যে যাঁরা বিশ শতকের প্রথমার্ধে কবিগান করেছেন তাঁদের মধ্যে অক্ষয় আচার্য, অন্নদাচরণ নট্ট, অম্বিকা লোধ, কালীকুমার দে, কাশীনাথ নট্ট, গুরুচরণ রক্ষিত, গোপাল নট্ট, চন্দ্রকান্ত আচার্য, জ্যোতিন্দ্র গণ, তারক পণ্ডিত, তারিণীচরণ নট্ট, ধর্মনারায়ণ রক্ষিত, নগেন্দ্রনাথ নট্ট, নরহরি সরকার, বঙ্গচন্দ্র নট্ট, বসন্ত লোধ, বিপিন সরকার, ভগবতী ভুঁইয়া, মহেন্দ্রনাথ মজুমদার, যোগেন্দ্রচন্দ্র নট্ট, রমেশচন্দ্র আচার্য, সুবল নট্ট, সুরথ সরকার প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে ভগবতী ভুঁইয়া শুধু বাঁধনদার ছিলেন, তবে হরকুমার শীল প্রমুখ কবিয়াল তাঁর রচিত গান দিয়ে হরিচরণ আচার্যের বিপক্ষে কবির লড়াই করেছেন।

নোয়াখালী জেলায় কবিয়ালদের এই ব্যাপক সংখ্যা প্রমাণ করে, বিশ শতকের প্রথমার্ধে নোয়াখালীতে কবিগান খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তবে বিভিন্ন উদাহরণ থেকে মনে হয়, এই গানের বিষয় ও আঙ্গিক ঢাকা অঞ্চলের গানের বিষয় ও আঙ্গিকের অনুরূপ ছিল।[৫১]

---

৫০. স্বরোচিষ সরকার, "কবিগান : অতীত ও বর্তমান", *সাহিত্য পত্রিকা*, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ১৮৯

৫১. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ১৪৭

চট্টগ্রাম অঞ্চল

বিশ শতকের একেবারে সূচনায় চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবিগান কুমিল্লা-নোয়াখালী অঞ্চল থেকে আলাদা ছিল বলে মনে হয় না। উনিশ শতকের শেষদিকে এখানে কবিয়াল হিসেবে মোহনবাঁশী সরকার ও চিন্তাহরণ সরকার বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। এই দুজনের কবিগান শুনে রমেশ শীল কবিগানের প্রতি আকৃষ্ট হন।

রমেশ শীলের জন্ম ১৮৭৭ সালের ১১ মে চট্টগ্রামের বোয়ালখালী থানার গোমচণ্ডী গ্রামে।[৫২] তিনি ছিলেন চট্টগ্রাম অঞ্চলের সেরা কবিয়াল। কবিগানকে তিনি ভিন্ন মাত্রা দান করেছিলেন। বিশ শতকের শেষার্ধে কবিগান বলতে যে পাঁচালিনির্ভর এবং কবিয়াল-কেন্দ্রিক এক ধরনের বিতর্কমূলক গান বোঝায়, শতাব্দীর প্রথমার্ধে রমেশ শীলই তার অন্যতম সূচনাকারী।

প্রথমজীবনে রমেশ শীল সনাতন পদ্ধতির কবিগান গাইতেন। অভিন্ন কারণে তাঁকে বিভিন্ন ধরনের মালশি ও সখীসংবাদ রচনা করতে হত। বৌদ্ধ অঞ্চলের শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করার লক্ষ্যে একবার তাঁকে গৌতম বুদ্ধের মালশি লিখতে হয়েছিল বলেও জানা যায়। কিন্তু উনিশশো তিরিশের দশকের শেষদিকে চট্টগ্রামের দুই কমিউনিস্ট নেতা পূর্ণেন্দু দস্তিদার ও বঙ্কিম সেনের সংস্পর্শে এসে রমেশ শীল নতুন মানুষ হয়ে যান।[৫৩] কমিউনিস্টরা রমেশ শীলকে সাম্যবাদ এবং শোষণহীন সমাজব্যবস্থার কথা বোঝাতে সক্ষম হন। রমেশ শীলও তাতে আন্তরিক ঐক্য পোষণ করেন। এরপর থেকে তিনি যেসব গান রচনা করেন, তার সবগুলোতেই সাম্যবাদী চেতনার প্রতিফলন ঘটে।

রমেশ শীলের কবিগানের বিষয়বস্তুতে ও প্রকরণে যে বহুমাত্রিক পরিবর্তন ঘটে, তার পেছনে তাঁর এই আদর্শিক পরিবর্তন বিশেষ সক্রিয় ছিল, তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। যেমন সনাতনি কবিগানের ডাকগান ও মালশি গান ছিল আবশ্যিক। সেখানে তিনি দেশবন্দনার গান নিয়ে আসেন। সখীসংবাদ, ভোর, গোষ্ঠ, লহর কবি ইত্যাদিকে বর্জন করেন। বন্দনা গানের পরপরই চলে আসেন পাঁচালিতে। সাধারণত কবিগানের পাঁচালি অংশ টপ্পা গান দিয়ে সূচিত হয়, রমেশ শীল সে টপ্পাকেও বর্জন করন। তাঁর পাঁচালিতে গতানুগতিক পৌরাণিক চরিত্র স্থান পায় না। এমনকি ব্যক্তিচরিত্র থেকেও তাঁর পাঁচালি সরে যেতে থাকে। সেখানে স্থান পায় শ্রেণি অথবা শ্রেণিচরিত্র। যেমন– চাষি-মজুতদার, শ্রমিক-মালিক, কৃষক-জোতদার, ধনী-গরিব, স্বৈরাচার-সমাজতন্ত্রী ইত্যাদি। কবিগানের অংশসমূহের গতানুগতিক পারিভাষিক নামেরও তিনি বদল ঘটান। যেমন ডাক-মালশিকে তিনি বলেন স্বদেশ বন্দনা বা সভা বন্দনা। টপ্পাকে বলেন জেরা। পাঁচালি-ধুয়া ইত্যাদিকে বলেন রং-পাঁচালি এবং জোটের পাল্লাকে বলেন জোটক।[৫৪]

সঙ্গত কারণেই রমেশ শীলের কবিগানে দোহারদের ভূমিকাও হ্রাস পায়। পাঁচালির মধ্যে ধুয়া হিসেবে যেসব গান পরিবেশন করা হত তিনি তার বদলে গণসংগীত পরিবেশন করতে শুরু করেন এবং সেই গানের সুরে সুরে ছড়া কাটেন। অর্থাৎ দক্ষিণাঞ্চলের কবিগানে ধুয়া গানের যে ভূমিকা, চট্টগ্রাম অঞ্চলে রমেশ শীল গণসংগীতকে দিয়ে সেই ভূমিকা পালন করান। গণসংগীতের সুরে তিনি ছড়া কাটেন, বিতর্ক করেন, সাম্যবাদী আদর্শ প্রচার করেন। পরিশিষ্টের ধুয়া গান অংশে তাঁর একাধিক গণসংগীত সংকলিত হয়েছে।[৫৫]

কবিগানের প্রকরণ ও বিষয়বস্তুতে এমন পরিবর্তন ঘটানোর ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে কবিগান পরিবেশন করা সম্ভব হয়। পূর্বে যেখানে একপালা কবিগান পরিবেশন করতে কমপক্ষে বারো ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন হত, সেখানে রমেশ শীল রীতির কবিগান পরিবেশন করতে দুই ঘণ্টাই যথেষ্ট ছিল।

---

৫২. যতীন সরকার, *বাংলাদেশের কবিগান*, পৃষ্ঠা ১০৪

৫৩. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, *রমেশ শীল* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি ১৯৮৭), পৃষ্ঠা ২৭

৫৪. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, *রমেশ শীল* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি ১৯৮৭), পৃষ্ঠা ১৪৯

৫৫. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ১৪৯

তার ফলে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সভায় অথবা বামপন্থী জনসভার পূর্বে এই ধরনের কবিগানের আয়োজন করে শ্রোতার সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। সঙ্গত কারণে সমকালের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ রমেশ শীলের পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে আসেন এবং বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে তাঁর কবিগানের ব্যবস্থা করেন। রমেশ শীল এভাবে ঢাকা-কোলকাতাসহ বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ শহর ও বন্দরে কবিগান পরিবেশনের সুযোগ পান। একই সঙ্গে বাংলাদেশের বামপন্থী ও প্রগতিশীল কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে তাঁর সখ্য গড়ে ওঠে। সঙ্গী হিসেবে তিনি যেন তাঁর অন্যতম শিষ্য ফণী বড়ুয়াকে পান, তেমনি পশ্চিমবঙ্গে পান শেখ গুমানী দেওয়ান ও লম্বোদর চক্রবর্তীকে। এঁরা সকলেই বামপন্থী আদর্শে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং কবিগানের মাধ্যমে তা প্রচারের বিষয়টিকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

রমেশ শীল তাঁর পূর্বসূরি কবিয়ালদের সঙ্গে যেমন কবিগান পরিবেশন করেছেন, তেমনি তিনি তাঁর সমকালীন ও শিষ্য ও শিষ্যতুল্য ব্যক্তিদের সঙ্গেও কবিগান পরিবেশন করেছে। এঁদের নামের সারি অত্যন্ত দীর্ঘ। এঁদের মধ্য থেকে বিশেষ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যথা– করিম বখশ, সুবল ভট্ট, শেখ গুমানী দেওয়ান, লম্বোদর চক্রবর্তী, রাইগোপাল দাস, হেদায়েতুল ইসলাম, মনীন্দ্র দাস, নগেন্দ্রচন্দ্র দে, সারদা বড়ুয়া, তরণীসেন দেয়ারী, প্রাণকৃষ্ণ কৈবর্ত, বরদা সরকার, চন্দ্রমণি সরকার, অমিয় সরকার, বিপিন ঠাকুর প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনেক কবি বার্মার (বর্তমান নাম মিয়ানমার) রেঙ্গুন (বর্তমান নাম ইয়াঙ্গুন) শহরে কবিগান করতেন। বিশ শতকের প্রথমদিকে রেঙ্গুন শহরে বহু বাঙালির বসবাস ছিল। সেখানে বেশ কয়েকটি বাঙালিপাড়াও গড়ে ওঠে। বিশেষভাবে চট্টগ্রাম অঞ্চলের বহু লোক জীবিকার সন্ধানে রেঙ্গুনে চলে যেতেন এবং একনাগাড়ে দীর্ঘদিন সেখানে বাস করতেন। এই প্রবাসী বাঙালিদের বিনোদন মাধ্যম হিসেবে কবিগান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তখন এখানে যাঁরা কবিগান পরিবেশন করতেন, তাঁদের মধ্যে এজাহার মিয়া, নিবারণ শীল, মতিলাল বড়ুয়া, শেখ মোহাম্মদ প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে সেখানে একাধিক মুসলমান কবিয়ালের উপস্থিতি থেকে অনুমান করা যায়, হয়তো পাঁচালি অংশই তাঁদের কবিগানের প্রধান হয়ে উঠেছিল। এখানকার কবিগান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ লিখেছেন :

> "বাঙালি কলোনিতে তখন পাঁচ-ছ হাজার বাঙালির বাস। মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ সব ধর্মের মানুষই ছিল। সন্ধ্যায় পর প্রায় সবারই অবসর। নানা বিনোদনের মধ্যে কবিগানও হতো মাঝে মাঝে। রেঙ্গুনের বাঙালি কবিয়ালদের মধ্যে খ্যাতি ছিল করুলডাঙার আমুচিয়ার মতিলাল বড়ুয়ার। তাঁর সঙ্গে পাল্টা দিতেন শেখ মোহাম্মদ, এজাহার মিঞা অথবা নিবারণ শীল। স্থানীয় বাঙালিরা চাঁদা তুলে রেঙ্গুনের কান্দু বস্তিতে কবিগানের আসর বসাতেন। বছরে বেশ কবার গানের ব্যবস্থা হত।"[৫৬]

পূর্ববঙ্গ পর্বে কবিগানের সূচনা হয়েছিল মোটামুটি উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। কোলকাতা থেকে তখন কবিগান একযোগে পল্লিবঙ্গের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। পূর্ববঙ্গের মতো পশ্চিমবঙ্গের পল্লিতেও তা ছড়ায়। কিন্তু কবিগানের নতুন পর্ব শুরু হয় শুধু পূর্ববঙ্গেই। পূর্ববঙ্গে কবিগানের ব্যাপক চর্চা হওয়ায় বিভিন্ন অঞ্চলে নানা ধরনের বৈচিত্র্য নিয়ে কবিগান টিকে থাকে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় একশো বছর সে কবিগান কী অবস্থায় ছিল তা উপরের আলোচনায় কিছুটা হলেও ফুটে উঠেছে।

আলোচনায় দেখা যায়, যশোর থেকে একটি ধারা খুলনা, ফরিদপুর ও বরিশাল অঞ্চলে বিস্তৃত হয়েছে। এই ধারার সবচেয়ে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব তারকচন্দ্র সরকার। তবে তারকচন্দ্রের সমান্তরালে আরো একাধিক ধারা এই বিস্তৃতিতে সহায়ক হয়েছিল। যেমন বাগেরহাটের মথুর দেব সরকারের ধারা অথবা নড়াইলের পাঁচু দত্ত সরকারের ধারা। এইসব ধারার সঙ্গে কোলকাতার দূরত্ব কম ছিল। এর মধ্যে পাঁচু

---

৫৬. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, "ভূমিকা", *কবিয়াল ফণী বড়ুয়া : জীবন ও রচনা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭), পৃষ্ঠা ৪

দত্তের গুরু গোবিন্দ তাঁতি ছিলেন চব্বিশ পরগনার লোক এবং তাঁর গুরু ছিলেন কোলকাতার অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি। তারকন্দ্রের গুরু বা গুরুর খ্যাতি না থাকায় তাঁর কোলকাতার সংযোগটা সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ করা যায় না। তবে তিনিও যে পাঁচু দত্তদের মতো কোলকাতার কবিয়ালের শিষ্য পরম্পরার অংশ, তা অনুমান করা কঠিন নয়।

এ সময়ে ঢাকার ভাওয়াল-বিক্রমপুরে কবিগানের আলাদা একটি ধারা গড়ে উঠতে দেখা যায়। বিত্তবান ভূস্বামী তথা জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই ধারার কবির লড়াই করানোর মাধ্যমে। এই লড়াই দেখে স্থানীয় লোককবিরাও এই শিল্পমাধ্যমের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বৃহত্তর ঢাকায় কবিগানের একটি শক্তিশালী ধারার জন্ম হয়। সেই ধারার সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রতিনিধি ছিলেন হরিচরণ আচার্য, এক পর্যায়ে যিনি পূর্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবিয়াল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৫৭]

কবিগানের ময়মনসিংহ অঞ্চলের ধারাও অনেকটা স্বতন্ত্র। এই অঞ্চলের রাজা-জমিদারগণও উনিশ শতকের সূচনায় কোলকাতা থেকে কবিয়াল এনে কবিগানের ব্যবস্থা করেছিলেন বলে মনে হয়। সেসব গান শুনে স্থানীয় শিল্পীদের মধ্যে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি হয়, যার ফলে সেখানে রামগতি শীল, রামু মালীদের মতো প্রতিভাবান কবিয়ালের আবির্ভাব ঘটে।

ত্রিপুরা ও নোয়াখালী অঞ্চলের কবিয়ালদের উদ্ভবের পেছনেও ঢাকা-ময়মনসিংহের প্রক্রিয়া কার্যকর ছিল বলে মনে করা যেতে পরে। উনিশ-বিশ শতকে এই অঞ্চলে কবিয়ালের সংখ্যা দেখে মনে হয়, বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো এখানেও ব্যাপকভাবে কবিগানের চর্চা হত। এমনকি বিশ শতকের প্রথমদিকে এই অঞ্চলে অন্যান্য অঞ্চলে কবিয়ালদের বায়না হতে দেখে মনে হয়, কুমিল্লা-নোয়াখালী অঞ্চলে কবিগান বিকাশের জন্য অত্যন্ত অনুকূল পরিবেশ বজায় ছিল।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে কবিগানের সূচনাও কোলকাতা-প্রভাবিত হওয়াটা স্বাভাবিক। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে দেখা যায় কুমিল্লা-নোয়াখালী অঞ্চল থেকে কবিয়ালগণ চট্টগ্রামে গিয়ে কবিগান করছেন। পরে অবশ্য চট্টগ্রামেরও কবিয়ালের উদ্ভব হতে থাকে। উনিশ শতকের শেষদিকে কবিয়াল রমেশ শীলের আবির্ভাব কবিগানের চট্টগ্রামের ধারাকে নতুন একটি মাত্রা দান করে। বিশ শতকের সূচনা নাগাদ কবিগানকে তিনি এমনভাবে পরিবেশন করতে শুরু করেন, যা আঠারো-উনিশ শতকের কবিগান থেকে অনেকটা আলাদা হয়ে ওঠে।

কবিগানের যে হ্রস্বতা, তা সৃষ্টির পেছনে রমেশ শীলের অবদান নিঃসন্দেহে সর্বাধিক। তবে একই সঙ্গে স্বীকার্য যে, রমেশ শীলের সমকালেও চট্টগ্রামে দু-এক পালা সনাতন পদ্ধতির কবিগান হয়েছে, এছাড়া পাকিস্তান সৃষ্টির পর এক ধরনের ইসলামি কবিগানও চট্টগ্রাম অঞ্চলে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। রমেশ শীল চেয়েছিলেন কবিগানের মাধ্যমে সমাজের পরিবর্তন। এজন্য তিনি ধুয়া গান ও পাঁচালি-ভিত্তিক কবিগানকে আদর্শ মনে করেছিলেন। এমনকি ঐ অঞ্চলের সব কবিয়াল যাতে অভিন্ন আদর্শের প্রতি নিবিষ্ট থাকে, সেজন্য ১৯৪৩ সালে কবিয়ালদের নিয়ে একটি সমিতিও গঠন করেছিলেন। সেই কমিটির সভাপতি ছিলেন তিনি, সহসভাপতি ছিলেন হেদায়েত ইসলাম খান, সম্পাদক ছিলেন ফণী বড়ুয়া, সহ-সম্পাদক ছিলেন গোবিন্দচন্দ্র দে, সদস্য ছিলেন তারাচরণ দাস, সারদাচরণ বড়ুয়া, রাইগোপাল দাস, বরদাচরণ যে এবং শৈলেন সেন। যতটা জানা যায়, কবিয়ালদের নিয়ে কোনো সমিতি এই প্রথম।[৫৮]

রমেশ শীল নিজে তাঁর শিষ্য ফণী বড়ুয়াকে নিয়ে বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলে কবিগান পরিবেশন করেন। পশ্চিমবঙ্গে গিয়েও সেখানকার কবিগানে পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হন। বাংলাদেশের কবিগানে মুসলমান কবিয়ালের সংখ্যাবৃদ্ধির পেছনে তাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি। বিশ শতকের শেষার্ধে চট্টগ্রাম

---

৫৭. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ১৫১

৫৮. যতীন সরকার, *বাংলাদেশের কবিগান*, পৃষ্ঠা ১০৭ ও মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮), পৃষ্ঠা ৪২

অঞ্চলে যাঁরা কবিগান করেন, তাঁদের ধর্মপরিচয় বিবেচনা করে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বিশ শতকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে কবিগান করেছেন, রমেশ শীলকে ধরে নিয়ে তাঁদের সংখ্যা প্রায় দেড় শত। এর মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ কবিয়াল মুসলমান। বৃহত্তর জেলার হিসেবে এক-শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশের অন্য যে কোনো অঞ্চলের তুলনায় চট্টগ্রামের এই কবিয়াল-সংখ্যাও যেমন অস্বাভাবিক বেশি, মুসলমান কবিয়ালের হারও অস্বাভাবিক হারে বেশি। রমেশ শীল কবিগানকে ধর্মনিরপেক্ষ করে তুলতে পেরেছিলেন বলে এমন বৃদ্ধি হয়তো সম্ভব। তবে চট্টগ্রাম অঞ্চলে এমন বিপুলসংখ্যক কবিয়ালের আবির্ভাব থেকে মনে হয়, ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে ওঠার ফলে কবিগান অনেকটা সহজ হওয়ায় এই সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। এছাড়া বিশ শতকের শেষার্ধের চট্টগ্রামে দাঁড়াকবির মতো কবিগানের লিখিত পালা মুখস্থ করে কবিগান করার মতো বহু শখের দলের জন্ম হয়, এঁরাও কবিয়ালের সংখ্যা এভাবে বৃদ্ধি করতে পারেন। বস্তুত তেমন চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৭ সালে চট্টগ্রাম থেকে নিজস্ব উদ্যোগে কবিয়াল ইয়াকুব আলী 'কবিগান' নাম দিয়ে এক ধরনের কবিগানের পালা প্রকাশ করেছিলেন, যা মুখস্থ করে যথারীতি কবিগান পরিবেশন করা সম্ভব ছিল।[৫৯] পাকিস্তান সৃষ্টির পর রেডিও পাকিস্তানের চট্টগ্রাম কেন্দ্রের নিয়মিতভাবে কবিগানের আসর হত। নতুন কবিয়াল সৃষ্টি করার কাজে এই অনুষ্ঠানের ভূমিকা থাকাও স্বাভাবিক।

প্রসঙ্গত চট্টগ্রাম অঞ্চলে কবিগানের বিষয়বস্তুর দিকেও দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। সাতচল্লিশের পূর্বে রমেশ শীল এবং তাঁর সহযোগীগণ সেখানে বামপন্থী আদর্শ প্রচারকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। সাতচল্লিশ সালের পর সেই আদর্শ প্রচার একরকম নিষিদ্ধ হয়ে যায়। রমেশ শীলকেও তখন এমন গান গাইতে বাধ্য করা হয়, যা তাঁর পূর্ববর্তী আদর্শের বিপক্ষে যায়। তাঁর অনেক সহযোগী বামপন্থাকে সমালোচনা করেও গান গাইতে শুরু করেন। বিশেষভাবে এ সময়ে যে সকল কবিয়াল রেডিওতে কবিগান করতেন, তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল রমেশ শীলদের মতো প্রচারণামূলক; তবে আদর্শিক দিক দিয়ে তা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন কোটির। যেমন তখন রেডিও পাকিস্তানের চট্টগ্রাম থেকে নিয়মিত প্রচারিত কবিগানের বিষয়বস্তু ছিল : পাকিস্তান রাষ্ট্র ও সরকারের গুণগান, সরকারি কর্মসূচির প্রচারণা, ইসলামের গুণকীর্তন, ভারতবিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতা। কবিয়াল ইয়াকুব আলীর প্রকাশিত 'কবিগান' গ্রন্থটিতে এই আদর্শের বেশ কয়েকটি কবির পালা সংকলিত হয়। বেশ কয়েকজন কবিয়াল তখন ইয়াকুব আলীর অনুসারী ও সহযোগী ছিলেন, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁরা এসব কবির পালা পরিবেশন করতেন।[৬০] তাঁর রচিত কবিগানের একটি নমুনা উদ্ধৃত করা হল। তাঁর 'পরিবার পরিকল্পনার পক্ষে ও বিপক্ষে' শীর্ষক জোটকটি নিম্নরূপ :

"ধুয়া বন্ধু শুন মূল বিষয়।
পরিবার পরিকল্পনা কেন করা হয়।
পক্ষে যেইভাবে জ্যামিতিক হারে মানুষ বাড়ে দেশে।
এমনটি বাড়তে থাকলে উপাস মরবে শেষে।
ঘন ঘন সন্তান হলে দুর্বল হয় প্রসূতি
(শিশুর) খাদ্য, শিক্ষা, বাসস্থান সব দিকে দুর্গতি।
(তাই) হুষের মানুষ চিন্তা করেন থাকিতে সময়
কোনো ভালো কাজ পরিকল্পনা বিনে নাহি হয় ॥
বন্ধু শুন মূল বিষয় ॥
বিপক্ষে আচ্ছা দাদা একটা কথা লাক মুখে শুনি
গুনা হবে বলে লোকে করে কানাকানি।
সত্য কিংবা মিথ্যা তাহা দিবেন পরিচয়

৫৯. ইয়াকুব আলী, *কবিগান* (চট্টগ্রাম : গ্রন্থকার, ১৯৬৭)

৬০. এস.এম.নূর-উল-আলম, *চট্টগ্রামের কবিয়াল ও কবিগান* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৩), পৃষ্ঠা ৯৯

তোমার কথা মানব কেন গুনা যদি হয় ॥
বন্ধু শুন মূল বিষয় ॥
পক্ষে শুনরে ভাই গুনার কথা তাহাদের নাই জানা,
ভ্রূণ হত্যা করলে জানি ধর্মমতে গুনা।
গর্ভধারণ করার আগে যদি বোধ করে
গর্ভপাত না ঘটালে দোষ হইতে নারে।
শরীয়তের আলেমগণও এমন কথা কয়,
সময়মত জন্ম নিরোধ করা ভাল হয় ॥
বিপক্ষে এইবার তব আর এক প্রশ্ন করি উত্থাপন,
বন্ধু শুন মূল বিষয়।
পরিবার পরিকল্পনা কেন করা হয় ॥"[৬১]

চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবিগান অন্তত তিন ভাগে বিভক্ত ছিল : প্রথমত সনাতনি পদ্ধতির কবিগান, দ্বিতীয়ত রমেশ শীলের বামপন্থী আদর্শের কবিগান, এবং তৃতীয়ত পাকিস্তান সৃষ্টির পর দ্বিজাতিতাত্ত্বিক আদর্শের কবিগান। এই তিন আদর্শের মধ্যে শেষ পর্যন্ত রমেশ শীল-পন্থীরাই জয়ী হন। বিশ শতকের শেষার্ধে চট্টগ্রামে কবিয়ালগণের সংখ্যা খুব বেশি নয়, এবং তাঁদের প্রায় সকলেই রমেশ শীলপন্থী, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। এমন কয়েকজন কবিয়াল সম্পর্কে দু-চার কথা বলা যেতে পারে।

প্রথমেই নাম করতে হয় ফণী বড়ুয়ার (১৯১৫-২০০১)। বিজয়কৃষ্ণ সরকারের মতো পূর্ববঙ্গ পর্বেই তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন রমেশ শীলের শিষ্য এবং দীর্ঘদিন তিনি রমেশ শীলের বিপরীতে জোট বেঁধে কবিগান করেছেন। ফলে রমেশ শীলের নামের সঙ্গে তাঁর নামটি প্রায় সমান গুরুত্বের সঙ্গে উচ্চারিত হয়। বিশ শতকের শেষার্ধে তিনি শুধু চট্টগ্রাম অঞ্চলেই কবিগান করেননি, ঢাকা শহরের প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোতে বহুবার কবিগান পরিবেশন করেছেন। এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল, বাংলা একাডেমি, শিল্পকলা একাডেমি প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৬২]

কবিয়াল ফণী বড়ুয়ার কবিগানের প্রকৃতি বোঝার জন্য তাঁর রচিত ধুয়া গান যথেষ্ট। যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময়ে রমেশ শীল, ফণী বড়ুয়া, রাইগোপাল দাস প্রমুখের নামে হুলিয়া জারি হলে কিছুকালের জন্য তিনি পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রযোজনার 'ধনতন্ত্র-সমাজতন্ত্র' শীর্ষক প্রামাণ্যচিত্রে কবিয়ালের ভূমিকায় অভিনয় করেন, সেই গানে বিপক্ষে ছিলেন রাইগোপাল দাস। চিত্রটির পরিচালক ছিলেন শান্তি চৌধুরী।

চট্টগ্রামের কবিয়ালদের মধ্যে কবিয়াল ইয়াকুব আলী, বিভূতিরঞ্জন নাথ, রাখাল মালাকার, রাখাল দাশ, মানিক শীল প্রমুখ কবিয়াল রমেশ শীল ও ফণী বড়ুয়ার সার্থক উত্তরসূরি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। এঁদের মধ্যে বিভূতিরঞ্জন নাথ ১৯৬৩ সালে থেকে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের নিয়মিত কবিয়াল ছিলেন। কাছাকাছি সময়ে কবিয়াল ইয়াকুব আলী, রাখাল মালাকার ও রাখাল দাশ চট্টগ্রাম এবং ঢাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কবিগান পরিবেশন করেছেন। নবীন কবিয়ালদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান মানিক শীল। তাঁর স্ত্রী খুকী রাণী শীলও একজন বিখ্যাত কবিয়াল। বিশ শতকের শেষ কয়েক দশকে মানিক শীল চট্টগ্রাম ও ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে কবিগানের আমন্ত্রণ পান। ঢাকার আমন্ত্রণগুলোর মধ্যে ১৯৮৯ সাল টিএসসিতে, ১৯৯০ সালে মহিলা সমিতি মিলনায়তনে, ১৯৯২ সালে গণ সাহায্য সংস্থার অনুষ্ঠানে, ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনে ও শিল্পকলা একাডেমিতে, এবং ১৯৯৫ সালে ঢাকা বইমেলার কবিগান উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে ১৯৮৯ সালে বাংলা একাডেমির আমন্ত্রণে মানিক শীল ফণী বড়ুয়ার বিপক্ষে 'যুদ্ধ ও শান্তি' শীর্ষক কবিগান করেছিলেন।

---

৬১. ইয়াকুব আলী, *কবিগান* (চট্টগ্রাম : গ্রন্থকার, ১৯৬৭), পৃষ্ঠা ৭১-৭৪

৬২. এস.এম.নূর-উল-আলম, *চট্টগ্রামের কবিয়াল ও কবিগান*, পৃষ্ঠা ৯

চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবিগানের একটি বড় বৈশিষ্ট্য এখানে উভয় পক্ষের কবিয়াল বিশেষ কোনো ব্যক্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন না। তাঁরা দুটি বিষয় অবলম্বন করে বিতর্ক করেন। বিশ শতকের শেষার্ধে এমন কয়েকটি জনপ্রিয় বিতর্কের বিষয় হল : সত্য ও কলি, অতীত ও বর্তমান, ধর্ম ও বিজ্ঞান, নারী ও পুরুষ, একাল ও সেকাল, ধন ও বিদ্যা, ধনী ও গরিব, স্বর্গ ও নরক, আসমান ও জমিন, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র, সমাজবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ, গণসংস্কৃতি ও বুর্জোয়া সংস্কৃতি, যুদ্ধ ও শান্তি, কৃষক ও জোতদার, মহাজন ও খাতক ইত্যাদি। আবার চট্টগ্রাম অঞ্চলের যেসব কবিগান একচেটিয়াভাবে প্রচারণামূলক, তেমন কবিগানের বিষয়ের মধ্যে স্বরাজ আন্দোলন, গহণ আন্দোলন, সর্বধর্ম সমন্বয়বাদ, ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম, শিক্ষা, শান্তি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, নারীনির্যাতন, ক্ষুধা, ব্যাধি, দারিদ্র্য, খরা, বন্যা, মারী, শোষণ, হনন, মারণ, কাড়ন, সন্ত্রাস দমন, চরিত্র গঠন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[৬৩]

বিশ শতকের প্রথমার্ধে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে মহাসমারোহের সঙ্গে কবিগান অনুষ্ঠিত হলেও একই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের কবিগান অনুষ্ঠানের কোনো খবর পাওয়া যায় না। কিন্তু বিশ শতকের মাঝামাঝি ভারতের স্বাধীনতার সূত্রে বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় কবিগানের শ্রোতাদের একটি বড় অংশ পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি জমান। এর ফলে কবিগানেরও খানিকটা অংশ পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসী হয়। আবার পূর্ববঙ্গে যে কবিগান থেকে যায়, তার শরীরেও নানামুখী পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের হাওয়া লাগে। ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ বাঙালি সংস্কৃতির ওপরে গভীর প্রভাব ফেলে। কবিগানের ওপরেও সে প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়। দেশভাগ হয়ে যাওয়ায় পূর্ববঙ্গ তথা নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিত্তবান হিন্দু শ্রেণি ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ও ত্রিপুরায় অভিবাসী হন। কিন্তু নিম্নবিত্তের সাধারণ হিন্দুদের অনেকে দেশত্যাগ করার ঝুঁকি নিতে পারেন না, ফলে বাধ্য হয়ে তাঁদের পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যেতে হয়। অর্থবিত্তে দুর্বল হলেও এই শ্রেণির মধ্য থেকে কবিগানের নতুন পৃষ্ঠপোষক শ্রেণির জন্ম হতে থাকে। অন্যদিকে কবিগানের পৃষ্ঠপোষক বিত্তবান যে শ্রেণিটি পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রধানত (ভারতের) পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসিত হন, সেখানেও তাঁরা কবিগান শোনার আগ্রহ জিইয়ে রাখেন। ফলে সাতচল্লিশোত্তর পশ্চিমবঙ্গে পূর্ববঙ্গীয় কবিগানের চাহিদা সৃষ্টি হয়। এই নতুন পটভূমিতে অনেক কবিয়াল পূর্ব পাকিস্তানে থেকে গিয়ে কবিগান পরিবেশন করতে থাকেন, আবার অনেক কবিয়াল ভারতে অভিবাসী হন। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে এবং উভয় দেশে তাঁদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক কবিয়ালকে তখন কিছুদিন পূর্ব পাকিস্তানে এবং কিছুদিন পশ্চিমবঙ্গে কবিগান পরিবেশন করতে হয়েছে। এমন দোলাচলের মধ্যে রাজেন্দ্রনাথ সরকারের মতো কবিয়াল শেষপর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যান, আবার নকুলেশ্বর দত্তের মতো কবিয়াল পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী হন।

পূর্ববঙ্গের 'পূর্ব পাকিস্তান' পরিচয় অবশ্য খুব বেশিদিন টেকেনি। উনিশশো একাত্তর সালে মাত্র তেইশ বছরের মাথায় তা 'বাংলাদেশ' পরিচয় ধারণ করে। বর্তমান আলোচনায় তাই পূর্ব পাকিস্তানসহ বর্তমান বাংলাদেশকে এককথায় বাংলাদেশ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে। কবিগানের এই সময়ে বলতে বোঝাবে সাতচল্লিশ-উত্তর বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের কবিগান। এই সময়ে উভয় অঞ্চলের কবিগানের গঠন, বিষয় ও প্রকরণ, কবিগানের সময়, আকার, এই সময়ের প্রতিনিধিত্বশীল কবিয়াল, পরিবেশন-কৌশলে বিশেষ কোনো লক্ষণ এসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে।

কবিগানের গঠন

বিশ শতকের মাঝামাঝি যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতি ঘটনায় এবং সাতচল্লিশের দেশভাগের কারণে মানুষের জঙ্গমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এক অঞ্চলের সংস্কৃতি খুব সহজে অন্য অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ

৬৩. এস.এম.নূর-উল-আলম, *চট্টগ্রামের কবিয়াল ও কবিগান*, পৃষ্ঠা ৯

করে। এ সময়ে একটি উপসর্গ বিশেষভাবে দেখা দেয়, তা হল মানুষের কর্মব্যস্ততা। দীর্ঘ বারো ঘণ্টা বসে কোনো গান উপভোগ করার মতো সময় তখন অধিকাংশ লোকের থাকে না। এসব বাস্তবতায় যশোর-খুলনা অঞ্চলের রাজেন্দ্রনাথ সরকার-বিজয়কৃষ্ণ সরকাররা যেমন অল্প সময়ে মধ্যে কবিগান করার চেষ্টা করতে থাকেন, ঠিক একই সময়ে কমিউনিস্ট আদর্শ প্রচারের স্বার্থে চট্টগ্রাম অঞ্চলে রমেশ শীল-ফণী বড়ুয়াকেও অল্প সময়ে মধ্যে কবিগান পরিবেশনের চেষ্টা করতে দেখা যায়। ১৯৩২ সালের দিকে প্রথমোক্তদের অল্প সময়ের মধ্যে কবিগান করার তাগাদা দিয়েছিলেন জসীমউদ্‌দীন। নিকটবর্তী সময়ে অভিন্ন গঠনের কবিগানের জন্ম হয় কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে চট্টগ্রামের রমেশ শীলকে কেন্দ্র করে। সাধারণ মানুষকে বামপন্থী আদর্শ সম্পর্কে সচেতন করতে সমকালীন কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ কবিগানকে অন্যতম মাধ্যম হিসেবে নির্বাচিত করেন। অভিন্ন লক্ষ্যে ১৯৩৭ সালের দিকে বঙ্কিম সেন ও পূর্ণেন্দু দস্তিদার রমেশ শীলের সঙ্গে দেখা করেন এবং বামপন্থী গান গাইতে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেন। এই ধরনের গান সাধারণত বিশেষ কোনো সভা-সমাবেশের সূচনায় অথবা শেষে পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হত। তাই অন্তত দুটি কারণে কবিগানকে সংক্ষিপ্ত না হয়ে উপায় ছিল না। প্রথমত ধর্মীয় অনুষঙ্গের ডাক-মালশি-সখীসংবাদ বামপন্থী আদর্শের সঙ্গে খাপ খায় না; এবং দ্বিতীয়ত এইসব অনুষ্ঠানে কবিগানের জন্য বেশি সময় বরাদ্দ করাও কঠিন হয়। এর ফলে রমেশ শীলকে ডাক-মালশি-সখীসংবাদ বর্জিত কবিগান পরিবেশন করতে হয়। এ কাজে তিনি ফণী বড়ুয়ার মতো যোগ্য প্রতিপক্ষ তথা সহযোগীও পেয়েছিলেন। এভাবে উনিশশো ত্রিশের দশক থেকে এক ধরনের সংক্ষিপ্ত কবিগান কোলকাতা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত চালু হয়ে যায়।

সাতচল্লিশের দেশভাগের পরেও পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুপ্রধান গ্রামগুলোতে ধর্মীয় কারণে ডাক, মালশি, সখীসংবাদ প্রভৃতি গান অব্যাহত থাকে। বয়স্ক শ্রোতাদের চাহিদাও হয়তো এর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল কিন্তু কবিগানের যেসব আসর শহরে ব্যস্ত অঞ্চলে হয়, সেসব ক্ষেত্রে কবিগান পাঁচালি-কেন্দ্রিক হয়ে যায়। অনেক জায়গায় ডাক গানটা থাকে, জোটের পাল্লাও থাকে, মাঝখানের অনেকগুলো অংশ, যেমন মালশি, সখীসংবাদ, ভোর, গোষ্ঠ, মাথুর, লহর কবি, মালফুকার প্রভৃতি লুপ্ত হয়ে যায়। সূচনা-সংগীত হিসেবে গ্রামাঞ্চলের সর্বত্র ডাক গান থাকলেও অধিকাংশ জায়গায় কালীবন্দনা-ভিত্তিক ডাক গানের বদলে অন্যান্য আরাধ্যের বন্দনা যেমন স্থান পায়, কোথাও কোথাও দেশমাতৃকার বন্দনা জাতীয় ধর্মনিরপেক্ষ গানও ডাক গানের জায়গা দখল করে।

বিশের দশকের পঞ্চাশের, ষাটের, সত্তরের, আশির এমনকি নব্বইয়ের দশকের কবিগান এভাবে হয়ে ওঠে কবিগানের এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। এই সংক্ষেপণ কখনো কখনো এত বেশি হয়ে ওঠে যে, তখন বিশ শতকের প্রথমার্ধের কবিগানের তুলনায় বিশ শতকের শেষার্ধের কবিগানকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের গান হিসেবে মনে হয়। এই সংক্ষেপণ অবশ্য গ্রাম ও শহর-ভেদে এমনকি আয়োজকদের বাসনা অনুযায়ী আরো বহুরকম বৈচিত্র্য ধারণ করতে বাধ্য হয়।

পশ্চিমবঙ্গে কবিগান

বিশ শতকের সূচনায় পূর্ববঙ্গে যখন কবিগানের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে, তখন পশ্চিমবঙ্গ থেকে কবিগান বিলুপ্ত হয়। রাজশাহী রংপুর দিনাজপুর প্রভৃতি এলাকা নিয়ে যে উত্তরবঙ্গ অঞ্চল, সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে তা পূর্ববঙ্গের থেকে পশ্চিমবঙ্গের অধিক নিকটবর্তী হওয়ায়, সেখান থেকেও কবিগান উঠে যায়। বিশ শতকের সূচনা থেকে ১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত এই দুই অঞ্চলে কবিগান তাই ছিল না বললেই চলে। কিন্তু ১৯৪৭ সালের পর পূর্ববঙ্গের হিন্দু জনগোষ্ঠীর ব্যাপক হারে পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসন ঘটায় পূর্ববঙ্গের কবিগান পশ্চিমবঙ্গে জনপ্রিয় হতে শুরু করে। এ সময়ে পশ্চিমবঙ্গের কবিগানের এভাবে পূর্ববঙ্গের অভিবাসিত কবিগান প্রাধান্য লাভ করে।

প্রসঙ্গত স্বীকার করা কর্তব্য যে, খ্যাতিমান কবিয়ালের আবির্ভাব না ঘটলেও বিশ শতকের উল্লিখিত সময়ে পশ্চিমবঙ্গেও কবিগানের ক্ষীণ একটি ধারা চালু ছিল। বিশেষভাবে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের বেশ

কয়েকজন কবিয়াল বিশ শতকের সূচনায়ও কবিগান চালু রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গের কবিগানের তুলনায় তা নানা দিক দিয়ে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। তাই ১৯৪৭ সালে পূর্ববঙ্গ পর্বের অসংখ্য কবিয়াল পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে কবিগান করতে শুরু করায় পশ্চিমবঙ্গে এই কবিগানের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়, তখন পূর্ববঙ্গের কবিগান পশ্চিমবঙ্গে নতুনভাবে সমাদৃত হতে থাকে। এভাবে পশ্চিমবঙ্গে কবিগানকে অন্তত দুই ভাগে বিভক্ত করে বর্ণনা করা যায় : গতানুগতিক ধারার পশ্চিমবঙ্গীয় কবিগান, এবং পূর্ববঙ্গীয় কবিগানের পশ্চিমবঙ্গীয় সংস্করণ।[৬৪]

পশ্চিমবঙ্গে কবিগানের বিকাশের ক্ষেত্রে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বিশেষ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা ধরনের সরকারি অনুষ্ঠানে কবিগানের আয়োজনে উভয় ধারার কবিয়ালগণ নিয়মিতভাবে আমন্ত্রণ পান। সরকারের লোকশিল্প পৃষ্ঠপোষণার অংশ হিসেবে বেতার ও টেলিভিশনের তাঁদের নিয়মিত গানের অনুষ্ঠান হয়। এর ফলে কবিয়াল এবং সহশিল্পীদের উপার্জনের পথ প্রশস্ত হয়। অনেকে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেও কবিগান চর্চার সাহায্যে এগিয়ে আসেন। এঁদেরই একজন পুলকেন্দু সিংহ। 'লোকায়ত শিল্পী সংসদ' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন জেলার কবিয়ালদের নানাভাবে সহায়তা করে থাকেন।[৬৫]

পশ্চিমবঙ্গীয় ধারার কবিগান

পশ্চিমবঙ্গীয় কবিগানের ধারায় নতুন প্রাণের সঞ্চার করেন মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার সাগরদিঘি থানার জিনদিঘি গ্রামের শেখ গুমানী দেওয়ান (১৮৯৫-১৯৭৬)। জনার্দন কর্মকার ছিলেন তাঁর কবিগানের গুরু। জনার্দন কর্মকার এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কবিয়ালগণ ঐ অঞ্চলে সনাতনি ধারার কবিগানকে ধারণ করে থাকবেন। প্রথমদিকে শেখ গুমানী দেওয়ান হয়তো সেই প্রাচীন রীতির কবিগান শিখেছিলেন। কিন্তু কবিগানের প্রতি বামপন্থী তাত্ত্বিকদের দৃষ্টি পড়ায় রমেশ শীলের অনুরূপ শেখ গুমানী দেওয়ানকেও তাঁরা নির্বাচন করেছিলেন। চট্টগ্রামের রমেশ শীলের বিপক্ষে শেখ গুমানী দেওয়ানের পরিচয় এবং একজোটে কবিগান পরিবেশিত হওয়ার সূত্র এটাই। রমেশ শীল ঠিক যেভাবে সংক্ষিপ্ত কবিগান পরিবেশন করতেন, শেখ গুমানী দেওয়ানকেও অনুরূপ সংক্ষিপ্ত গান পরিবেশন করতে দেখে এই অনুমান সমর্থিত হয়।

রমেশ শীলের মতো শেখ গুমানী দেওয়ানের গানেও যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, শোষণ, কুশাসন, মুক্তি আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়ের প্রতিফলন ঘটে। পশ্চিমবঙ্গে তিনি জীবন উড়ে, আশুতোষ সাহা, শশিভূষণ মুচি, জীবনকৃষ্ণ উড়ে, কুচিল ডোম, বসন্তকুমার ধানুকি, দেবেন ডোম (দাস), লম্বোদর চক্রবর্তী, কমলাকান্ত মণ্ডল প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করেন। বাংলাদেশের খ্যাতিমান প্রায় সব কবিয়ালের বিপক্ষেও তিনি কবিগান করেছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন রমেশ শীল, রাজেন্দ্রনাথ সরকার, ফণী বড়ুয়া, বিজয় সরকার, নিশিকান্ত সরকার প্রমুখ কবিয়াল।[৬৬] শেখ গুমানী দেওয়ানের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং কণ্ঠ ছিল অসাধারণ। এজন্য সমকালে তিনি বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। সমকালীন পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে গুমানীর ঘনিষ্ঠতা ছিল, এঁদের মধ্যে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুজতবা আলী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, অন্নদাশঙ্কর রায়, শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। কবিগানে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ভারত সরকারের 'পদ্মশ্রী' খেতাব এবং অ্যাকাডেমি পুরস্কার লাভ করেন।

---

৬৪. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ১৮৪

৬৫. পুলকেন্দু সিংহ, "অগ্রচারিণী লোককবি দুলালী চিত্রকর", *বাংলার কবিগান ও লোককবি বিজয় সরকার*, পৃষ্ঠা ১৭৭

৬৬. জঙ্গলরাম হেল্লা, "শেখ গুমানী দেওয়ান : এক অনন্য লোককবি," *বাংলার কবিগান ও লোককবি বিজয় সরকার*, পৃষ্ঠা ১৭২-১৭৩

পূর্ববঙ্গীয় ধারার কবিগান

সাতচল্লিশের দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে প্রচুরসংখ্যক কবিয়াল পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসী হওয়ার ফলে পূর্ববঙ্গের কবিগানের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কবিগানের এক ধনের মিথষ্ক্রিয়া ঘটে। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার কবিগানকে বিভিন্ন সরকারি প্রচারণার মাধ্যম করায় কবিগানের আর এক ধরনের পরিবর্তন লক্ষণীয় হয়। তবে এইসব প্রচারণার কাজে পশ্চিমবঙ্গের কবিয়ালদের চেয়ে পূর্ববঙ্গের কবিয়ালরা কিছুটা এগিয়ে থাকেন। বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গের সুরেন্দ্রনাথ সরকার এবং তাঁর গুরু নকুলেশ্বর দত্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে, আকাশবাণী কোলকাতা ও কোলকাতা দূরদর্শনে কবিগান করার সুযোগ পান। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের মধ্যে পূর্ববঙ্গীয় রীতির কবিগান জনপ্রিয় হতে বহু সময়ের প্রয়োজন হয়। কারণ পূর্ববঙ্গীয় কবিগানের যাঁরা আসল শ্রোতা, সেই পূর্ববঙ্গীয় জনসাধারণ সাতচল্লিশের দেশভাগের পরে ভারতের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে, তাদের আর্থিক দুরবস্থাও চরম আকার ধারণ করে। কবিগানের এই শ্রোতাসংকটের বিষয়টি সুরেন্দ্রনাথ সরকার ত্রিপদী ছন্দের ছড়ায় প্রকাশ করেছিলেন এভাবে :

"আজ যারা বাস্তুহারা একেবারেই সর্বহারা, তাদের অন্নচিন্তা চমৎকারা।
তারা কেহ ঝোপ-জঙ্গলে কেহ-বা তাঁবুর তলে
কেহ পড়ে তালবেতালে আছে আজ নৈনিতালে।
কেহ-বা দুটো অন্নের জন্য রয়েছে দণ্ডকারণ্য
কে দিবে কবির মান্য, তাদের ওষ্ঠাগত প্রাণ।
কেহ-বা বিনা খুনে গিয়েছে আন্দামানে
কারাই বা কবিগানে পেতে রাখবে কান।"[৬৭]

সাতচল্লিশের দেশভাগের সময়ে নকুলেশ্বর দত্ত ছিলেন পূর্ববঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিয়াল। দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে এসে প্রথম কয়েক বছর তাঁকে বেশ বেগ পোহাতে হয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়ে এলে পশ্চিমবঙ্গে তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকেন। তবে পরিস্থিতি কবিগান চর্চার অনুকূল হয় পঞ্চাশের দশকের শেষ নাগাদ। নকুলেশ্বর দত্ত এ সময়ে নারায়ণ বালা, নিশিকান্ত সরকার, অমূল্য সরকার, হরিনাথ সরকার, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সুরেন্দ্রনাথ সরকার, রসিকলাল সরকার প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করতে থাকেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তিনি স্বরূপেন্দু সরকারের বিপক্ষেও কয়েক পালা কবিগান করেন।

পশ্চিমবঙ্গের কবিগানে সবচেয়ে খ্যাতি অর্জন করেন সুরেন্দ্রনাথ সরকার (জ. ১৯২৫)। ১৯৫০-এর দশকের শেষদিকে তিনি 'লোকরঞ্জন কবিপার্টি' নামে একটি কবিগানের দল গঠন করেছিলেন। ১৯৫৯ সালে এই দল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগে সরকারি প্রচারণার কাজে নিবন্ধন লাভ করে এবং চুক্তি ভিত্তিতে বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে প্রচারণামূলক কবিগানের অনুষ্ঠান করতে থাকে। কবিগানের দুই দল থাকলেও চুক্তির নিয়ম অনুযায়ী এইসব অনুষ্ঠানে নামপত্রে পরিচিতি দেওয়া হত, 'কবিয়াল সুরেন্দ্রনাথ সরকার ও তাঁর দল'। এই সুযোগে সুরেন্দ্রনাথ সরকার আকাশবাণী কোলকাতা এবং কোলকাতা দূরদর্শনে নিয়মিত কবিগান পরিবেশনের সুযোগ পান। এ সময়ে ভারত সরকারের সংগীত ও নাটক বিভাগের পূর্বাঞ্চলীয় উপপরিচালক নেপাল নাগের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ সরকারের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়। নেপাল নাগের সহায়তায় সুরেন্দ্রনাথ সরকার পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও কবিগান করার সুযোগ পান। কবিগানের এসব আসরে তখন সুরেন্দ্রনাথ সরকারের বিপক্ষে নকুলেশ্বর দত্ত, নিশিকান্ত সরকার, রসিকলাল সরকার, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শ্রীনিবাস সরকার প্রমুখ সরকার কবিগান পরিবেশন করেছেন। এঁদের মধ্যে নকুলেশ্বর দত্ত ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ সরকারের গুরু। নিশিকান্ত সরকারও তাঁর

৬৭. সুরেন্দ্রনাথ সরকার, "ইউনেসকো সেমিনারে কবিগানের জয়", *বাংলার কবিগান ও লোককবি বিজয় সরকার*, পৃষ্ঠা-৩৯

বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে স্বরূপেন্দু সরকার যখন লবণহ্রদ শরণার্থী শিবিরের বাসিন্দা, তখন বিভিন্ন গণমাধ্যম ও আসরে তাঁকে নিয়েও তিনি বেশ কয়েক পালা কবিগান পরিবেশন করেছেন।

১৯৭৪ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর লোকসংগীত উৎসবে যোগদান সুরেন্দ্রনাথ সরকারের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পশ্চিমবঙ্গ থেকে কবিগানের দল নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। তিনি নিশিকান্ত সরকার, রসিকলাল সরকার এবং মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে নিয়ে সেই অনুষ্ঠানে কবিগান পরিবেশন করেছিলেন। কবিগানের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সৃজনশীলতা বিভিন্ন দেশ এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত বিশেষজ্ঞদের মুগ্ধ করেছিল। সেখানে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে বিখ্যাত সংগীতশিল্পী আবদুল লতিফ উপস্থিত ছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে তিনি তাঁর এক সময়ের বন্ধু কবিয়াল রসিক সরকারকে দেখতে পেয়ে আনন্দে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন এবং কবিগানে পশ্চিমবঙ্গের সাফল্যে তিনি আন্তরিকভাবে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন।[৬৮]

পূর্ববঙ্গীয় ধারার কবিয়ালদের মধ্যে বিশ শতকের একেবারে শেষদিকে যাঁরা সবচেয়ে খ্যাতিমান তাঁদের মধ্যে অসীম সরকারের নাম সর্বাগ্রস্মরণীয়। বছরে তিনি প্রায় দুশো পালা কবিগান করেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ তো বটেই বাংলাদেশ থেকেও তাঁর কবিগানের ডাক আসে। ইতিমধ্যে তাঁর বেশ কয়েকজন শিষ্য তৈরি হয়েছে, তাঁদের নিয়ে তিনি নিয়মিত গান করেন। কোলকাতা মহানগর থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, এমনকি মধ্যপ্রাচ্যেও তিনি কবিগান পরিবেশন করে থাকেন। এইসব গানে তাঁর সহযোগী হিসেবে থাকেন ছোট মনোরঞ্জন সরকার, অরবিন্দ সরকার, প্রভাত সরকার, তমাল সরকার, হরলাল সরকার, সন্ধ্যা সরকার, উমা সরকার, সজল সরকার প্রমুখ।[৬৯] এঁদের মধ্যে সন্ধ্যা সরকার একুশ শতকের সূচনায় বাংলাদেশে ফিরে আসেন।

পূর্ববঙ্গীয় ধারার এই কবিয়ালগণ পশ্চিমবঙ্গে যে কবিগান পরিবেশন করেন, তা পশ্চিমবঙ্গীয় ধারা থেকে যথেষ্ট আলাদা নয়। কিন্তু তাঁরা সকলেই বিশ্বাস করেন যে, পূর্ববঙ্গীয় ধারার কবিগানই আসলে কবিগান। শ্রোতাদের চাহিদা বদলে গেছে বলেই শুধু তাঁরা কবিগানের সংক্ষিপ্ততর সংস্করণ পরিবেশন করে থাকেন। তাঁদের এই অতৃপ্তির বিষয়টি তাঁরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনের নিকট প্রকাশ করেন। যেমন সুরেন্দ্রনাথ সরকার জানান, পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা কবিগান করেন তাঁরা নিজেদের ইচ্ছামতো বিষয় বা ভূমিকা নির্বাচন করে নিতে পারেন, পূর্ববঙ্গের মতো শ্রোতাদের ইচ্ছা অনুযায়ী গান গাইতে হয় না, এখানে ত্রিপদী, চৌপদী ছন্দের ছড়া তো দূরের কথা অনেক সরকার মিলটা পর্যন্ত ঠিকমতো দিতে পারেন না, দোহারদের কোনো ভূমিকাই থাকে না, তাছাড়া ডাক-মালশি-সখীসংবাদ তো দূরের কথা টপ্পাটা পর্যন্ত কবিয়ালদের গাইতে হয় না, এবং এসব কারণে পশ্চিমবঙ্গে কবিগান করাটা অনেক সহজ। প্রায় অভিন্ন তথ্য দেন কবিয়াল অসীম সরকার, সুরেন্দ্রনাথ সরকারের কন্যা কবিয়াল সম্বিতী সরকার, সন্ধ্যা সরকার এবং উমা সরকার।[৭০]

পূর্ববঙ্গীয় ধারার এইসব কবিয়াল পশ্চিমবঙ্গে কবিগান করার সময়ে টপ্পা-পাঁচালি অংশের শুধু পাঁচালিটাকেই পরিবেশন করে থাকেন। পূর্ববঙ্গে যেমন ব্যক্তি-ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিতর্কের সার অংশটুকু টপ্পায় পরিবেশন করতে হত, পশ্চিমবঙ্গে তা করতে হয় না। পশ্চিমবঙ্গীয় ধারার মতোই দুই সরকারকে বিষয় নির্বাচন করে বিতর্কে অবতীর্ণ হতে হয়। এসব বিতর্ক কখনো ধর্মনির্ভর হয়, কখনো ধর্মনিরপেক্ষও হয়। যেমন ধর্ম ও বিজ্ঞান, গণতন্ত্র ও রাজতন্ত্র, পুরুষ ও নারী, একাল ও সেকাল, গ্রাম

---

৬৮. সুরেন্দ্রনাথ সরকার "ইউনেসকো সেমিনারে কবিগানের জয়", *বাংলার কবিগান ও লোককবি বিজয় সরকার*, পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪

৬৯. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ১৯১

৭০. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ১৯১

ও শহর ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গীয় ধারার কবিয়ালদের সঙ্গে পূর্ববঙ্গীয় ধারার কবিয়ালদের রাজনৈতিক আদর্শগত কিছু তফাত লক্ষ করা যায়। পশ্চিমবঙ্গীয় ধারার কবিয়ালদের প্রায় সকলেই সাম্যবাদী আদর্শের প্রচারক। তবে পূর্ববঙ্গীয় ধারার কবিয়ালগণ সরাসরি কোনো পক্ষ অবলম্বন করেন না। অনেক সময়ে কৌশলে তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থান এড়িয়ে যান। যেমন নারায়ণ সরকার স্বীকার করেন, সচেতনভাবেই তাঁরা রাজনীতিকে আলোচনার বাইরে রাখার চেষ্টা করেন।

পূর্ববঙ্গ থেকে অভিবাসিত বাঙালিদের বড় একটি অংশ মধ্যভারতের দণ্ডকারণ্য এলাকায় এবং উত্তর ভারতের তরাই বনভূমিতে পুনর্বাসিত হয়। এসব এলাকায়ও ক্রমে কবিগান জনপ্রিয় হয়। বলা বাহুল্য এসব এলাকায় যেসব কবিগান অনুষ্ঠিত হয়, তা সম্পূর্ণত পূর্ববঙ্গীয় কবিগান। এই শ্রেণির একজন কবিয়াল হলেন বাগেরহাটের কাইনমারী গ্রামের গৌরপদ সরকার (১৯০৪-১৯৮৫)। ১৯৬৪ সালে তিনি দেশত্যাগ করার পর প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের মানা ক্যাম্পে স্থান পান, ১৯৬৯ সালে সেখান থেকে তাঁকে দণ্ডকারণ্য অঞ্চলে পুনর্বাসিত করা হয়। তাঁর স্থান হয় উড়িষ্যার পারুলকোট জোনের ৫৫ নং গ্রামে। এখানকার পুনর্বাসিত গ্রামগুলোতে তিনি কবিগান পরিবেশন করেছেন। প্রসঙ্গত তাঁর স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন :

> "ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরতে ঘুরতে পচতে পচতে ভারত বিখ্যাত দণ্ডকারণ্যের পারুলকোট জোনে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ৫৫ নং গ্রামে বসতি নিয়ে জীবনসায়াহ্নে মরণের ঢেউ গুণছি। কবিগান বোধ হয় জন্মগত নাছোড় ব্যাধি। সব ছেড়েছি– আত্মীয়-স্বজন, অর্থ-স্বাস্থ্য, বিলাস-ব্যসন– এমনকি চৌদ্দ পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে এসেছি, কিন্তু ছাড়তে পারিনি বাংলার কৃষ্টি, বাঙালির জাতীয় সম্পদ কবিগান।"[৭১]

এ অঞ্চলে তিনি একাই শুধু কবিগান করেন, তাই নয়, সেখানে তিনি বেশ কয়েকজন শিষ্য তৈরি করেছেন যাঁরা এ অঞ্চলে নিয়মিত কবিগান পরিবেশন করে থাকেন। একই অঞ্চলে কবিগান পরিবেশন করেন তাঁর প্রশিষ্য হরবিলাস সরকার। গৌরপদ সরকারের প্রথমজীবনের শিষ্য রসিকলাল সরকারের নিকট হরবিলাস কবিগান শিখেছিলেন। এই অঞ্চলের অন্য একজন কবিয়ালের নাম বিদ্যুৎ সরকার। পশ্চিমবঙ্গের নিশিকান্ত সরকার, সুরেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীনিবাস সরকার, রসিকলাল সরকার প্রমুখ সরকার দণ্ডকারণ্যের এসব অঞ্চলে কবিগান পরিবেশন করেন। একুশ শতকের সূচনায় উমা সরকারের মতো তরুণ কবিয়ালরাও এখানে কবিগান পরিবেশন করেছেন।[৭২]

কবিগানের পূর্ববঙ্গ পর্বে বিভিন্ন আঞ্চলিক বৈচিত্র্য লক্ষ করা গেছে। এমনকি আন্তর্জাতিক ব্যবধান সত্ত্বেও বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের কবিগানও প্রায় অভিন্ন বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। এ সময়ে শেষ পর্যন্ত এই স্বল্পদৈর্ঘ্যের কবিগান আদর্শ হয়। তবে বাংলাদেশের কোনো কোনো গ্রামে শতাব্দীর শেষার্ধেও পূর্ণদৈর্ঘ্যের কবিগানও চালু ছিল। দৈর্ঘ্য হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি প্রকৃতিগতভাবেও কবিগান পরিবর্তিত হয়। কারণ সময়স্বল্পতার কথা ভেবে কবিগানের যেসব অংশ বাদ দেওয়ার কথা ভাবা হয়, তার প্রায় সবগুলো ছিল ধর্মচেতনা-নির্ভর। যেমন ডাক ও মালশি গান কালীবন্দনামূলক, সখীসংবাদ এবং ভোর-গোষ্ঠাদি ছিল রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক। কবিগানের টপ্পা-পাঁচালি-ধুয়া-ছড়া-জোটক অংশগুলো প্রয়োজন অনুয়ায়ী ধর্মনিরপেক্ষ বা ধর্মসাপেক্ষ করা যায়। এভাবে বাংলাদেশে ও পশ্চিমবঙ্গে কবিগান বিষয়ের দিকে দিয়ে বিচিত্র হয়ে ওঠে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের কবিগান যেমন বামপন্থী রাজনীতি প্রচারের হাতিয়ার হয়, আবার তা সরকারি প্রচারণার কৌশলও হয়ে ওঠে। অন্যদিকে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলে কবিগানে মুসলমান কবিয়ালগণ দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রচারণা চালান, পাশাপাশি ইসলাম অনুষঙ্গের অনুপ্রবেশও সেখানে ঘটে, আবার খুলনা-বরিশাল-যশোর-ফরিদপুরের কবিগান সংক্ষিপ্ত হলেও তার মধ্যে হিন্দু ধর্মের সংশ্লিষ্টতা থেকে যায়, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তার মধ্যে ইসলাম ধর্মের প্রসঙ্গও অনেক ক্ষেত্রে বেশি জায়গা দখল করতে থাকে। কোথাও কোথাও অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, অনেক কবিয়াল জারিগানের বয়াতিদের সঙ্গে জারিগানও পরিবেশন করতে পারেন।

---

৭১. উদ্ধৃত, বিরাট বৈরাগ্য, *মতুয়া সাহিত্য পরিক্রমা* (নদীয়া : পরিমল বৈরাগ্য, ১৯৯৯), পৃষ্ঠা ১৯২

৭২. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ১৯৩

কবিগানের পৃষ্ঠপোষক শ্রেণির পরিবর্তন ঘটে। পূর্ববঙ্গে হিন্দু জমিদার ও বিত্তবান শ্রেণির লোকজন মূলত এইজাতীয় গানের আয়োজন করতেন। বিশেষত দুর্গাপূজা এবং কালীপূজায় তাঁরা এই গানের আয়োজন করতেন। এছাড়া বারোয়ারি খোলাও বহু ছিল, সেখানে গ্রামের সচ্ছল লোকেরা সম্মিলিতভাবে কবিগানের আয়োজন করতেন। অন্যদিকে জমিদার শ্রেণির বিলোপ ঘটায় পূর্ববঙ্গে শুধু বারোয়ারি খোলার কবিগানই অবশিষ্ট থাকে। তবে সাতচল্লিশ-উত্তর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ যেমন কবিগানের পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে আসে, পাশাপাশি নতুন গণমাধ্যম রেডিও এবং টেলিভিশনে কবিগানের আয়োজন করায় কবিগান চর্চা নতুন মাত্রা লাভ করে।

একাত্তর-পূর্ব বাংলাদেশ গ্রামের সাধারণ মানুষই ছিলেন কবিগানের মূল পৃষ্ঠপোষক। এ সময়ে চট্টগ্রাম রেডিওতে এক ধরনের কবিগান প্রচারের ব্যবস্থা করা হলেও সামগ্রিকভাবে কবিগানের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না বললেই চলে। তার ফলে রমেশ শীলের মতো খ্যাতিমান কবিয়ালকে পর্যন্ত অর্থাভাবে মানবেতর জীবন যাপন করতে হয়েছে। উনিশশো পঞ্চাশের দশকে বুলবুল ললিতকলা একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা মাহমুদ নূরুল হুদাকে লেখা তাঁর কয়েকটি চিঠির বক্তব্য বিশ্লেষণ করে বোঝা যায়, তখন তিনি কী মারাত্মক অর্থসংকটে ভুগেছিলেন।[৭৩] অথচ তাঁর মতো একজন বিখ্যাত কবিয়ালের পক্ষে অসচ্ছল থাকাটা বিস্ময়কর। একাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশে এই অবস্থার অবসান ঘটতে শুরু করে। যদিও সরকারিভাবে কবিগানের পক্ষে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেত আশির দশক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, তবে একাত্তরের পর বাংলাদেশে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয়, তাতে গ্রামের সাধারণ মানুষ কবিগান চর্চায় ব্যাপকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকেন। এর ফলে বিজয়কৃষ্ণ সরকারের মতো কবিয়াল, যিনি পাকিস্তান আমলে প্রতি বছরই পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে কবিগান করেছেন, তিনিও বলতে গেলে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে বেড়িয়েছেন।

কবিয়ালদের শ্রেণিচরিত্রও বদলে যায়। পূর্ববঙ্গ পর্বে কেবল হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন এই পেশার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও টাঙ্গাইল অঞ্চলে এবং পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বহু মুসলমান কবিয়ালকে কবিগান পরিবেশন করতে দেখা যায়। এছাড়া পূর্ববঙ্গে কবিগানের বহু ধরনের পরিবর্তন লক্ষযোগ্য হয়ে ওঠে।

বিকাশকালীন সময়ে পরিবর্তন

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিকাশকালীন সময়েস্থান-কাল-পাত্র ভেদে কবিগানের নানা ধরনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন লক্ষ করা যায়। কবিগান মূলত বহু ধরনের গানের একটি মিশ্রণ, সেই মিশ্রণের একটি অনুক্রম রয়েছে, সেই অনুক্রমের পরিবর্তন ঘটতে পারে; আবার প্রতিটি গানের রয়েছে আলাদা গঠন। এছাড়া কবিগানের সুরের পরিবর্তন ঘটে অন্তত তিন ভাবে : স্থানভেদে, কালভেদে এবং ব্যক্তিভেদে। কবিগানে বিষয়বস্তুর পরিবর্তনও স্থান-কাল সাপেক্ষ। এমনকি তা পরিবেশক ও শ্রোতার ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে যেমন সম্পর্কিত, তেমনি সংস্কৃতি ও রুচিসাপেক্ষও বটে।

কবিগানের এই বহুমাত্রিক পরিবর্তন ও রূপান্তরকে স্পষ্ট করতে হলে বিষয়টিকে মূলত দুই ভাগে বিভক্ত করা দরকার : প্রকরণগত রূপান্তর, এবং বিষয়গত রূপান্তর। প্রকরণগত রূপান্তরের মধ্যে পড়ে কবিগানের বিন্যাসগত রূপান্তর, কবিগানের গঠনগত রূপান্তর, উপস্থাপনগত রূপান্তর, আনুষঙ্গিক সাজসজ্জা ও পোশাকের রূপান্তর, মঞ্চাদির রূপান্তর, কবিয়ালদের এবং সহযোগীদের জীবনযাত্রায় রূপান্তর, কবিগানে ব্যবহৃত যন্ত্রাদির রূপান্তর, কবিগানের বিভিন্ন অংশের আভ্যন্তরীণ কাঠামোর রূপান্তর, সুরের রূপান্তর, তালের রূপান্তর এবং কবিগানের ব্যবস্থাপনাগত রূপান্তর। বিষয়গত রূপান্তরের মধ্যে পড়ে আলোচ্য বিষয়ের রূপান্তর, অভিন্ন বিষয় সত্ত্বেও দৃষ্টিভঙ্গিগত ও রুচিগত রূপান্তর ইত্যাদি। কবিগান পরিবর্তিত হয়ে যখন নতুন নাম গ্রহণ করে, তখন তার প্রকরণ ও

৭৩. সৈয়দ মোহাম্মদ সাহেদ সম্পাদিত, *রমেশ শীল রচনাবলী* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩), পৃষ্ঠা ৪৫০-৪৫৬

বিষয়বস্তুতে ঘটে আমূল পরিবর্তন। এই ধরনের রূপান্তরকে বলা যায় কবিগানের চূড়ান্ত বিকাশ। বিংশ শতাব্দীর ব্যবধানে সমাজে যে পরিবর্তন হয়েছে, বিশেষত, কবিগান ও শ্রোতাদের মূল্যবোধের রূপান্তর ঘটেছে, তার ফলে কবিগানের আঙ্গিকে, বিষয়বস্তুতে এবং কবিয়ালদের জীবনে লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা যায়।

গঠন ও বিন্যাসগত পরিবর্তন

সময়ের পরিবর্তনে কবিগানের বিভিন্ন অংশের সংযোজন-বিয়োজন ঘটেছে। আঠারো শতকের শেষদিককার কবিগানের বিন্যাস সম্পর্কে জানা যায় জয়নারায়ণ ঘোষালের 'করুণানিধানবিলাস' নামক কবিগানের সংকলন থেকে। জানা যায়, সাধারণত তখন পর পর তিন রাত কবিগানের আয়োজন হত। এই কবিগানে মোট চার ধরনের গান থাকত : গুরুবন্দনা, সখীসংবাদ, বিরহ এবং খেউড়। পালাক্রমে এই চার ধরনের গান পরিবেশিত হত। এই গানগুলোর গঠন প্রায় এক রকম ছিল। সব ধরনের গানেই চিতান ও টপ্পা নামের তুক থাকত।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই কোলকাতার কবিগানের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন শুরু হয়, এ মধ্যে বিভিন্ন অঙ্গ সংযোজিত হতে থাকে। এমনকি কবিগানে জয়লাভ করার পরে শখের কবিগানের দল 'প্রভাতি' নামের গান গাইতে গাইতেও বাড়ি ফেরেন।[৭৪] তখন কবিগানের মধ্যে 'ভোর', 'গোষ্ঠ', 'প্রভাস', 'বসন্ত' প্রভৃতি নামের গান যুক্ত হয়। এক পর্যায়ে উনিশ শতকের শেষার্ধে কবিগানের অংশ হিসেবে 'খেউড়' নামই বর্জিত হয়, তার বদলে নাম হয় 'টপ্পা-পাঁচালি'।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ 'খেউড়' থেকে 'কবির লহর' নামে একটি অংশ আলাদা হয়ে যায়। এটিও বিতর্কমূলক, তবে এটিতে কবিয়ালদ্বয় সামনাসামনি ছড়া কেটে বিতর্ক করেন। উনিশ শতকের শেষার্ধ নাগাদ কবিগানের এই অংশের নাম হয়ে যায় 'জোটক', 'জোটের পাল্লা', 'বোলকাটাকাটি', 'মিলনগোষ্ঠ' বা 'মিলনগীতি'। সময়ের ব্যবধানে যেমন স্থানের ব্যবধানেও কবিগানের এই শেষাংশের পরিবর্তন লক্ষণীয়।

উনিশ শতকের কোলকাতায় কবিগানের বিন্যাসগত পরিবর্তনে যাঁরা বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ভোলা ময়রা, মাধব ময়রা, সীতানাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরাই কোলকাতার কবিগানকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে যাওয়ায় ফলে উনিশ শতকের শেষ নাগাদ কবিগানের বিন্যাসগত পরিবর্তন আরো দ্রুত হয়। বিশেষভাবে যশোর অঞ্চলে, ময়মনসিংহ অঞ্চলে, ঢাকা অঞ্চলে ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে কবিগানের কোনো কোনো অংশের বর্জন-সংযোজন ঘটতে থাকে।[৭৫]

কবিগানের এই বিন্যাসে আর একবার বড় ধরনের পরিবর্তন লক্ষ করা যায় বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। এই পরিবর্তনের পেছনে মানুষের ব্যস্ততা যেমন কাজ করে, একইসঙ্গে প্রচারণার কৌশল হিসেবে কবিগানকে ব্যবহার করার কারণটাও তেমন কাজ করে। উনিশশো ত্রিশের দশকে কোলকাতায় ব্যস্ত শ্রোতাদের কথা মনে রেখে বাগেরহাটের রাজেন্দ্রনাথ সরকার ও নড়াইলের বিজয় সরকার এটিকে যেমন টপ্পা-পাঁচালি আর জোটের পাল্লা-নির্ভর গানে পরিণত করেন, কাছাকাছি সময়ে চট্টগ্রামের রমেশ শীল এবং ফণী বড়ুয়াও তেমন এটিকে পুরোপুরি পাঁচালি-নির্ভর করে তোলেন। সাতচল্লিশের পরে চট্টগ্রাম অঞ্চলে পরিবর্তন হয় সবচেয়ে বেশি। তখন অনেক কবিয়াল ধুয়া গানের একটি কলি এবং সেই কলির সুরে ছড়া কেটে গাওয়া জোটের পাল্লাকে কবিগান হিসেবে প্রচার করতে শুরু করেন। অর্থাৎ আঠারো শতকে যে কবিগানের সূচনা হয়েছিল মূলত সংগীত-প্রতিযোগিতা দিয়ে, একুশ শতক নাগাদ সেই কবিগান বিতর্ক-সর্বস্ব ছড়াকাটার মধ্যে নিজেকে সীমিত করে ফেলে।

---

৭৪. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৫

৭৫. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ১৯৭

কালের পরিবর্তনে যেমন কবিগানের বিভিন্ন অংশের সুস্পষ্ট পরিবর্তন ঘটে, স্থানের পরিবর্তনেও তেমন কম-বেশি পরিবর্তন লক্ষণীয় হয়। ব্যক্তিভেদেও পরিবর্তন ঘটা স্বাভাবিক। উদাহরণ হিসেবে কবিগানের শেষ অংশ হিসেবে উপস্থাপিত জোটের পাল্লার বিষয় তোলা যেতে পারে। সাধারণত তা কৃষ্ণ-বলরাম, রাধা-কৃষ্ণ প্রভৃতি চরিত্র নিয়ে গীত হয়। কিন্তু জোটের পাল্লায় এক-এক জনের সংলাপ কতটা দীর্ঘ হবে অথবা হ্রস্ব হবে; ছন্দ, লয়, সুর কেমন হবে, তা যেমন অঞ্চলের ওপরে নির্ভর করে, একই সঙ্গে তা ব্যক্তির ওপরেও নির্ভর করে। পূর্ববঙ্গীয় কবিয়ালের উপস্থাপিত জোটের পাল্লা এবং পশ্চিমবঙ্গীয় কবিয়ালের জোটের পাল্লা পাশাপাশি উপস্থাপন করলেও তা বোঝা যাবে।

নিত্যানন্দ ও হরিদাস দুই চরিত্র নিয়ে পূর্ববঙ্গীয় জোটের পাল্লা–

নিত্যানন্দ :

"আয় না রে ভাই আয় না সবাই, আমরা মিলনগীতি গাই।
জানি মিলনে পরমানন্দ, নিরানন্দ পায় না ঠাঁই ॥ (ধুয়া)
অনেকক্ষণ শুরু হলো গান, শুনলে হিন্দু, খ্রিস্টান আর মুসলমান
হবে এখন এ গান সমাপন, সভায় নিবেদন জানাই ॥
হরিদাসে আর আমাতে কাব্য দ্বন্দ্ব দুজনাতে
হরিদাসের দুঃখ ঘোচে যাতে, আজ আমি তা করতে চাই ॥

হরিদাস :

গোঁসাই বলবো কি তোমার গোচরে, আছে ষোলো নাম বত্রিশ অক্ষরে।
তুমি বলো নাই তা প্রকাশ করে, তাই অন্তরে দুঃখ পাই ॥

নিত্যানন্দ :

যারে কইস ষোলো নাম বত্রিশ অক্ষর, বত্রিশ অক্ষর ঠিক এ নামের ভিতর
এতে একটি নাম ছাড়া অতঃপর আমি তো দেখতে না পাই ॥
হরির সম্বোধনে হরে, দ্যাখনা বিবেচনা করে
হরিনাম ছাড়া ইহার ভিতরে অন্য নাম তো দেখি নাই ॥
কৃষ্ণ শব্দের অর্থ কর্ষণ, ইহা কোনো নাম নয় কখন
তাই শ্রীহরির নিকট ভক্তগণ, কহে, হৃদয়ভূমি কর্ষণ করো তাই ॥
আর রামের অর্থ জানাইলাম, আত্মা রময়তি ইতি রাম
জীবাত্মায় পরমাত্মায় এক ঠাম, আত্মা রময়তি ইতি রাম
জীবাত্মায় পরমাত্মায় এক ঠাম, মিলন করাও হে গোঁসাই ॥
তবে ভেবে দেখ হরিনাম বিনে এতে অন্যনাম দেখিনে
ভুল বুঝিলি মূল না চিনে, এ দুঃখ কারে জানাই ॥
পণ্ডিত যাঁরা এ সংসারে পাণ্ডিত্যে এ নাম প্রচারে
তাইতে গৌর নির্দেশ দেয় সবারে, মালায় এ নাম জপা চাই ॥

হরিদাস :

কেহ তো আর কয়নি আগে, তাই তোমার বাক্যে আমার হৃদয়বাগে
যেন প্রেমের ফুল ফোটে সোহাগে, সদা হরিনামের গীতি গাই ॥

নিত্যানন্দ :

আমার হরিদাসের ভুল ভেঙেছে, যখন হরিনামে মন রেঙেছে
তবে আয় হরিদাস নেচে নেচে, হরিনাম কবি সদাই ॥

হরিদাস :
এতো দিনে ভেঙে গেছে মোর যতো ভুল।
অকূলের মাঝে আমি পাইলাম কূল ॥

নিত্যানন্দ :
হরিদাসের সব ধান্দা গেলো যবে চুকে।
আশীর্বাদ করি হরিদাস থাক সুখে ॥
সাধুদের নিন্দা কভু কোরো না অধরে।
গৌর রূপে কৃষ্ণ যেন তোমা কৃপা করে ॥
নিত্যানন্দ হরিদাসের দ্বন্দ্ব শেষ হলো।
গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া প্রীতে হরি হরি বলো ॥"[৭৬]

রামী ও চণ্ডীদাস দুই চরিত্র নিয়ে পশ্চিমবঙ্গীয় বোলকাটাকাটি–
রামী :
"মাছ ধরিছো কোন ছিপে গো, মাছ ধরা দেয় না কেনে।
মাছ আসে যায়, ভেসে বেড়ায়, ধরা না দেয় বড়শির গাঁথনে ॥ (ধুয়া)

চণ্ডীদাস :
বসে আছি চার ফেলে গো চেয়ে আছি ফ্যাতনা পানে।
আমি যাবো না উঠে থাকবো বসে, দেখি মাছ ধরা দেয় কতোক্ষণে ॥

রামী :
এ মাছ এমন ফিচেল, চার খেয়ে যাবে পালিয়ে।
গাঁথি গাঁথি মনে হবে, উধাও হবে ধোকা দিয়ে ॥

চণ্ডীদাস :
চারের সাথে দেবো এমন গুণ মিশিয়ে।
ধরা দেবে আপনা থেকে জ্ঞান হারিয়ে ॥
রামী :
তুমি কী গুণের গুণমণি।
এ মাছ ধরবে কেমনে শুনি ॥

চণ্ডীদাস :
গুণমণি না হলেও গুণ তো আমি ভালোই জানি।
অঙ্ক কষে সুতো ছাড়ি গহিন থেকে মাছকে টানি ॥

রামী :
তোমার সুতোর মাপ আছে জানা।
ভেবেছো কি ডোবাপানা ॥

---

৭৬. উভয় কবিয়ালের কথা স্বরূপেন্দু সরকার কর্তৃক রচিত।

চণ্ডীদাস :
চারের গন্ধ ছড়াবে তোমার আঙিনা।
সুতো না হোক, গন্ধে দেবে টানা ॥"...[৭৭]

উভয় অংশকে তুলনা করলে বেশ কয়েক ধরনের অমিল খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন পূর্ববঙ্গীয় অংশে প্রথমে দুই কলির একটি ধুয়া অনেকটা ভূমিকার মতো, এবং টপ্পা-পাঁচালির মূল চরিত্র এখানে প্রলম্বিত। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গীয় অংশে টপ্পা-পাঁচালির চরিত্র বাদ দিয়ে প্রচলিত দুটি চরিত্রে কবিয়ালদের আবির্ভাব, এবং সেই প্রসঙ্গে ধুয়া। অবশ্য পূর্ববঙ্গ পর্বেও কৃষ্ণ ও বলরাম চরিত্র দিয়ে এমন পাল্লা হয়ে থাকে। পূর্ববঙ্গ পর্বে জোটের পাল্লার চরণ-বিন্যাস, ছন্দ ও অন্ত্যমিলের বিষয়টি ধুয়ার চরণ-বিন্যাস, ছন্দ ও অন্ত্যমিলের অনুরূপ হয় এবং বিশেষভাবে লক্ষণীয়, জোটের পাল্লা যতই দীর্ঘ হোক-না কেন, পূর্ববঙ্গীয় রীতি অনুযায়ী পুরোটা অংশে অভিন্ন চরণ-বিন্যাস, ছন্দ এবং অন্ত্যমিল অব্যাহত রাখতে হয়। শুধু একেবারে শেষের একটি প্রশ্নোত্তর দ্রুত লয়ের পয়ার দিয়ে করা হয়। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের পাল্লার চরণ-বিন্যাস ও ছন্দ অতটা কড়াকড়ি পালিত হয় বলে মনে হয় না। উপরের উদ্ধৃতিতেও দেখা যায়, রামী তার উক্তিতে যে ধানের চরণ-বিন্যাস, ছন্দ ও অন্ত্যমিল ব্যবহার করে, চণ্ডীদাস তার জবাবে সেই একই ধরনের চরণ-বিন্যাস, ছন্দ ও অন্ত্যমিল দেয়; নতুন প্রশ্ন ও জবাবের ক্ষেত্রে উভয় কবিয়ালই আলাদা চরণ-বিন্যাস, ছন্দ ও অন্ত্যমিল ব্যবহার করতে পারে।[৭৮]

সাজসজ্জা ও উপস্থাপনগত পরিবর্তন

উনিশ শতকের কোলকাতা পর্বের কবিগানে কবিয়ালদের সাজসজ্জা ও উপস্থাপনগত বিষয়ে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। কবিগানে কবিয়াল, দোহার, যন্ত্রী সকলে কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত লাল কাপড়ে ঢেকে, অনাবৃত দেহে, নূপুর পায়ে, পাখির পালকযুক্ত তেকোনা টুপি পরে আসরে আসতেন।[৭৯] কিন্তু কবিগানের পূর্ববঙ্গ পর্বে এক-এক অঞ্চলে কবিয়াল এবং তাঁদের সহযোগীদের পোশাকে স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। যেমন বিশ শতকের সূচনায় ঝালকাঠি কেন্দ্রের কবিয়ালগণ ধুতি-পাঞ্জাবি-চাদর পরলেও তাঁদের পুরুষ দোহারগণ উকিলের গাউনের মতো রঙিন পোশাক পরতেন এবং দলের নারী দোহারগণ পরতেন বডিকোট ও ঘাঘরা।[৮০] একই সময়ে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবিয়াল এবং তাঁদের দোহারগণ পায়ে নূপুর পরতেন।[৮১] একুশ শতক নাগাদ বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে কবিগানের শিল্পীদের পোশাকের স্বাতন্ত্র্য হ্রাস পায়। নারীরা শাড়ি পরেন, অন্যদিকে পুরুষেরা ধুতি-পাঞ্জাবি এমনকি পাজামা-পাঞ্জাবিও পরতে শুরু করেন।

আঠারো-উনিশ শতকে কবিয়ালগণের পোশাক দলের অন্যদের পোশাকের থেকে আলাদা ছিল না। তখন সকলেই খালি গায়ে থাকতেন এবং রঙিন ধুতি পরতেন। কিন্তু উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ কবিয়ালদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা ধুতি-ফতুয়া ইত্যাদি মার্জিত পোশাক পরতে শুরু করেন। তবে এ সময়ে যাঁরা পল্লিবঙ্গে কবিগান করতেন, তাঁরা শুধু ধুতি পরতেন বলে মনে হয়, শীতকালে ধুতির উপরে বড়জোর চাদর ব্যবহার করতেন। উনিশ শতকের শেষদিককার কবিয়াল তারকচন্দ্র সরকার ও হরিচরণ আচার্যের যে ছবি পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় তাঁদের দুজনের উর্ধ্বাঙ্গে কোনো বসন নেই। কিন্তু তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম যেমন বিজয়নারায়ণ আচার্য, রমেশ শীল, রাজেন্দ্রনাথ সরকার বা নকুলেশ্বর দত্ত– যাঁদের সকলেরই জন্ম উনিশ শতকের শেষদিকে, তাঁরা

---

৭৭. উদ্ধৃত, দীপক বিশ্বাস, *কবিগান* (কোলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৪), পৃষ্ঠা ১১
৭৮. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ২০১
৭৯. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৩-৬৪
৮০. দীনেশচন্দ্র সিংহ, *কবিয়াল কবিগান* (কোলকাতা : সৌদামিনী সিংহ, ১৯৭৭), পৃষ্ঠা ৪
৮১. স্বরোচিষ সরকার, "কবিগান : অতীত ও বর্তমান", *সাহিত্য পত্রিকা*, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ২৩৬

সকলেই ধুতি-পাঞ্জাবি পরেছেন, অন্তত সেই ধরনের পোশাক-পরা ছবিতে তাঁদের দেখা যায়। একুশ শতকের সূচনায় বাংলাদেশের কবিয়ালদের পোশাক সাধারণত পাঞ্জাবি ও পাজামা, তবে দক্ষিণাঞ্চলের হিন্দু কবিয়ালগণ ধুতি-পাঞ্জাবি পরে থাকেন। বিশ শতকের শেষদিকে বেশ কয়েকজন মহিলা কবিয়ালের আবির্ভাব ঘটেছে। এঁরা প্রায় সকলেই শাড়ি-ব্লাউজ পরেন, অনেকে শাড়ির উপর একটা চাদরও ব্যবহার করে থাকেন।

কবিয়ালদের পোশাকে যেমন পরিবর্তন ঘটে, দোহারদের পোশাকেও তেমন পরিবর্তন দেখা যায়। বিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ কবিগানের সকল শিল্পীকে ধুতি-পাঞ্জাবি পরতে দেখা যায়। তবে শতাব্দীর শেষদিকে কবিয়ালদের সহযোগীগণকে সাধারণ পোশাকে দেখা যায় : কেউ পাজামা-পাঞ্জাবি পরেন, কেউ প্যান্ট-শার্ট পরেন। এ পর্যায়ে মহিলা দোহারদের উপস্থিতি একেবারেই হ্রাস পায়। তাই তাঁদের পোশাকের পরিবর্তন সম্পর্কে মন্তব্য করা গেল না।

কবিগান পরিবেশনের সময়সূচি এক-এক সময়ে এক-এক রকম। আঠারো শতকের কবিগান ছিল পর পর তিন রাতের গান। রাতের সূচনায় শুরু হত, রাতের শেষে শেষ হত। এই সময়সূচি উনিশ শতকের প্রথমদিকেও ছিল। তাই বিজয়ী দল প্রভাতী গান গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরতে পারত। উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ কবিগান যখন দুর্গাপূজা ও কালীপূজার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে যায়, তখন কবিগান শুরু হতে থাকে মধ্যরাত্রিতে এবং পরের দিন দ্বিপ্রহর পর্যন্ত। একাধিক পালা হলে একই সময়সূচি অনুযায়ী প্রতি দিন।[৮২] বিশ শতকের কবিগান সংক্ষিপ্ত হয়ে আসায় এবং একাধিক গণমাধ্যমে তা পরিবেশনের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায়, কবিগানের এই সময়সূচিতে পরিবর্তনের হাওয়া লাগে। কোনো অনুষ্ঠানের সূচনা বা সমাপ্তি হিসেবে যখন কবিগানের আয়োজন হয়, তখন সেই অনুযায়ী তার সময়সূচি নির্ধারিত হয়। উনিশশো ত্রিশের দশকের রাজেন্দ্রনাথ সরকার, বিজয়কৃষ্ণ সরকার, বা নিশিকান্ত সরকার কোলকাতায় যেসব কবিগান পরিবেশন করেছিলেন, তা ছিল সন্ধ্যাবেলায় শুরু হওয়া মাত্র কয়েক ঘণ্টার কবিগান। একই সময়ে রমেশ শীল এবং ফণী বড়ুয়াদের কবিগানও ছিল সন্ধ্যায় দিকে শুরু হওয়া কবিগান। এই ধারাই ক্রমে বলবৎ হয়। একুশ শতকের সূচনায় বাংলাদেশের গ্রামবাংলায় আয়োজিত অধিকাংশ গানের আসর বিকেলের দিকে শুরু হয়ে মধ্যরাত্রির পূর্বে শেষ হয়ে যায়।[৮৩]

স্থান ও কালভেদে উপস্থাপন-কৌশলেও বহু ধরনের পরিবর্তন ঘটে। তবে প্রধান পরিবর্তনটি গানের অঙ্গবদলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আঠারো-উনিশ শতকে কবিয়ালের ভূমিকা ছিল প্রধানত রচয়িতার, পেছনে বসে তিনি গান রচনা করতেন, গায়ক বা দোহারদের কানে গানের কথা বলে দিতেন, গায়ক তা সুর দিয়ে উপস্থাপন করত। ভবানীবিষয়, সখীসংবাদ, লহর, খেউড়– সব ধরনের গানে এই রীতি প্রযোজ্য ছিল। বিশ শতকের প্রথমদিকে কবিগানের এই দোহারসর্বস্বতা হ্রাস পেতে শুরু করে। বিশেষভাবে টপ্পা-পাঁচালি বা আলোচনা অংশ দীর্ঘতর হতে থাকায় দোহারদের ভূমিকা হ্রাস পায়। অথচ বিশ শতকের প্রথমদিকেও দোহারদের ভূমিকা এতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, অনেক সময়ে সুকণ্ঠের অধিকারী কোনো দোহার কবিয়ালের চেয়েও অধিক সম্মানী পেতেন।

বিশ শতকের শেষদিক নাগাদ কবিগান একেবারে কবিয়ালসর্বস্ব গানে পরিণত হয়। এটি পূর্ববর্তী শতাব্দীর কবিগানের বৈশিষ্ট্য থেকে অনেকটা আলাদা। উনিশ শতকেও কবিগান ছিল একটি দলীয় উপস্থাপনা, সকলের ভূমিকা সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু বিশ শতকের শেষ এবং একুশ শতকের সূচনায় একা কবিয়ালই গান গেয়ে, অভিনয় করে, ছড়া কেটে আসর মাতিয়ে রাখেন।[৮৪]

---

৮২. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ২০৩

৮৩. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ২০৩

৮৪. দেবেশ রায়, *বরিশালের যোগেন মণ্ডল* (কোলকাতা : দে'জ, ২০১০), পৃষ্ঠা ৩৫৮-৩৫৯

যন্ত্রাদির পরিবর্তন

কবিগানের প্রধান বাদ্যযন্ত্র ঢোল। ঢোল ছাড়া কবিগানের কথা ভাবা যায় না। এর সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের যোগ-বিয়োগ হলেও ঢোলের বিকল্প কোনো কালেই নেই। তবে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে কবিগানে যন্ত্রের সংখ্যা বাড়তে থাকে। তখন হুগলি-চুঁচুড়া অঞ্চলের আখড়াই গানে ঢোলের পাশাপাশি নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হত। হুগলি-চুঁচুড়া অঞ্চলের গায়কেরা বাইশ ধরনের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করতেন। এই বাইশ ধরনের বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে কী কী বাদ্যযন্ত্র ছিল, তার তালিকা হয়তো পাওয়া কঠিন, তবে ঢোলের পাশাপাশি আরো দু-এক ধরনের আনদ্ধ যন্ত্র, বাঁশি জাতীয় কিছু বাদ্যযন্ত্র, কিছু তারযন্ত্র, কাঁসি বা জুরি জাতীয় কিছু তালযন্ত্র সেই যন্ত্রাদির তালিকায় থাকা সম্ভব। উনিশ শতকের প্রথমে কবিগান শুরু হওয়ার আগে কোথাও কোথাও বাদ্যযন্ত্রের ঐকতানও হত। কোলকাতা পর্বের কবিগানে বাদ্যযন্ত্রের বাহুল্য থাকাটা স্বাভাবিক ছিল, যদিও ঢোল এবং কাঁসি ছিল সেখানে মূল যন্ত্র। কিন্তু কবিগান পল্লিবঙ্গে প্রবেশ করার পর প্রথমদিকে হয়তো আর্থিক কারণে বাদ্যযন্ত্রের সংখ্যা হ্রাস পায়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ময়মনসিংহ অঞ্চলের কবিগানে ঢোল-কাঁসির পরিবর্তে কীর্তনের খোল, করতাল আর বেহালা দিয়ে কবিগান পরিবেশিত হতে দেখা যেত।[৮৫] আবার উনিশ শতকের শেষার্ধ নাগাদ এই ময়মনসিংহ অঞ্চলে ঢোল এবং কাঁসিই মূল বাদ্যযন্ত্র হয়ে ওঠে এবং শুধু এই দুটি বাদ্যযন্ত্রের ওপরে নির্ভর করে এখানকার শিল্পীরা অনায়াসে একাধিক রাগ-রাগিণীভিত্তিক দীর্ঘ দীর্ঘ তুকে রচিত গান নির্ভুলভাবে পরিবেশন করতে পারতেন।[৮৬]

কবিগানে হারমোনিয়ামের ব্যবহার কোলকাতা পর্বে শুরু হওয়া সম্ভব। উনিশ শতকের শেষ নাগাদ বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলে ঢোল এবং কাঁসির সঙ্গে এই যন্ত্রটিও জনপ্রিয় হয়। যশোরের তারকচন্দ্র সরকার বা ঢাকার হরিচরণ আচার্যের দলে যেমন হারমোনিয়াম ছিল, প্রায় সমকালের ঝালকাঠি কেন্দ্রেও হারমোনিয়াম হয়ে উঠেছিল বিকল্পহীন একটি বাদ্যযন্ত্র।

বিশ শতকের সূচনা নাগাদ কবিগানের বাদ্যযন্ত্র হিসেবে প্রায় সর্বত্র হারমোনিয়াম, ঢোল, কাঁসি, বেহালা, দোতারা, সানাই, সরোদ, বাঁশি, জুড়ি, খঞ্জনি, নূপুর প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। একুশ শতকের সূচনায় এসব যন্ত্রের সঙ্গে কোনো কোনো অঞ্চলে সিন্থেসাইজার, ক্যাসিও, ব্যাঞ্জো প্রভৃতি আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারও লক্ষণীয় হয়ে ওঠে।[৮৭]

মঞ্চাদির পরিবর্তন

আঠারো-উনিশ শতকে কবিগান পরিবেশিত হত কোলকাতায়। জমিদারগণ ছিলেন সেই গানের পৃষ্ঠপোষক; এমনকি অনেকে ছিলেন শখের কবিয়াল। অতএব এই পর্বের কবিগানের মঞ্চ বেশ মানসম্মত ছিল, এমন ধরে নেওয়া যায়। শিল্পীসংখ্যা ও শ্রোতাসংখ্যার ওপরে মঞ্চের আয়তন ও উচ্চতা নির্ভরশীল হত। আঠারো শতকের মাঝামাঝি কবিগানের সূচনাকালে শিল্পীসংখ্যা এবং শ্রোতাসংখ্যা কম ছিল, তাই সেই কবিগানের আসরের জন্য আলাদা উচ্চতা না হলেও চলত। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কবিগানের জনপ্রিয়তা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া পরিবেশনকারী শিল্পীদের সংখ্যাও তেরো-চোদ্দ জনের মতো হয়। তেরো-চোদ্দজন শিল্পীর তাঁদের যন্ত্রাদিসহ বসতে বেশি জায়গার দরকার এবং অসংখ্য মানুষের নিকট এই শিল্পীদের দৃশ্যযোগ্য করে তুলতে আসরের অনেকটা উচ্চতা প্রয়োজন। জমিদার বা বিত্তবান ব্যক্তিদের বাড়ির সামনে তখন কয়েক ফুট উচ্চতার এবং একশো থেকে দেড়শো বর্গফুটের মঞ্চ তৈরি করার প্রয়োজন হয়।

ময়মনসিংহ অঞ্চলের কবিয়াল বিজয়নারায়ণ আচার্যের দেওয়া তথ্যে দেখা যায়, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এই অঞ্চলে যখন কবিগান শুরু হয়, তখন মঞ্চ তো দূরের কথা কবিয়ালদের বসার

---

৮৫. বিজয়নারায়ণ আচার্য, "ময়মনসিংহে কবিগান", *সৌরভ*, জুন-জুলাই ১৯১৪, পৃষ্ঠা ২৬৬

৮৬. দীনেশচন্দ্র সিংহ, *কবিয়াল কবিগান*, পৃষ্ঠা ২৬১

৮৭. দীপক বিশ্বাস, *কবিগান*, পৃষ্ঠা ১৪

জন্য ভালো কোনো আসরের ব্যবস্থাও থাকত না। শুধু ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে তাঁরা কবিগান পরিবেশন করতেন।[৮৮] এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য বিশেষ কোনো কবিয়ালকে কৃতিত্ব দেওয়ার চেয়ে যুগপরিবর্তন এবং কবিগানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা যেতে পারে।

বিশ শতকে কবিগানের আসর বিভিন্ন প্রকারের হয়। গ্রামাঞ্চলের মঞ্চ বা প্রদর্শনী বা মেলার মাঠের মঞ্চ প্রায় একই রকম হয়। শহরের অডিটোরিয়মে যখন কবিগান হয়, তখন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য নির্মিত স্থায়ী মঞ্চই কবিগানের মঞ্চ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আবার অডিও-ভিডিও মাধ্যমে যখন কবিগানের আয়োজন করা হয়, তখন সেখানে মঞ্চের ব্যাপার আলাদা। এর মধ্যে অডিওতে যেহেতু কিছু দেখার নেই, তাই কোথায় বসে শিল্পীরা কবিগান পরিবেশন করছেন, সেখানে তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু ভিডিও মাধ্যমে মঞ্চ অপরিহার্য। তাই ভিডিও করার সময়ে প্রায় ক্ষেত্রেই কৃত্রিম মঞ্চ তৈরি করা হত।[৮৯]

সুরের পরিবর্তন

আঠারো শতকে ঝিঁঝিট, বেহাগ, দক্ষিণি প্রভৃতি রাগে কবিগান পরিবেশিত হত। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ভৈরবী, বাগেশ্বরী, বেহাগ, ললিত প্রভৃতি রাগে কবিগান পরিবেশনের খবর পাওয়া যায়। একই গানের বিভিন্ন অংশ তখন বিভিন্ন রাগে পরিবেশন করা হত। উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ বিভিন্ন রাগের মিশ্রণ ঘটিয়ে কবিগানের সুর সুনির্দিষ্ট আদল পায়। তারপরেও এক-এক অঙ্গের গানে এক-এক রাগের প্রাধান্য থাকে। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কবিগানের সংগীতপ্রধান অংশের গুরুত্ব লোপ পায়, ধুয়া গান নামে এক ধরনের লঘুসংগীতই তখন অবশিষ্ট থাকে।

একুশ শতকের সূচনায় কবিগানের সুর বলতে ধুয়া গানের সুরকেই বোঝাতে থাকে। এইসব ধুয়া গান কখনো শ্যামাসংগীতের সুরে, কখনো কীর্তনের সুরে, কখনো ভাটিয়ালি সুরে, কখনো বাউল সুরে, কখনো মুরশিদি সুরে, কখনো-বা মাইজভাণ্ডারী গানের সুরে পরিবেশত হয়ে থাকে। এসব গানের অধিকাংশই কোনো না কোনো লোকসংগীতের মধ্যে পড়ে।

স্থান-কাল ভেদে ধুয়া গানের সুরেও পরিবর্তন ঘটে। যেমন কবিয়াল বিজয়কৃষ্ণ সরকারের ধুয়া গান পশ্চিমবঙ্গের কবিয়ালের কণ্ঠে ভিন্ন সুরে গীত হতে থাকে। বিজয় সরকারের সুর ছিল মূলত ভাটিয়ালি-প্রধান। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অনেক আসরে অসীম সরকার ভাটিয়ালি সুরের গানকে বাউল আঙ্গিকে পরিবেশন করতে শুরু করেন। এ ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান,

> "এ বঙ্গে বাউল যেহেতু জনপ্রিয়, আমিই তাই ওই সুরের মধ্যে বাউল টাচটা নিয়ে এসেছি। এতে যুব সমাজ বেশি গ্রহণ করেছে। আসর ও শ্রোতার রুচি বুঝে সুরের রকমভেদ ঘটাতে হয়।"

এ ধরনের পরিবর্তন স্বয়ং গীতিকারকেও করতে দেখা যায়। যেমন রসিকলাল সরকার তাঁর 'চিঠি লিখি তোমার কাছে ব্যথার কাজলে' শীর্ষক গানটি ভাটিয়ালি সুরে রচনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন পশ্চিমবঙ্গের আসরে গানটি পরিবেশন করেন, তখন এর সুরে বাউল সুরের ছোঁয়া লাগে, এমনকি লয়ও দ্রুত হয়।

তালের রূপান্তর

কীর্তন গানে ছোট লোফা, বড় লোফা, রূপক, যতি, তেওট, দোঠুকি, দশকোশী, দাশপেড়ে, শশীখের, বীরবিক্রম প্রভৃতি তাল ব্যবহৃত হয়। মৃদঙ্গ দিয়ে এসব তাল বাজানো যায়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি ময়মনসিংহ অঞ্চলে যেহেতু ঢোলের পরিবর্তে মৃদঙ্গ ব্যবহৃত হত, তাই ময়মনসিংহ অঞ্চলের কবিগানে

---

৮৮. যতীন সরকার, *বাংলাদেশের কবিগান* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫), পৃষ্ঠা ৫৫

৮৯. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ২০৬

এসব তাল ব্যবহৃত হত। নড়াইলের কবিয়াল বিজয়কৃষ্ণ সরকারের দলে সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী নামের একজন শিল্পী মৃদঙ্গ বাজাতেন, তাতে মনে হয় বিজয়কৃষ্ণ সরকারের কবিগানে মৃদঙ্গ সূত্রে ঐসব তালও অনুসৃত হত।[৯০]

অন্যদিকে উনিশ শতকের কবিগানের যেসব নমুনা ছাপা হয়েছে, তাতে পশতো, দক্ষিণি প্রভৃতি তালের উল্লেখ পাওয়া যায়। এসব তাল ঠিক কত মাত্রার তা উদ্ধার করা কঠিন। অন্যদিকে বিশ শতকের সূচনায় পূর্ববঙ্গ পর্বের কবিগানে যেসব তাল ব্যবহৃত হত, সেগুলো হল : দাদরা, কাহারবা, ঝাঁপতাল, সুরফাঁক, গড়খেমটা, একতালা, কাওয়ালি, পঞ্চম সোয়ারি, দশকুশি, কাশমারী, তেওট, রূপক প্রভৃতি। তালের বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গেও বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে আসছে।

ব্যবস্থাপনাগত পরিবর্তন

কোলকাতা পর্বে কবিগানের ব্যবস্থাপনা দুইভাবে নিয়ন্ত্রিত হত। কখনো কখনো কবিয়াল নিজে দল নিয়ন্ত্রণ করতেন, দলের লোকদের নিয়োগ দিতেন, তাদের প্রশিক্ষণ দিতেন, দলপতি হিসেবে তাদের সুখ-দুঃখের সাথি হতেন। পাশাপাশি যে সময়ে বিত্তবান লোকদের শখের দলও ছিল, যেখানে বিত্তবান লোকটি নিজের কবিগানের দলের মালিক থাকতেন, কবিয়াল নিয়োগ করতেন, দোহার নিয়োগ করতেন, বাদ্যযন্ত্রী নিয়োগ করতেন। কবিগান তখন খুব জনপ্রিয় থাকার জন্য কোনো একটা দল পরিচালনা করা তখন লোকসানের ব্যাপার ছিল না। উনিশ শতকের যেসব দল বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র কবিগান পরিবেশন করতেন, তার প্রায় সবগুলোই ছিল কবিয়াল-নিয়ন্ত্রিত দল।

পূর্ববঙ্গে পর্বেও কবিগানের এই দুই ধরনের ব্যবস্থাপনা চোখে পড়ে। ঢাকা-জয়দেবপুরে জমিদার কালীনারায়ণ নিজে শখের দল করলেও, নিকটবর্তী সময়ে ঢাকা এবং ময়মনসিংহের কবিগানের দলগুলো মূলত কবিয়ালকেন্দ্রিক ছিল। যশোরের তারকচন্দ্র সরকারের পিতা কাশীনাথ সরকার নিজে কবিগান পরিচালনা করতেন। সমকালে ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম অঞ্চলেও কবিয়াল-নিয়ন্ত্রিত দলই বেশি ছিল। উনিশ শতকের মতো বিশ শতকে পূর্ববঙ্গের কবিগানের জন্য এই অভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ শখের দল হলে অন্য বিত্তবান কেউ তার পরিচালক, কিন্তু পেশাদার হলে কবিয়াল নিজেই দলের পরিচালক।

কবিগানের সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ব্যবস্থাপনা চালু হয় বিশ শতকের প্রথমার্ধে পূর্ববঙ্গের ঝালকাঠিতে। ঝালকাঠি বর্তমানে একটি জেলা শহর। বাণিজ্যিক গুরুত্বের কারণে অনেকে তখন একে দ্বিতীয় কোলকাতা হিসেবে আখ্যায়িত করতেন।[৯১] সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবেও এটি বিখ্যাত হয়ে ওঠে। এখানে সব ধরনের লোকশিল্পীদের মিলনকেন্দ্র ছিল। এর ফলে এখানে ব্যতিক্রমী কিছু উদ্যোক্তার জন্ম হয়। তাঁরা যাত্রা, কীর্তন, কবি, রয়ানি, জারি, গাজি প্রভৃতি প্রায় সব ধরনের গানের দলের মালিকানা অর্জন করেন। এখানকার যাত্রার দল সারা বাংলাদেশে, এমনকি কোলকাতায় পর্যন্ত গান পরিবেশন করতে যেত। এই শহরের নট্ট অপেরার সুনাম এখনো এ অঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে ফেরে।

এই ব্যবস্থাপনার দেখাদেখি ঝালকাঠিতে কবিগানের পেশাদারি দল তৈরি হতে শুরু করে। কবিগানের এই পেশাদারি দলে একজন পরিচালক থাকতেন, যিনি বছরের শুরুতে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করতেন, দলের সব ধরনের শিল্পীর সঙ্গে চুক্তি করতেন, কবিয়াল নিয়োগ করতেন, চুক্তি অনুযায়ী সকলকে বেতন দিয়ে, নিজের ব্যবসায়িক লাভ তুলে আনতেন। অধিকাংশ সময়ে কবিগানের দলের পরিচালকের নামে কবিগানের দলের নাম হত। কখনো কখনো কবিয়াল যদি খ্যাতিমান হতেন, তাহলে কবিয়ালের নামেও দলের নাম পরিচিত হতে পারত।

---

৯০. নিরঞ্জন কুমার সরকার সম্পাদিত, *সুরেন্দ্র স্মরণিকা* (নড়াইল, শঙ্কর অধিকারী, ২০১০), পৃষ্ঠা ৭

৯১. *বাংলাপিডিয়া* (২০০৩), "ঝালকাঠি জেলা" ভুক্তি (ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি)

ঝালকাঠিতে কবিগানের এই ব্যবস্থাপনার আরো একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল, এসব ব্যবস্থাপক ছিলেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহিলা। রাঙা যামিনী, কালা যামিনী, সরলা প্রমুখ তখন এসব দল পরিচালনা করতেন। এসব মহিলার সামাজিক মর্যাদা ছিল না বললেই চলে। তবে এঁরা প্রায় সকলেই তখন বিশেষ বিত্তবান ছিলেন বলে সমাজের লোকজন এঁদের গৌণ করে দেখার সাহস পেত না। বরিশালের বিখ্যাত কবিয়াল শরৎ বৈরাগী, কুঞ্জলাল দত্ত, নকুলেশ্বর দত্ত প্রমুখ এঁদের দলে বেতনভোগী কবিয়াল হিসেবে কবিগান করতেন। বিশ শতকের শেষার্ধে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র কবিয়াল-নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনাই একমাত্র ব্যবস্থাপনায় পরিণত হয়।

বিষয়বস্তুর পরিবর্তন

কোলকাতা পর্বের কবিগানের সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন :

> "এ গান একই সঙ্গে গ্রাম্য গান, আবার নাগরিক শিল্প; লোকগীতির অন্তর্ভুক্ত, আবার ভব্যসাহিত্যেরও আত্মীয়; গীতাত্মক আবার কবিতাত্মক; দেবদেবীর লীলারসে পূর্ণ, আবারবাস্তব জীবনের রঙ্গরসে উতরোল; কখনও বিশুদ্ধ ভক্তির গান কখনও মানবীয় প্রীতিরসে পূর্ণ; কখনও সুস্নিগ্ধ মহত্ত-ব্যঞ্জক, কখনও অতি জঘন্য ইতরতায় পর্যবসিত।[৯২]

স্থান-কাল ভেদে কবিগানের এইসব বৈশিষ্ট্যের কোনো কোনোটা কখনো প্রধান হয়, আবার কোনো কোনোটা কখনো গৌণ হয়। এভাবেই মূল বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও কবিগানে নানা মাত্রায় পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

আঠারো শতকে কবিগানের বিষয় ছিল সীমিত। এ সময়ে ভবানী বিষয়ক গানে চণ্ডীদেবীর বিভিন্ন রূপকে বিষয়বস্তু করা হত। তার মধ্যে প্রাধান্য পেত দুর্গা এবং কালী। সখীসংবাদ বিষয়ক গানের বিষয়বস্তু ছিল রাধাকৃষ্ণের কাহিনি, সেখানে কৃষ্ণ, কৃষ্ণের মা যশোদা, কৃষ্ণের ভাই ও বন্ধুগণ, রাধা, রাধার আত্মীয়-স্বজন, সখীরা ও প্রতিদ্বন্দ্বী নারীরা বিভিন্নভাবে উপস্থাপিত হত। এছাড়া পৌরাণিক কাহিনি ও কবিয়ালদের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ নিয়ে পারস্পরিক আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ স্থান পেত খেউড় নামক অংশে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ কোলকাতা পর্বের কবিগানে এই অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটে। কালীবন্দনা গানের পাশাপাশি গৌরবন্দনাও কবিগানের অংশ হয়ে যায়। দুর্গা বিষয়ক গানও ভবানীবিষয়ক, সপ্তমী প্রভৃতি নামে জনপ্রিয়তা পায়। সখীসংবাদের পরিসর বৃদ্ধি পায়। সেখানে ভোর, গোষ্ঠ, মাথুর, বসন্ত প্রভৃতি নামের গান সখীসংবাদের অন্তর্ভুক্ত হয়। খেউড়ের পরিসর বাড়ে সবচেয়ে বেশি। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে, এ সময়ে শুধু পৌরাণিক প্রসঙ্গই নয়, সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রসঙ্গাদিও খেউড়ের বিষয় হয়। যেমন 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'-য় (১৮৬২) জমিদারি প্রথার পক্ষে ও বিপক্ষে খেউড় গান পরিবেশনের তথ্য জানা যায়।[৯৩]

উনিশ শতকের শেষ নাগাদ কবিগানের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট টপ্পা-পাঁচালি নামক অংশে গঠনগত কারণে খেউড়ের অনুরূপ বিষয়বস্তুর অনুপ্রবেশ ঘটে। তবে গাঠনিক কারণে টপ্পা-পাঁচালি অংশে পারস্পরিক বিতর্কের পাশাপাশি গল্পের আকারে বহু বিষয়ের অবতারণা হয়। সমকালের প্রায় সব ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও ধারণা এই অংশে প্রবেশ করে।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে পূর্ববঙ্গের কবিগান কোলকাতা পর্বের কবিগানকে পুরোপুরি ধারণ করে, পাশাপাশি নতুন অংশও সংযোজিত হয়। তবে এই পর্বের এক পর্যায়ে কবিগানের ধর্মসাপেক্ষ অংশগুলো ঝরে পড়তে থাকে। তার ফলে পৌরাণিক কাহিনির অনুপ্রবেশ থাকলেও কবিগান থেকে

---

৯২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৭

৯৩. কালীপ্রসন্ন সিংহ, *হুতোম প্যাঁচার নকশা*, (পুনর্মুদ্রণ; কোলকাতা : মনোমোহন প্রকাশনী, ১৯৮৩), পৃষ্ঠা ৩৯

কালী, দুর্গা ও রাধাকৃষ্ণের প্রাধান্য হ্রাস পায়। বিশ শতকের শেষার্ধে এই খণ্ডিত ধারা প্রাধান্য পায় এবং বিষয়বস্তু কম-বেশি ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে ওঠে। কবিগানের ধর্মসংশ্লিষ্ট অংশগুলোতে বিশ্বাসগত পরিবর্তনও ঘটে। কোলকাতা পর্বের কবিগানের শাক্ত এবং বৈষ্ণব বিশ্বাস প্রধান ছিল। উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গ পর্বেও শাক্ত এবং বৈষ্ণবীয় বিশ্বাসই প্রাধান্য বজায় রাখে। এমনকি এ সময়ে ময়নসিংহের মুসলমান কবিয়াল লাল মামুদও সেই বিশ্বাসের বাইরে গিয়ে কোনো গান রচনা করেননি। বিশ শতকে নাগাদ এর সঙ্গে যুক্ত হয় ইসলামি বিশ্বাস, খ্রিস্টীয় বিশ্বাস, বৌদ্ধধর্মীয় বিশ্বাস, এবং মতুয়া ধর্ম সংক্রান্ত বিশ্বাস। এইসব বিশ্বাস অনুযায়ী তখন কবিগানের বিভিন্ন অংশ যেমন ডাক, মালশি, সখীসংবাদ প্রভৃতি শ্রেণির গান রচিত হতে থাকে। মালশি গানগুলোর বিশেষত্ব হল, কালীর উদ্দেশে রচিত এইসব গানে সমকালীন সমাজের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থান পায়। মালশি গানে দেখা যায় কালী পরিণত হয়ে গেছে দেশমাতৃকায়। যেমন নড়াইলের বিজয়কৃষ্ণ সরকারের 'রূপসী বাংলার মালসী'। এখানে কালীর পরিবর্তে বঙ্গমাতাই কবির উদ্দিষ্ট।[৯৪]

দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন

কবিগানের অশ্লীলতার বিষয় সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা হল :

কোলকাতা পর্বের কবিগান খুব অশ্লীল ছিল, কিন্তু পূর্ববঙ্গের কবিগান অশ্লীলতামুক্ত। এই অশ্লীলতামুক্তির ব্যাপারে কার কতটা ভূমিকা ছিল, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া খুব কঠিন। তবে বিষ্ণুপদ বাগচীর দাবি, তারকচন্দ্র সরকার সর্বপ্রথম

> "কবিগানের মধ্য থেকে এই অশ্লীলতা-ব্যাধি দূর করতে সক্ষম হয়েছিলেন।'[৯৫]

হরিচরণ আচার্যের 'কবির ঝঙ্কার' বইয়ের ভূমিকায় বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লেখেন,

> "তিনি স্বীয় প্রতিভার যাদুমন্ত্রে নবভাবে কবিগানকে মার্জিত ও সংস্কৃত করিয়া নব রাগরাগিণীর অপূর্ব সংযোগে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। গান, ছড়া, প্রভৃতি সমস্তকেই তিনি অশ্লীলতা ও আবিলতামুক্ত করিলেন।"[৯৬]

কবিয়াল রমেশ শীলের জীবনী রচনা করতে গিয়ে সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদও বলেন, কবিগানকে 'প্রচলিত অশ্লীলতা' থেকে মুক্ত করেছিলেন রমেশ শীল।[৯৭]

বিজয়কৃষ্ণ সরকার সম্পর্কেও একই দাবি তোলেন মহসিন হোসাইন।[৯৮] তবে কোলকাতা পর্বের কবিগানের যেমন নমুনা সংগৃহীত হয়েছে এবং পূর্ববঙ্গ পর্বের যেসব কবিগান পাওয়া যায়, তার মধ্যকার রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় অভিন্ন। বিষয়ভেদেই তা কখনো অশ্লীল হয়ে ওঠে, আবার কখনো মার্জিত হয়। বস্তুত শ্রোতাদের রুচির ওপরে কবিগানের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর করে। শ্রোতারা যদি নারীবর্জিত হয়, আসর যদি হয় শ্মশানখোলার মতো নির্জন স্থান; পুরুষ কবিয়ালগণ সেখানে শ-কার ব-কারের মাত্রা বাড়িয়ে দিতেই পারেন, সেজন্য পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ অথবা উনিশ শতক ও বিশ শতক বিশেষ কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না।

কোলকাতা পর্বের সখীসংবাদের তুলনায় পূর্ববঙ্গ পর্বের কবিগান খানিকটা উন্নত রুচির হয়ে ওঠে বলে মনে হয়। মাত্র দুটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। প্রথমে উনিশ শতকীয় কবিয়াল রাম বসুর সখীসংবাদের এই গানটি লক্ষ করা যাক :

"একা রেখে যুবতীকে গেল দেশান্তর।
তার বিরহেতে প্রাণ আমার দহে নিরন্তর ॥

---

৯৪. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ২৭৯-২৮১
৯৫. বিষ্ণুপদ বাগচী, *তারকচন্দ্র সরকার*, পৃষ্ঠা ২৪
৯৬. বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, "ভূমিকা", *কবির ঝঙ্কার*, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-জ
৯৭. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, *রমেশ শীল* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮), পৃষ্ঠা ২৪
৯৮. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮), পৃষ্ঠা ২৭

সে বিনে এ যৌবন রতন, বলো রক্ষক কে করিবে রক্ষণ।
জানে না কমলকলি ফুটিবে মাসান্তে ॥"[৯৯]

নায়িকার যৌবনাবেগের সঙ্গে রজস্বলা হওয়ার ইঙ্গিতটি এখানে বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো। একই সঙ্গে যৌনতার ইঙ্গিত দিয়ে প্রেমিককে আকৃষ্ট করার চেষ্টা এখানে লক্ষণীয়। কিন্তু একই বিরহের বিষয় যখন পূর্ববঙ্গের কবিয়াল তারকচন্দ্র সরকার বা হরিচরণ আচার্য লেখেন, তখন তার মধ্যে এসব ইঙ্গিত প্রায় অনুপস্থিত থাকে। পরিবর্তে সেখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে প্রেম তথা প্রেমের জন্য ত্যাগস্বীকারের বিষয়। যেমন তারকচন্দ্র সরকারের সখীসংবাদের অংশ :

"বলিস বন্ধুর কাছে বিনয় করে বিরহিণী গেছে মরে,
শ্যাম তোমা বিহনে, আর চিন্তা নাই তোমার সনে,
লইয়া এক নতুন রানী সুখে থাকো নীলকান্তমণি
আমরা যতো গোপ-গোপিনী শুনে সুখে রবো বৃন্দাবনে ॥"[১০০]

অথবা হরিচরণ আচার্যের সখীসংবাদের কথা :
"সখী সেদিন কি আর ফিরে হবে, মনে মনে ভেবে দেখ তাই।
হা মরি কি মরি, যাতনা সইতে নারি, ইচ্ছা হয় বিষ খাই।
আমার কথা যদি সখী মনে হতো তার, করতো প্রেমের ব্যবহার।
না আসতে পারলে একান্ত, আমার মতো, সেও কানতো
পত্র লিখে সদা জানতো ব্রজের সমাচার ॥"[১০১]

কালভেদে দৃষ্টিভঙ্গির এমন পরিবর্তন অবশ্য সর্বত্র লক্ষণীয় হয় না। এর সঙ্গে ব্যক্তিভেদ এবং স্থানভেদ সম্পর্কিত থাকে। অনেক কবিয়াল একইসঙ্গে মধ্যযুগীয় মানসিকতা এবং আধুনিক সাম্যবাদী চেতনা ধারণ করেন। কবিগান এমন একটি গান যেখানে কবিয়ালদের সব সময়ে দ্বন্দ্বমূলক পটভূমিতে গান করতে হয়। তার ফলে জীবনের আদর্শ যাই হোক-না কেন, তাঁদের রচিত গানগুলো হয় বিভিন্ন আদর্শের। তাই রমেশ শীল সাম্যবাদী গান রচনা করার পাশাপাশি পাকিস্তানের আদর্শের গান যেমন রচনা করেন, একইভাবে বৈষ্ণবীয় আদর্শের গান, এমনকি মাইজভাণ্ডারী পীরের প্রতি নিবেদিত গানও তাঁকে রচনা করতে দেখা যায়। শেষোক্ত গানের সংখ্যা তাঁর অন্যান্য গানের চেয়ে বরং বেশ। কবিয়ালদের এই আদর্শিক দ্বন্দ্ব উনিশ শতকেও যেমন ছিল, বিশ শতকেও তা অব্যাহত থাকে। এমনকি একুশ শতকের সূচনাতেও এর অন্যথা হয় না।

দৃষ্টিভঙ্গি ও রুচির কথা গভীরভাবে বিচার করলে মনে হয়, কবিগানের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, কবিগানের গঠনগত ও বিষয়গত কারণেই তাঁরা খানিকটা রক্ষণশীল হয়ে পড়তেন। কথাটা ঘুরিয়েও বলা যায়, কবিগান যেহেতু ছিল সাধারণ মানুষের গান, তাই সব কালেই তা সাধারণ মানুষের মনের কথা বলে। সাধারণ মানুষের মধ্যে যেহেতু রক্ষণশীলতা অধিক পরিমাণে থাকে, অধিকাংশ কবিগান তাই রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিযুক্ত হয়। আধুনিকতার বিষয়টি বরং অধিকাংশ সময়ে হয় আরোপিত। রমেশ শীলের কবিগানের ক্ষেত্রে এ কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তাই তিনি নিজে থেকে যখন গান রচনা করেন, তখন তা ধর্মভাবের হয়, হোক তা হিন্দু বা মাইজভাণ্ডারী; কিন্তু কমিউনিস্টরা যখন তাঁকে ব্যবহার করেন, তখন তাঁর গান হয় শ্রেণিচেতনায় পুষ্ট। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে কবিয়ালকে অনুরোধ করা হলে তিনি যে কোনো আদর্শের গান গেয়ে শোনাতে পারেন। পাকিস্তানের জয়গান তিনি একই কারণে গেয়েছিলেন। গান গাওয়াই কবিয়ালের মূল লক্ষ্য, আদর্শ নয়।[১০২]

---

৯৯. প্রফুল্লচন্দ্র পাল, *প্রাচীন কবিওয়ালার গান* (কোলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮), পৃষ্ঠা ২৫২
১০০. সংকলিত, বিষ্ণুপদ বাগচী, *তারকচন্দ্র সরকার* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮), পৃষ্ঠা ৬২
১০১. হরিচরণ আচার্য, *কবির ঝঙ্কার*, ১ম খণ্ড (পুনর্মুদ্রণ, নরসিংদী : হরিপদ সাহা), ১৯৮৬
১০২. *স্বরোচিষ সরকার*, কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ২১৬

কোলকাতা পর্বের কবিগানের প্রতিপক্ষ কবিয়ালদের মধ্যে লড়াইয়ের ভাবই পূর্ববঙ্গ পর্বের কবিগানের চেয়ে প্রবল ছিল, তা নিঃসন্দেহে বলা যয়। এমনকি উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কবিগান যখন পূর্ববঙ্গে প্রবেশ করে, তখনো এই লড়াইয়ের মনোভাব অটুট থাকতে দেখা যায়। তবে কোলকাতার কবিগানের লড়াই পূর্ববঙ্গে প্রথমদিকে কিছুটা থাকলেও বাস্তব কারণে তা শেষ পর্যন্ত বাকযুদ্ধের মধ্যে সীমিত থাকে।

কবিয়ালদের পরিবর্তন :

উনিশ শতকের প্রতিষ্ঠিত কবিয়ালদের অধিকাংশেরই বাসস্থান ছিল কোলকাতা বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। যেমন, রাসু নৃসিংহের জন্ম ফরাসডাঙ্গার নিকটবর্তী গোন্দলপাড়া, হক ঠাকুরের কোলকাতার সিমুলিয়া, নিত্যানন্দ বৈরাগীর চন্দননগর, রাম বসুর কোলকাতার নিকটবর্তী শালিখা গ্রাম, ভোলা ময়রার কোলকাতার নিকটবর্তী গুপ্তীপাড়া (বাসস্থান কোলকাতার মগবাজার), এন্টনি ফিরিঙ্গির কোলকাতার মির্জাপুর। অন্যদিকে বর্তমান কালের কবিয়ালদের সবার জন্মই প্রত্যন্ত পল্লিতে। বড় কোনো শহরের কাছাকাছি তো নয়ই, এমনকি, মহকুমা শহর থেকেও দূরে। যেমন হরি আচার্যের নরসিংদীর কোনো গ্রাম, রমেশ শীলের 'কক্সবাজার যাবার পথে কর্ণফুলি নদীর দক্ষিণ তীর।' রাজেন্দ্রনাথ, বিজয়, নিশি, নকুল দত্ত সবার বেলায়ই একথা প্রযোজ্য। যুগের ব্যবধানে কবিয়ালদের জন্মস্থানের এই পরিবর্তনের সঙ্গে, কবিগানের রুচি এবং বিষয়বস্তু পরিবর্তনের সঙ্গতি থাকতে পারে। তৎকালীন কোলকাতা নগর হলেও অধিকাংশ নগরবাসীদের রুচি ও মূল্যবোধ গ্রাম্য ছিল। কবিয়ালদের বেলায়ও তাই দেখা যায়। অন্যদিকে বর্তমান কালের বাংলাদেশের শহর ও পল্লির প্রচুর ব্যবধান সত্ত্বেও প্রত্যন্ত পল্লির কবিয়াল পর্যন্ত অনেকক্ষেত্রে আধুনিক রুচি ও মূল্যবোধের পরিচয় দেন। শিক্ষার প্রসার, প্রচারমাধ্যম ও আধুনিক বিনোদন মাধ্যমসমূহের ক্রমান্বয়ে বিস্তৃতি হয়তো এর জন্যে দায়ী। এর ফলে কবিগান ও কবিয়ালদের কিছু বাহ্যিক পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। যেমন, অতীতের কবিগানের তেরো-চৌদ্দজন কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত লাল কাপড়ে ঢেকে, অনাবৃত দেহে, নূপুর পায়ে, পাখির পালকযুক্ত তেকোনা টুপি পরে আসরে নামতেন। বর্তমান পোশাকের এই অমার্জিত গ্রাম্য অবস্থা লোপ পেয়েছে। অবশ্য কবিয়ালদের শিক্ষাগত যোগ্যতার তেমন কোনো পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না। শিক্ষার ব্যাপক প্রসার সত্ত্বেও অধিকাংশ কবিয়ালদের আধুনিক শিক্ষাবিমুখ হতে দেখা যায়। বর্তমানে যাঁরা কবিগান পরিবেশন করেন বা শতাব্দীর গোড়ার দিকেও যাঁরা জীবিত ছিলেন এঁদের মধ্যে কেউ অতি সাম্প্রতিককালের তেমন কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত নন। বস্তুত, কেউ মাধ্যমিক পরীক্ষাও উত্তীর্ণ নন।

উনিশ শতকের কবিয়ালদের মধ্যে কেউ কেউ নিম্নবর্ণীয় হিন্দু থাকলেও অধিকাংশই উচ্চ-বর্ণ উদ্ভূত ছিলেন। বর্তমান শতকের কবিয়ালদের প্রায় সবাই-ই নিম্নবর্ণীয়-হিন্দু। বর্তমানে নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের এত অধিক পরিমাণে কবিয়ালের পেশা গ্রহণ করার পেছনে কিছু কারণ অনুমান করা যায়। শিক্ষার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রুচির পরিবর্তন ঘটে। নিম্নবর্ণীয় হিন্দুরা উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের তুলনায় আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ থেকে পশ্চাৎপদ থাকায় এদের রুচির বিকাশ কিছুটা ব্যাহত হয়। অন্যদিকে এই ব্যাহত বিকাশই কবিগান এবং কবিয়াল পেশা গ্রহণের পক্ষে অনুকূল ছিল। এই বিকাশহীনতাই সম্ভবত নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের এত অধিক পরিমাণে কবিয়াল-পেশার মতো এমন একটি অনাধুনিক পেশা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে।

বর্তমানে নিম্নবর্ণীয় হিন্দু কবিয়ালদের চিহ্নিত করা খুব সহজ নয়। এঁরা প্রায় সবাই-ই নিজ নিজ নামের শেষে পূর্বপুরুষদের পদবি ব্যবহার না করে তার পরিবর্তে 'সরকার' পদবি ব্যবহার করেন। বর্তমান বাংলাদেশে কবিয়ালদের যে 'সরকার' বা 'কবির সরকার' নামে চিহ্নিত করা হয়, এঁরা সম্ভবত সেখান থেকেই এ পদবি গ্রহণ করে থাকেন।

কবিগানের বিকাশকালীন সময়ের আলোচনা থেকে দেখা যায়, অন্যান্য লোকসংগীতের মতো স্থান-কালের ব্যবধানে কবিগানের নানা ধরনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটে। লক্ষ করা গেছে আঠারো

শতকের কোলকাতায় উঠতি মধ্যবিত্তের বিনোদন মাধ্যম হিসেবে কবিগানের উদ্ভব ঘটে, উনিশ শতক থেকে তা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পরে এবং ক্রমে বাঙালির সংস্কৃতির অন্যতম একটি উপাদানে পরিণত হয়। উদ্ভবকালে কবিগানের যে আদল তৈরি হয়েছিল, উনিশ শতকের কোলকাতাতেই তাতে নানা ধরনের পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে, সেই পরিবর্তিত কবিগান গ্রামবাংলায় জায়গা পায়। তবে পর্যাপ্ত পৃষ্ঠপোষকতা না থাকায় স্বাভাবিক কারণে কোলকাতার কবিগানের তুলনায় গ্রামবাংলার কবিগান খানিকটা দুর্বল হয়। তবে সময়ের ব্যবধানে গ্রামবাংলার কবিগানও সে দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠে। কালক্রমে গ্রামবাংলায় প্রতিভাবান কবিয়ালদের আবির্ভাব ঘটতে থাকে। কবিগানের পূর্ববঙ্গ পর্বে বেশ কয়েকজন অসাধারণ প্রতিভাবান কবিয়ালের আবির্ভাব হয়। একুশ শতকের সূচনা নাগাদ পূর্ববঙ্গ পর্বের এই কবিয়ালদের উত্তরসূরিরা বাংলাভাষী অঞ্চলগুলোতে তাঁদের কবিগান পরিবেশন অব্যাহত রেখেছেন।

কবিগানের এইসব পরিবর্তন শ্রোতাদের আর্থসামাজিক অবস্থা, তাদের জীবনদৃষ্টি ও রুচির পরিবর্তনের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত। কোলকাতা পর্বে কবিগানের শ্রোতারা ছিল প্রধানত বিত্তবান জমিদারশ্রেণি। তখন কবিগানের পেশা ছিল অত্যন্ত লাভজনক। ফলে কবিগানের নানারকম পরিবর্ধন ঘটে– কথায়, সুরে, যন্ত্রে এবং উপস্থাপনরীতিতে। বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ পর্বের কবিগানেও পায় অভিন্ন অবস্থা দেখা যায়। কারণ পূর্ববঙ্গ পর্বেও কবিগানের মূল শ্রোতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিল গ্রামীণ জমিদার ও অপেক্ষাকৃত বিত্তবান শ্রেণি। বিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ এবং সেইসঙ্গে নানা ধরনের মধ্যস্বত্বভোগীর বিলোপ কবিগানের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর বহু ধরনের পরিবর্তন সম্ভব করে তোলে।

কবিগান আর একবার প্রচণ্ড ধাক্কা খায় দেশবিভাগজনিত কারণে। পূর্ববঙ্গ পর্বে কবিগানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের বিত্তবান শ্রেণি। সাতচল্লিশের দেশভাগের পরে তারা দেশত্যাগ করায়, পূর্ববঙ্গের কবিগান পৃষ্ঠপোষকতা হারায়। কবিয়ালগণও দেশত্যাগ করতে শুরু করেন। কবিগানের সাধারণ শ্রোতারাও ব্যাপক হারে দেশত্যাগ করে এবং পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় অধিবাসী হয়। অনেক শ্রোতা পুনর্বাসিত হয় ভারতের বিভিন্ন অবাঙালি-অধ্যুষিত প্রদেশ, যথা– অন্ধ্র প্রদেশে, উত্তরাখণ্ডে ছত্তিশগড়ে, মহারাষ্ট্রে, অন্ধ্র প্রদেশে, উড়িষ্যায় এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। কবিগানের শ্রোতাদের এই দুরবস্থা কবিগান চর্চায় যেমন বাধা সৃষ্টি করে, কবিগানের গঠনের ওপরেও তা ব্যাপক প্রভাব ফেলে। কবিগানের শ্রোতাদের এই অভিবাসন প্রক্রিয়ায় শ্রোতারা গরিব হয়ে পড়ে, সঙ্গত কারণে তাদের কর্মব্যস্ততা বাড়ে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গে চর্চিত কবিগানের আয়তন হ্রাস পায়।

সাতচল্লিশোত্তর পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশেও কবিগানের অবস্থা সঙ্গিন হয়। সেখানে যেমন পৃষ্ঠপোষকদের অভাব দেখা দেয়, কবিগান চর্চার জন্য যে রাজনৈতিক স্থিরতা প্রয়োজন, তারও অভাব দেখা দিতে থাকে। সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিও অনেক সময়ে কবিগান চর্চায় সরাসরি বাধা সৃষ্টি করে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতি কবিগানকে পরিবর্তিত হতে বাধ্য করে। পশ্চিমবঙ্গের মতো তখন পূর্ববঙ্গের কবিগানও সংক্ষিপ্ত রূপ পায়। কবিগান যে কোথাও কোথাও জারি গান বা বিচার গানের মধ্যে ঢুকে পড়ে, সম্ভবত তা এই পরিবেশিত পরিবর্তনের ফল।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি বিহারীলাল চক্রবর্তী যে আধুনিক গীতিকবিতার সূত্রপাত করেন, তার বহু বৈশিষ্ট্য পূর্ববর্তী কবিগানের অনুরূপ। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' গ্রন্থের অনেক কবিতাকে সখীসংবাদের প্রভাবজাত বলে মনে হয়। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত কবিগানের ভাব, ভাষা, অলঙ্কার ও সুর দিয়ে প্রভাবিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'মনে রয়ে গেল মনের কথা' গানটির সঙ্গে রাম বসুর 'মনে রইলো সই মনের বেদনা' গানটি প্রতিতুলিত হতে পারে, একইভাবে হরু ঠাকুরের 'হেরি ধারাপথ থাকয়ে যেমতি তৃষিত চারকজনা' গানটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'আজি শরৎ তপনে প্রভাত স্বপনে' গানটি তুলনীয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকের যেমন জায়গায় শ্যামাকে নিয়ে গান রচনা করেছেন, সেসব ক্ষেত্রেও তিনি কবিগানের ভবানীবিষয়ক গান দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা কবিগানের ধারায় রমেশ শীলের ভূমিকা

দোলনা থেকেই আমরা সংগীতানুরাগী। মাতা-পিতা, ভাই-বোন, ও অন্যান্য স্বজন-সুজন-সুহৃদ-শুভার্থীদের মুখে মুখে গাথা-গল্প-ছড়া-কবিতা ও নানা গান শুনে অভ্যস্ত। আমাদের জীবনে সমাজে সাহিত্যে অনেক কিছুতে অনেক অনৈক্য থাকলেও সংগীতের প্রতি কোনো সচেতন ও সংস্কৃতিবান বিরাগ আছে বলে মনে হয় না। বাংলাদেশের গান, বাংলাদেশের রূপকথা বা লোককথা অথবা কিসসা, সবই ভারি মজার। শুধু এ দেশের মানুষই আমাদের মুখের গান শুনে মুগ্ধ হয়নি, অনেক বিদেশি গুণী মানুষও এই দেশের গান শুনে মুগ্ধ হয়েছেন। যুগে-যুগে কালে-কালে সংগীতের রূপমাধুর্য বিকশিত হয়েছে প্রবাহিত সময়ের বিদগ্ধ সংগীতগুণীজনদের আন্তরিক ভালোবাসাপূর্ণ সাধনার মধ্য দিয়ে। কবিয়ালরা গান গেয়ে আনন্দ পেতেন; মানুষকে গান শুনিয়ে আনন্দ দিতেন। এমনই একজন খ্যাতিমান কবিয়ালের নাম রমেশচন্দ্র শীল। বাংলাদেশের বাইরে পশ্চিম বাংলা ও আসামে রমেশ শীলের খুব খ্যাতি রয়েছে। রমেশ শীলের জীবনকাল দীর্ঘ ও ঘটনাবহুল।

রমেশ শীল বাংলা কবিগানের অন্যতম রূপকার। তিনি একাধারে যেমন ছিলেন সুরস্রষ্টা, তেমনি ছিলেন সংগীতজ্ঞ। কবিগানের লোকায়ত ঐতিহ্যের সাথে আধুনিক সমাজ-সচেতনতার সার্থক মেলবন্ধন ঘটিয়ে তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। রমেশ শীলের গান বাংলাগানের ধারাকে আরো নতুনত্ব ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে আলোকিত করে অনেক দূরে ও বিচিত্র পথে টেনে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। রমেশ শীলের সংগীতজীবন বহু বৈচিত্র্যময় অধ্যায় দ্বারা পরিবেষ্টিত। তাঁর সংগীতময় জীবন ও সাংগীতিক গুণাবলি উপলব্ধি করার লক্ষ্যে রমেশ শীলের জীবনপ্রবাহ আলোচনার করার প্রয়োজন রয়েছে।

জন্ম ও বংশপরিচয়

কবিয়াল রমেশ শীল ১৮৭৭ সালে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিভাগের বোয়ালখালি থানার অন্তর্গত গোমদণ্ডী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম চণ্ডীচরণ শীল। মায়ের নাম রাজকুমারী দেবী। এঁরা হিন্দু সম্প্রদায়ের 'নবশাখ' গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। 'নবশাখ' গোত্রের প্রামাণিক বা পরামানিকেরা নানা ধরনের কাজকর্ম করে তাদের সংসার চালিয়ে থাকে। যেমন, চুলকাটা। গোমদণ্ডীর শীলবাড়ির পরামানিকেরা চুলকাটার কাজ অর্থাৎ নাপিতের কাজ থেকে বিরত ছিলেন। তাঁরা দেশীয় পদ্ধতিতে মানুষের ফোড়া অপারেশন করতেন। সেই সাথে তাঁরা করতেন নানা রকমের টোটকা-ফাটকা কবিরাজি। গোমদণ্ডীর চণ্ডীচরণ শীল এক সময়ে গ্রাম্য চিকিৎসক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি অনেক অর্থকড়ির মালিক না হলেও বৈদ্য বা কবিরাজ খ্যাতি পেয়েছিলেন।সামান্য কিছু ধানের জমি, পুকুর ইত্যাদি ছিল তাঁদের। তবে সব মিলিয়ে আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না পরিবারে, কোনোরকমে খাওয়া-পরা চলত।[১]

রমেশ শীলের বাবার পৈতৃক নিবাস ছিল পার্শ্ববর্তী পটিয়া অঞ্চলে। চণ্ডীচরণ শীলের বাড়ি ছিল হাওলা এলাকার মধ্যে। এই এলাকাটি পরবর্তীকালে পরিচিত পায় পটিয়া নামে। আর গোমদণ্ডী হল রমেশ শীলের মামাবাড়ি। চণ্ডীচরণ শীল রাজকুমারীকে বিয়ে করে স্থায়ীভাবে শ্বশুরালয়ে নিবাস স্থাপন করেন। এভাবে গোমদণ্ডীই হল রমেশ শীলের নিজ গ্রাম।

---

১. মহসিন হোসাইন, *রমেশ শীল* (ঢাকা : যুক্ত, ২০০৯), পৃষ্ঠা ৮

রমেশ শীলের বাবা চণ্ডীচরণ শীল ছিলেন কবিরাজ। আর এজন্য কবিরাজ মশাইকে ঘুরতে হত বন-বাদাড়ে। চণ্ডীচরণ যখন বনৌষধি খুঁজতে যেতেন, কিশোর রমেশও তাঁর সঙ্গে যেতেন। কোনো কোনো দিন তাঁর সারাবেলা কাটত বনের ছায়ায় ছায়ায়। পাখির গান, গাছের দোলানি, সবুজ ধানক্ষেত শিশু রমেশকে নিয়ে যেত এক ভাবের জগতে। মাঠের উদাস করা কৃষকের গান তাঁর বড়ই ভালো লাগত। অতি চেনা পরিবেশও বারবার দেখতে চাইত মন। শৈশবেই রমেশ শীল গানবাজনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি কোথাও গানের আসর হবে জানতে পারলে আগেই হাজির হতেন সেই আসরে– সব জায়গায় দেখা যেত কিশোর রমেশকে।

শৈশব-কৈশোরে বাবা-মায়ের অত্যন্ত বাধ্যগত ছিলেন রমেশ। বড়দের স্নেহ, সমবয়সীদের বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা পেয়েছিলেন। অল্পেই তুষ্ট থাকার অভ্যাস গড়ে ওঠে তাঁর শৈশবেই। না পাওয়ার কোনো দুঃখ তাঁর ছিল না। কোনোভাবেই কারও ক্ষতি চিন্তা ছিল না তার মনে। সহজ সরল ও নম্র স্বভাবের অধিকারী ছিলেন রমেশ শীল। সবসময় নিজের মনে কী যেন ভাবতে ভাবতে আনমনা হয়ে ঘোরাফেরা করতেন। তাঁকে দেখলেই বোঝা যেত অন্য দশটি শিশুর মতো হলেও রমেশ এক ব্যতিক্রমী শিশু। রমেশ শীল শৈশব কাটিয়েছিলেন এক আনন্দময় পরিবেশে। প্রচুর অর্থকড়ি তাঁর বাবা-মায়ের না থাকলেও ছিল অন্তরের সুখ। পরবর্তী সময়ে রচিত রমেশ শীলের বেশ কয়েকটি পদ্য থেকে বুঝা যায় যে তাঁর শৈশব আনন্দময় ছিল। বিশেষত আবহমান বাংলার গ্রামীণ জীবনের লোকজ উপাদানগুলো তাঁর চিত্তে আনন্দের তান তুলেছিল। রমেশ শীলের রচনার মধ্যেই তাঁর শৈশবজীবন-চিত্র পাওয়া যায় :

... "হিন্দু আর মুসলমানে,মিলন ছিল প্রাণে প্রাণে
পরস্পর সুখে দুখে সাথী।
উৎসব কি পালপার্বণে, নানারকম বাদ্যগানে
আনন্দে কাটাতাম দিবারাতি।"...

তাঁর অন্য একটি কবিতায় দেখা যায় যে শৈশবে তিনি গাঁয়ে গাঁয়ে চারণের ছড়া, বাউলের গান, বৈরাগীর কৃষ্ণনাম, ভ্রমরের পুঁথিপাঠ, বিয়ের হ্যাঁলা, গাজীর পালা, বহুরূপীর অভিনয়, মহরমের জারী, দোলের হোলি, ঢাকীর গৌরীনাচ প্রভৃতির মুগ্ধ শ্রোতা ও দর্শক ছিলেন। স্বভাবতই লোকসংস্কৃতির এই ছন্দ ও সুর তাঁর কিশোরপ্রাণে অনুরণন তোলে।

সংগীতের প্রতি রমেশের আকর্ষণ দেখে বাবা চণ্ডীচরণ শৈশবেই কিনে দিয়েছিলেন 'বৃহৎ তরজার লড়াই' নামে একখানা বই। সেই বইয়ের গান নিজে নিজে গাইতেন চণ্ডীচরণ। আর সবার অজান্তে রমেশও তাতে তুলতেন সুর। এইভাবে রমেশ শীল শৈশবে নিজের অজান্তেই সংগীত-অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। এই অনুরাগই পরবর্তীকালে তাঁকে খুব বড় বড় মাপের সংগীতশিল্পী হয়ে উঠতে সহায়তা করে।[২]

শিক্ষাজীবন

কবিয়াল রমেশ শীলের শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছিল দুই উপায়ে। একটি হল, লৌকিক ধারায় অর্থাৎ পরিবারের বয়সী সদস্য ও প্রতিবেশীদের সহযোগিতায়। অন্যটি হল, সরকারি স্কুলে। জন্মের পরে রমেশ শীল একটি সাংস্কৃতিক পরিবেশ বেড়ে ওঠার সুযোগ পেয়ে যান। সেই পরিবেশটি ছিল বাধাহীন আনন্দের। বাবা চণ্ডীচরণ শীলের পারিবারিক পরিবেশ ছিল নিত্যদিনের ধ্যান, পূজা, আরাধনা আর তার সঙ্গে থাকত ভক্তিমূলক গান। শুধু গানই ছিল না, তাতে ছিল কথার রাজ্যি। কাহিনির জমকালো বর্ণনা।

রমেশের দিদিমা প্রতিরাতে বাড়ির আঙিনায় কখনও-বা ঘরের দাওয়ায় বসে ছোটদের নিয়ে আসর জমাতেন। সেই আসর ছিল গল্প-রূপকথার। রাতের আসরের শুধুমাত্র রূপকথারই চর্চা হত তা নয়।

---

২. মহসিন হোসাইন, *রমেশ শীল* (ঢাকা : যুক্ত, ২০০৯), পৃষ্ঠা ১০

রমেশ শীলের দিদিমা বলতেন রামায়ণের কাহিনি, বলতেন মহাভারতের কাহিনি। কোনো কোনো দিন উঠে আসত মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের বিরহের কাহিনি। এই কাহিনিগুলো যেমন ছিল রোমাঞ্চকর, তেমনি ছিল বীরত্বের। শুধু রমেশ নয়, পাড়া-প্রতিবেশী অন্যান্য ছেলে-মেয়েও সেইসব কাহিনি খুব মন দিয়ে শুনত।

রামায়ণের সীতার বনবাস শুনতে শুনতে কিশোর রমেশ হারিয়ে যেতেন অচেনা-অজানা লংকা দ্বীপে। সীতার দুঃখে কাতর হয়ে একসময় চোখের পানি ঝরাতেন। কখনও তাঁর শিশুমন উদাস হয়ে কল্পনা করত দণ্ডকারণ্য। দিদিমা'র গল্প বলার সহজ ভঙ্গি, নিজের ভাষায় মহাকাব্যের কাহিনি বলে যাওয়ায় রমেশ শীল বলা যায় কিশোরবয়সেই রামায়ণের ছোট-বড় সব ঘটনা আয়ত্তে আনতে পেরেছিলেন। দিদিমা'র কোলে ঘুমিয়ে না-পড়া পর্যন্ত রমেশ পৌরাণিক কাহিনিগুলো নিজের স্মরণশক্তি দিয়ে বেঁধে রাখতেন। মহাভারতের অজস্র ছোট-বড় কাহিনিও রমেশ শীল শিখেছিলেন তাঁর দিদিমা'র মুখ থেকে। দিদিমার স্মরণশক্তি ও গল্প বলার দক্ষতা ছিল সত্যিই অসাধারণ।

মহাভারতের কাহিনিগুলোর মধ্যে ছিল নানা রসের সমাবেশ। মহাভারতের কাহিনি শুনতে শিশু রমেশ শীল কখনও কখনও আনন্দে দিশেহারা হয়ে যেতেন, কখনও আবার হাসতে হাসতে লুটোপুটি খেতেন। কখনও ভয়ে মুখখানা তাঁর বিবর্ণ হয়ে যেত। তখন রেড়ির তেলের প্রদীপে রমেশের মুখ দেখলে বড়ই অসহায় মনে হত।

রমেশ শীলের লৌকিক শিক্ষা হয়েছিল ঘরের বারান্দা ও বাড়ির আঙিনায়। এই শিক্ষার ভিত্তিই তাঁকে পরবর্তীকালে একজন স্বশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এই মৌলিক শিক্ষাই তাঁকে এমন শিক্ষিত করেছিল যে তাঁর রচনায় মধ্য দিয়ে অতি সহজভাবে এসেছে বিভিন্ন ধর্মীয় ও পৌরাণিক মিথ, উপমা ও উৎপেক্ষা।

আমাদের দেশে ইংরেজশাসন শুরুর বেশ কিছুকাল পরেও হিন্দু-মুসলমানের শিক্ষা গ্রহণের জন্য ছিল পণ্ডিতের টোল ও মৌলভির মক্তব। অবশ্য কোথাও কোথাও উচ্চশিক্ষা গ্রহণেরও ব্যবস্থা ছিল। তবে রমেশ শীলের শিশুকালেই চট্টগ্রাম এলাকায় ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন হয়। সে সময় কোনো কোনো গ্রামে প্রাইমারি স্কুলও স্থাপন করা হয়। এরকম এক সরকারি প্রাইমারি স্কুলে পড়ার সুযোগ পেয়ে যান রমেশ শীল। চণ্ডীচরণ ও মা রাজকুমারী দেবী তাঁদের স্নেহের পুত্রকে লেখাপড়া শেখাতে ভর্তি করে দেন গোমদণ্ডী প্রাইমারি স্কুলে। তখন রমেশ শীলের বয়স মাত্র সাত বছর।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পরে শিশু রমেশ শীলের মধ্যে লেখাপড়া শেখার আগ্রহ ও কৌতূহল জাগে। প্রাথমক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে রমেশ নিয়মিত স্কুলে যেতে থাকেন। শিক্ষক ও পণ্ডিতমশাইয়েরা শিশু রমেশের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখান। তাঁর বাবা চণ্ডীচরণের কাছে ছেলের বিভিন্ন রকম সুবিধা-অসুবিধার কথা জানাতেন শিক্ষকেরা। বাবা-মা ও শিক্ষকেরা আশাবাদী ছিলেন, রমেশ লেখাপড়া শিখে একদিন বড় মানুষ হবেন।

কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে, রমেশের সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। রমেশ তখন মাত্র চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র, বাবার হঠাৎ মৃত্যুর তাঁর জীবনে নেমে এল অন্ধকারের ছোঁয়া। বাবার মৃত্যুর পর সংসারে উপার্জন করার আর কোনো লোক না থাকায় রমেশ শীলকে স্কুল ছাড়তে হল। লেখাপড়া শিখে বড় হওয়ার চিন্তাও একেবারে মিলিয়ে গেল ধোঁয়ার মতো। তার বদলে চোখে কান্না আর মাথায় বেঁচে থাকার চিন্তা। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার এখানেই ইতি ঘটে। তাঁর কবিতা থেকেই জানা যায় :

"এই হল শিক্ষা আমার
প্রাইমারি পরীক্ষা ভাগ্যে
না জুটিল আর।"[৩]

৩. মহসিন হোসাইন, *রমেশ শীল* (ঢাকা : যুক্ত, ২০০৯), পৃষ্ঠা ১৩

কর্মজীবনে প্রবেশের আগে রমেশ শীল অবশ্য আরেকটি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তবে এই শিক্ষা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নয়। এই শিক্ষা গ্রহণের জন্য তাঁর কোনো গুরু ছিল না। শিশু বয়সেই রমেশকে 'বৃহৎ তরজার লড়াই' নামে একটি বই কিনে এনে দিয়েছিলেন তাঁর বাবা। 'তরজা গান' হল তর্ক ও জবাবের মধ্য দিয়ে গানের আরম্ভ ও শেষ।

তরজার লড়াইয়ে ছিল 'পীর-মুরিদ', 'গুরু-শিষ্য', 'দিন-রাত', 'আলো-অন্ধকার' প্রভৃতি সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর। তরজার লড়াইয়ের সুর ও ছন্দ ছিল অপরিহার্য। এক সময়ে তিনি বাড়ির দেউড়িতে তরজা গান সুর করেন। সন্ধ্যার পরে কুপি জ্বালিয়ে তিনি কয়েকজন সঙ্গী-সাথি নিয়ে গান করতেন। এই আসরের শ্রোতা ছিল প্রতিবেশী কৃষকেরা। এই গান পরিবেশনের মধ্য দিয়ে রমেশ শীল সংগীতশিক্ষার সূচনা করেছিলেন।

ছোট বয়সেই বাবাকে হারিয়ে তিনি ও তাঁর পরিবার-পরিজন খুব অসুবিধায় পড়েন। কারণ পরিবারে রোজগার করার মতো আর কেউ ছিল না। জীবিকার কথা ভাবতে ভাবতে রমেশ একেবারে দিশেহারা হয়ে যান। রমেশ শীল এবার মাথা থেকে লেখা-পড়া, গান-বাজনা সব ঝেড়ে ফেলে রোজগার করার কথা ভাবতে থাকেন। কিন্তু অল্পবয়সী একটি শিশুর পক্ষে অর্থ উপার্জন করা খুবই কঠিন। বাবার মৃত্যুর আগেই রমেশ শীলের দাদামশাই মৃত্যুববণ করেছিলেন। তাই দিদিমা কৌশল্যা দেবী থাকতেন মেয়ে রাজকুমারীর কাছে। ছোট ছোট তিন বোন, মা রাজকুমারী দেবী ও দিদিমা কৌশল্যা দেবীকে নিয়ে বিরাট এই পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা খুব সহজ নয়, বিশেষত একজন শিশুর পক্ষে। তাঁর মায়ের যে সামান্য অলংকার ছিল তা বিক্রি করে সংসার চলতে থাকে। এই ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায় রমেশ শীলের রচনায় :

"আমিই বালক, চালক পালক
আমার আর কেহ নাই।
মায়ের অলংকার সম্বল আমার বিক্রি করিয়ে খাই।"[৪]

সামান্য সোনা বিক্রির টাকায় কত দিনই আর সংসার চলবে! তখন অভাবের তাড়নায় রমেশের পরিবারে দেখা দিল অশান্তি। অভিভাবক হিসেবে রমেশ নিতান্তই অসহায়। ফলে মায়ের, দিদিমা'র বকুনি আর অনাহার হল রমেশের নিত্যসঙ্গী। রমেশ শীল এবার কর্মজীবন শুরু করতে চান। যে কোনো একটি কাজ করে নিজে বেঁচে থাকতে চান, নিজের পরিবারকে বাঁচাতে চান। এমন সময় নানা মানুষের পরামর্শে রমেশ শীল রোজগারের চিন্তায় বার্মা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

রমেশ শীল এক রাতে গোমদণ্ডী থেকে পালিয়ে হাজির হলেন শাকপুরার এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়বাড়িতে। এই বাড়ির এক যুবকের সঙ্গে বার্মায় যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন রমেশ শীল। প্রথমে হাঁটাপথে ও পরে নৌকায় চড়ে রমেশ শাকপুরার যুবকটির সঙ্গে বার্মার সীমান্ত পার হয়ে চলে যান আকিয়াবে।

বার্মায় থাকাকালে রমেশ কোথায় থাকতেন, কী কী কাজ করতেন তা বিশদ জানা যায়নি। তবে জানা যায়, প্রথমজীবনে রমেশ কোনো একটি চুলকাটা সেলুনে কাজ করেন। এ সময় সোনার অলংকারের দোকানেও বেশ কিছুদিনের জন্য চাকরি করেছিলেন। এই চাকরিতে থাকাকালে রমেশের ফেলে আসা স্মৃতি, স্বপ্ন, সংগীত ও কাব্যরচনার কথা মনে পড়ে। রমেশ ফিরে আসতে চান তাঁর জন্মভূমি চট্টগ্রামের সবুজ প্রান্তরে।

পরিবারের চিন্তায় মনটা অস্থির হয়ে পড়ে। অসহায় তিনটি বোন, মা ও দিদিমা কী করছে ভেবে কাতর হয়ে পড়েন। সবাইকে দেখার জন্য ব্যাকুল হন। এমন সময় একদিন বঙ্গোপসাগরের বুকে দেখা দিল নিম্নচাপ। নিম্নচাপের প্রভাবে ভয়ংকর ঝড় শুরু হয়ে গেল। ঝড়ে অনেক প্রাণহানির সংবাদ

৪. মহসিন হোসাইন, *রমেশ শীল* (ঢাকা : যুক্ত, ২০০৯), পৃষ্ঠা ১৪

পাওয়া গেল। এই দুঃসংবাদ পৌঁছে গেল একদিন বার্মায়। কানে কানে রমেশ শীলের কাছেও পৌঁছাল খবরটি। স্বজনের চিন্তায় অধীর হয়ে তিনি ১৮৯৫ সালে স্বগৃহে ফিরে এলেন। মা, বোন ও দিদিমা'র দেখা পেলেন। প্রায় ৭ বছর পরে দেশে ফেরেন রমেশ শীল।

কর্মজীবন

বার্মা থেকে উপার্জন করা কিছু অর্থকড়ি দিয়ে রমেশ শীল সংসারের হাল ধরার চেষ্টা করলেন। তিনি বংশগত বৃত্তি কবিরাজি চিকিৎসাই শুরু করেন।অর্থাৎ গাছ-গাছড়া দিয়ে ওষুধ তৈরি বিক্রি করেন। এই পেশায় তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। কবিরাজি ছাড়াও রমেশ ছোটখাটো ব্যবসা ও চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে সহজ-সরল মনের অধিকারী বলে কোনো সৎ পেশাকে তিনি অবহেলা করতেন না বরঞ্চ শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতেন। শ্রমের বিনিময়ে বেঁচে থাকার জন্য তিনি কিশোরবেলা থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন। রমেশ শীল শুধু নিজেই হাতের কাজ করতেন না। অন্যকেও সৎ উপার্জনের ধারণা দিতেন। তবে তাঁর কর্মজীবনের সিংহভাগ জড়িত ছিল কবিগান পরিবেশনায়। যদিও প্রথমজীবনে তিনি গানকে শখের বিষয় বলে ধরে নিয়েছিলেন তবে পরে এটাই হয়েছিল তাঁর প্রধান পেশা।[৫]

কবিগান রচনা, কবিগানের বায়না রক্ষা– সবই ছিল রমেশ শীলের কর্মজীবনের সিংহভাগ। গান-বাজনাকে তিনি শেষপর্যন্ত পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তবে কবিয়াল রমেশ শীল আনুষ্ঠানিকভাবে কারও কাছ থেকে কবিগান শিখেছিলেন এমন তথ্য নেই। তিনি সমবয়সীদের সঙ্গে বিভিন্ন এলাকায় কবিগান শুনতে যেতেন। আর বাড়িতে ফিরে কুপির আলোয় বাড়ির উঠানে বন্ধুদের নিয়ে আসরে শুনে আসা কবিগান গাইতেন। এই সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কবিগান খুব জনপ্রিয় ছিল। রমেশ শীলের কর্মজীবনের আরেকটি অধ্যায় আছে। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে কবিতা গ্রন্থ রচনা করে প্রকাশ করেছিলেন। এইসব কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা সঠিকভাবে জানা যায়নি। অনেকগুলো নষ্ট হয়েছে। আবার কয়েকটি বিক্ষিপ্তভাবে অপ্রকাশিত রয়েছে।

কবিরাজি চালাতে গিয়ে রমেশ শীলকে বন-বাদাড়ে ঘুরতে হত। সেখান থেকে খুঁজে খুঁজে আনতে হত বিভিন্ন রকমের গাছ-গাছড়া। সেই গাছ-গাছড়াকে শিল-নোড়ার সাহায্যে পিষতে হত। তা আবার নানাভাবে আগুনে সিদ্ধ করা হত। এই কাজগুলো করতেন রমেশ শীলের মা রাজকুমারী দেবী। রাজকুমারী দেবী এক সময়ে বয়সের ভারে অচল হয়ে পড়লেন। তখন পরিবারের সবাই একজন নতুন মানুষের কথা ভাবলেন, মা, বোন, দিদিমা ও অন্য আত্মীয়-স্বজনেরা রমেশ শীলকে বিয়ে দিতে চাইলেন। পরবর্তীতে অপূর্ব বালার সাথে রমেশের বিয়ে ঠিক হয়। অপূর্ব যেমন সুন্দরী ছিলেন তেমনি ছিলেন বিনয়ী। রমেশ শীলের ২৩/২৪ বছর বয়সে বিয়ে হয়।

অপূর্ব বালা নতুন সংসারে এসেই সব দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। বিরামহীন শ্রম ও যত্ন দিয়ে সংসার গুছাতে লাগলেন। অপূর্ব শুধু সংসারের কাজেই ব্যস্ত থাকলেন না। স্বামী রমেশ শীলের সঙ্গে থেকে গাছ-গাছড়া দিয়ে ওষুধ তৈরি করতেও শিখলেন। রমেশের তাতে খুব সাহায্য হয়। সংসারে আয় বাড়ল।

অপূর্ব বালার গর্ভে প্রথমে এক কন্যাসন্তান জন্ম নেয়। তার নাম রাখা হয় শৈলবালা। এরপর জন্মগ্রহণ করল তিনটি পুত্রসন্তান। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনটি ছেলেই অল্পদিনের ব্যবধানে মারা গেল। বেঁচে রইল কেবল মেয়ে শৈলবালা। পুত্রসন্তানদের অকাল মৃত্যুকে রমেশের স্ত্রী অপূর্ব বালা কোনোভাবে মেনে নিতে পারলেন না। তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেন। সংসারের প্রতি তার কোনো আকর্ষণ রইল না। অপূর্ব অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় রমেশ শীলের সংসারে আবার নানা সমস্যা দেখা দিল। সংসার অচল হয়ে পড়ল। অনেক চিকিৎসা করা হল কিন্তু অপূর্ব আর ভালো হলেন না।

---

৫. মহসিন হোসাইন, *রমেশ শীল* (ঢাকা : যুক্ত, ২০০৯), পৃষ্ঠা ১৬

এই সময়ে তিনি কবিরাজি ছেড়ে কবিগানের পেশা শুরু করেছেন পুরোপুরি। চারদিক থেকে নতুন নতুন গানের আসরের বায়না আসে। সংসারে অসুস্থ স্ত্রী আর শিশুকন্যা শৈলবালা। ওদিকে রমেশ শীলের মা-ও পরলোক গমন করেছেন। শৈলবালার কষ্টের সীমা নেই। রমেশ শীল বুঝতে পারলেন শৈলবালার দেখাশোনা ও সংসার চালাতে একজন গৃহিণী অত্যন্ত প্রয়োজন।

১৯২০ সালে রমেশ শীল দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। মোজাফ্ফরাবাদ গ্রামের গুরুদাস শীলের মেয়ে অবলা তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী হলেন। বিয়ের পরে অবলা নিজের করে নিলেন সংসারের সকলকে। নতুন স্ত্রীর উৎসাহে রমেশ শীল নতুন করে গান রচনায় ও কবিগান পরিবেশনায় মন দিলেন। রমেশ শীল তাঁর সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, দ্বিতীয় বিয়ের পরে আঞ্চলিক গান রচনা ছাড়াও তিনি প্রেমের গান রচনায় হাত দিয়েছিলেন। জানা যায়, কবিগানের কবিয়ালদের মধ্যে এই ধরনের রচনা রমেশ শীলই প্রথম করেছিলেন। এই গানগুলো আজও মানুষের মুখে মুখে শোনা যায়। রমেশ-অবলার সংসারে একে একে পাঁচটি সন্তানের জন্ম হয়। এরা হলেন : দীনবালা শীল, বিশ্বেশ্বর শীল, যজ্ঞেশ্বর শীল, বনমালী শীল, পুলিনবিহারী শীল।

রমেশ শীল তাঁর ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য বিশেষ যত্নবান ছিলেন। ছেলেমেয়েদের তিনি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করানোর জন্য পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের সাধ্যমতো লেখাপড়া শিখতে চেষ্টা করেছিলেন। তবে খুব বেশিদূর এগোতে পারেননি। ছেলেদের মধ্যে বাবার অনুসারী হয়েছিলেন বিশ্বেশ্বর ও যজ্ঞেশ্বর শীল। তাঁরা দুজনই বাবা কবিয়াল রমেশ শীলের কাছ থেকে কবিগান শিক্ষাগ্রহণ করেন। পারিবারিক পরিবেশের কারণে রমেশের দুই ছেলে কবিগান শিখে খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। বাবার পরিচিতির কারণে তাঁদের কাছেও অনেক বায়না আসত।[৬]

সংগীতজীবন

কবিয়াল রমেশ শীলই কবিগানের রাজ্যে নতুন পথের ও মতের উদ্ভাবক এবং সম্প্রসারক। তিনি অনেক প্রাচীন নিয়মকে ভেঙে, কেটে-ছেঁটে নতুন এবং আধুনিক রীতি-পদ্ধতি প্রচলন করে কবিগানকে নিয়ে আসেন সর্বস্তরের গণমানুষের হৃদয়রাজ্যে। কবিয়াল ও কবিগানের রাজ্যে তিনি একাই একশ'। বাংলাদেশের কোনো কবিয়ালই রমেশ শীলের মতো এত বেশি গান করেননি এবং এত খ্যাতির অধিকারীও হতে পারেননি। বাংলাদেশের প্রতিটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে তিনি অসংখ্য গান গেয়েছেন। তাই বাংলাদেশের সর্বত্র তিনি সমধিক পরিচিত ও প্রশংসিত।

১৮৯৭ সালে রমেশ প্রথমবারের মতো চট্টগ্রাম শহরের সদরঘাট এলাকায় জগদ্ধাত্রী পূজায় কবিগানের পালা দেখতে আসেন। সেদিনের কবিগানের পালায় দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কবিয়াল চিন্তাহরণ সরকার ও কবিয়াল মোহন বাঁশি সরকার। দুই কবিয়ালের লড়াই তিনি দারুণ উপভোগ করলেন। এঁদের গান শুনতে শুনতে গানের পদের সঙ্গে পদ মিলিয়ে গান করার স্বপ্ন দেখেন। রমেশ শীল ভাবেন তিনিও বড় কবিয়াল হবেন।

পরবর্তীকালে কবিয়াল প্রদত্ত স্বীকৃতি অনুসারে এ সময়ে পদ্য তৈরির নেশা তাঁর নাওয়া-খাওয়া ভুলিয়ে দিয়েছিল। রমেশ শীল তাঁর জীবনের প্রথম পদ্য রচনা করেন এ সময়েই। তখন চট্টগ্রাম শহরের সঙ্গে দোহাজারীর রেললাইন বসতে শুরু করেছে। লাইন বসানোর জন্য অনেক গরিব কৃষকের ধানের জমি দখল করে নেয় রেল কর্তৃপক্ষ। ভিন্ন জেলার ব্যবসায়ীরা এ সময়ে কর্ণফুলী নদীর তীরে কলকারখানা বসাতে শুরু করেন। এই পটভূমিতে রুষ্ট রমেশ শীল রচনা করেন :

> "গুণীগণ পদপুগে করি নিবেদন,
> চট্টগ্রাম শহরের কিছু করিব বর্ণন।

৬. মহসিন হোসাইন, *রমেশ শীল* (ঢাকা : যুক্ত, ২০০৯), পৃষ্ঠা ১৯

দেশে গেল আসিল একে হল
সর্বনাশের মূল।
সেই অবধি চট্টগ্রামী লোকের
নাই আর কুল।
আর দেখি নদীর পাড়ে হয় কারবার,
অনেক দেখতে পাই,
দেশের লোকের যায়গা ছিল
এখন কারও নাই।

শুন আর এক বিবরণ,
জ্বলে মন উঠিলে মনেতে,
হাজী নসু মালুম ছিল মাদারবাড়িতে
কি কব তার গুণের কথা
যথা তথা আছয়ে প্রকাশ,
মক্কা গিয়া হজ করিয়া পাপ করিব নাশ।"[৭]

রচনাটি খুব সুসংহত ছিল না, কিন্তু এই সৃষ্টির আনন্দ রমেশ শীলকে গভীরভাবে আন্দোলিত করে। তিনি তাঁর সঙ্গীদের প্রায়ই এই রচনাটি পাঠ করে শোনাতেন।

রমেশ শীলের প্রথম কবিগানে অংশগ্রহণের সুযোগ আসে অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে। ১৮৯৮ সালে রমেশ শীল বন্ধুবান্ধবসহ কবিগান শুনতে যান সদরঘাটের জগদ্ধাত্রী পুজোয়। দুই কবিয়াল চিন্তাহরণ আর মোহনবাঁশীর মধ্যে কবির লড়াই। গানের শুরুতেই হঠাৎ করে বৃদ্ধ কবিয়াল চিন্তাহরণের গলা বসে গেলে আসরে স্বভাবতই প্রবল বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। তখন উদ্যোক্তারা ঘোষণা করলেন আসরে আর কেউ কবিয়াল থাকলে যেন মঞ্চে যায়।

রমেশ শীলের বন্ধুরা জোর করে তাঁকে মঞ্চে তুলে দিল। সেদিনের কবিগানের বিষয় ছিল শূর্পনখা ও মধুদৈত্য। রামায়ণের সূত্র ধরে তৈরি কাহিনি– রাবণ-ভগ্নি শূর্পনখা নির্জন বনে প্রেম নিবেদন করছেন ভগ্নিপতি মধুদৈত্যকে। মোহনবাঁশী নিয়েছেন মধুদৈত্যের পক্ষ আর রমেশ শীলকে দিলেন শূর্পনখা। মোহনবাঁশীর জন্য অচেনা নতুন কোনো কবিয়ালের সঙ্গে গান করা খুব সম্মানজনক নয়, পরিস্থিতির চাপে পড়ে তিনি মেনে নিলেন। তাঁর সব রাগ গিয়ে পড়ল রমেশ শীলের ওপর। দুরু দুরু বুকে আসরে আসা রমেশ শীলকে পরিচয় দানের পালাতেই প্রতিষ্ঠিত কবিয়াল 'পুঁচকে ছোড়া' ও 'নাপিত;– বলে অশোভনভাবে আক্রমণ করলেন। চাইলেন নবাগত কবিয়ালকে প্রথমেই ঘাবড়ে দিয়ে জয়ী হতে। কিন্তু এই বিদ্রূপে রমেশ উত্তেজিত হলেন না। রমেশ শীল অত্যন্ত বিনীতভাবে পদ দিলেন :

"উৎসাহ আর ভয়
লজ্জাও কম নয়
কেবা থামাইবে কারে?
পুঁচকে ছোঁড়া সত্য মানি
শিশু ধ্রুব ছিল জ্ঞানী।
চেনা-জানা হোকনা এ আসরে।"...

সেদিন তর্কের শুরুতে রমেশ শীলের যুক্তি ও ভাষা ছিল দুর্বল। মোহনবাঁশী জন্মগতভাবে ছিলেন জলদাস, চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় 'ডোম'। ডোমের সঙ্গে লোম, শালার সঙ্গে মালা, এ ধরনের দুর্বল ছন্দ দিয়ে পদ রচনা করেন রমেশ শীল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যুক্তি ও উপস্থাপনা

৭. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, *রমেশ শীল* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭), পৃষ্ঠা ১৩

আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। দেখা গেল, সারারাত, এবং পরের সারাদিন কেটে সন্ধ্যা নামছে, অথচ মোহনবাঁশী হারাতে পারছেন না নতুন কবিয়ালকে। তখন উদ্যোক্তারা আপোসমূলক জোটক দিয়ে কবিগানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। শ্রোতারা রমেশ শীলকে কিছু অর্থও দান করেন পুরস্কারস্বরূপ। চাঁটগার ভাষায় কবিগানকে বলা হয় 'কবির সরকার'। উল্লেখিত কবিগানের পর সমস্ত চাঁটগায় রমেশ শীলের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে 'নতুন কবির সরকার' নামে।

কবিগানের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে একজন গুরুর প্রয়োজন অনিবার্য ও অপরিহার্য। রমেশ শীল তাই ১৮৯৯ সালে কধুরখীলের প্রবীণ কবিয়াল নবীন চক্রবর্তী-র সংস্পর্শে আসেন ও শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গাজীর গীত, ঢপকীর্তন, পালা কীর্তন, কবিগান, যাত্রাগান, যাত্রাভিনয়, পালাগান, বৈঠকী গান ইত্যাদি কঠোর অনুশীলন করে রপ্ত করেন। নিয়মিত শাস্ত্রপাঠ, বাংলা কোরআন, বাইবেল, ত্রিপিটক, দোহারগিরি দিয়ে তাঁর কবিয়াল জীবনের সূত্রপাত করেন।

এ সময় এক চ্যালেঞ্জ করা কবিগানে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ লাভ করেন রমেশ শীল। তাঁর বিপক্ষে তিনজন কবিয়াল– দুর্গাচরণ জলদাস, প্রাণকৃষ্ণ জলদাস ও অপর্ণাচরণ আচার্য। উদ্যোক্তারা ঘোড়ার গাড়িতে করে নিয়ে যান রমেশ শীলকে। একে একে তিনজন কবিয়ালকেই বাকযুদ্ধে পরাজিত করেন রমেশ শীল। উদ্যোক্তারা তাঁকে সম্মানী হিসেবে দেন আট টাকা, শ্রোতারা দেন পাঁচ টাকা। এই জয় রমেশ শীলের মনে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। তিনি স্থির করেন, কবিগানকে বেছে নেবেন জীবনের পেশা রূপে। কবিগানের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের দিকটিও তাঁর এই সিদ্ধান্তে প্রভাব বিস্তার করেছিল। রমেশ শীল গান রচনা ও পরিবেশন করে দ্রুতই সুনাম কুড়াতে সক্ষম হলেন। নতুন নতুন বিষয় সংযোজনের কারণে চারিদিকে তাঁর চাহিদা বেড়ে গেল। এ সময় থেকেই রমেশ শীল চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থান থেকে নিয়মিত কবিগানের বায়না পেতে শুরু করেন।[৮]

বিশ শতকের প্রথম দশকেই সারা ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশবিরোধী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ তীব্র হয়ে ওঠে। বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু কুখ্যাত পুলিশ-কর্মকর্তা টেগার্টকে হত্যা করতে গিয়ে ধৃত হন এবং ফাঁসিকাষ্ঠে আত্মদান করেন। এই ঘটনা রমেশ শীলকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর করে তুলেছিল। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসির খবর উপলক্ষ করে লিখিত কবিতা, গান রচনা ও পরিবেশন করেন। কবিয়াল রমেশ শীলের দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ পদ্য এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত :

"ধন্য ছেলে মায়ের কোলে
একা গেলি চলে।
থাকতে তেত্রিশ কোটি ভ্রাতা, সঙ্গী ফেলে
একা হল ক্ষুদিরামের ফাঁস।
মোরা যত বঙ্গবাসী শোকনীরে ভাসি
নরেন গোঁসাই হর স্বার্থের দাস।
কানাইলাল সত্যেন বোসে দোষী হল
দেশকে ভালবেসে,
উভয়ের গলায় পড়ল ফাঁস
ভাবি বুদ্ধির কি কৌশল,
কাঁঠালে পিস্তল নিয়ে
করল দেশের শত্রুর জীবন নাশ।"

দুই পুঁজিবাদী যুদ্ধজোটের মধ্যে সংগঠিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ভারতীয় উপমহাদেশে বিরূপ আর্থ-সামাজিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসনে রিক্ত ব্রিটিশ ভারতের কঙ্কালরূপ মানুষের চোখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিপত্রের অস্বাভাবিক মূল্য সাধারণ মানুষকে দিশেহারা

৮. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, *রমেশ শীল* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭), পৃষ্ঠা ১৫

করে তোলে। শস্যশ্যামল চট্টগ্রামেও তার প্রভাব পড়ে। এই সময়ে রমেশ শীল মানুষের হাহাকারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে রচনা করেন :

...“পাঁচ গজ ধুতি সাত টাকা
দেহ টেঁকা হয়েছে কঠিন
রমেশ কয়, আঁধার মরি
পাই না কেরোসীন।”[৯]

বিশের দশকে অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউয়ে জেগে উঠেছিল চট্টগ্রাম। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত আর মাস্টার কাজেম আলীর নেতৃত্বে চট্টগ্রামবাসী অসহযোগ আন্দোলনে গ্রহণ করেছিল এক গৌরবময় ভূমিকা। চট্টগ্রামের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তখন সরকারি স্কুল-কলেজ ত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছে রাজপথে। লালদিঘি ময়দান ও প্যারেড মাঠে বিলিতি চাদর-কাপড়ে আগুন দেয়া তখন নৈমিত্তিক দৃশ্য। এ আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত অভিভূত হয়ে বললেন, Chittagong to the fore. রমেশ শীলও সক্রিয় অংশ নেন এ আন্দোলনে। জাতি ও দেশের সমসাময়িক সমস্যা নিয়ে তাঁর রচিত অসংখ্য গান রয়েছে। যেসব গান মানুষকে উৎসাহ দিয়েছে, প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে, সাহস দিয়েছে। এসব গানের কিছু অংশ তুলে ধরা হল :

...“জেগে উঠ বাঙ্গালী ভাই কেন অচেতন,
দুরন্ত শ্বেতাঙ্গের হাত হতে বাঁচাতে জীবন।
মাস্টার কাজেম আলী আর সেনগুপ্ত
জন্মভূমি করিতে মুক্ত
তাদের মত দেশভক্ত ভারতে কয়জন।”

অসহযোগ আন্দোলনের পাশাপাশি মওলানা শওকত আলী ও মওলানা মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে শুরু হয় খেলাফত আন্দোলন। যদিও খেলাফত আন্দোলনের ঘোষিত লক্ষ্য ছিল তুরস্কের স্বাধীনতা ও খলিফাকে রাজত্ব প্রদান, কিন্তু ভারতে তা প্রবল ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। চট্টগ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁরা উৎসাহের সঙ্গে যোগদান করেন খেলাফত আন্দোলনে। রমেশ শীলও তাতে উৎসাহিত হয়ে রচনা করেন :

“আমাদের চোখ ফুটেছে, মুখ ফুটেছে,
হিন্দু মুসলিম আমরা ভয় করি না।
ব্রিটিশ নিল দেশ লুটিয়ে
উঠছে মোদের চোখ ফুটিয়ে
আমরা কি থাকব চেয়ে
কুকুর খাবে দুধের ছানা।...
খলিফাকে গদি দিবি, নয়ত এবার বিলাত যাবি
এই দুইটার একটা হবে, হিন্দু-মুসলিম মাফ করবে না।”

অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের পাশাপাশি চট্টগ্রামে ১৯২১ সালে এক অভূতপূর্ব রেল-ধর্মঘট পালিত হয়। অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিতে আসাম অঞ্চলের চা-শ্রমিকরা তাদের ওপর শোষণের প্রতিবাদ চা-বাগান ত্যাগ শুরু করে। এ সময় করিমগঞ্জে রেলওয়ের কর্তাব্যক্তিরা শ্রমিকদের রেলের টিকেট প্রদানে বাধা সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত টিকেট কেটে রওনা হলে তাদের মধ্যে সহস্রাধিক শ্রমিকদের চাঁদপুরে আটকে রাখা হয়। এর প্রতিবাদে দেশ-প্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নেতৃত্বে শুরু

৯. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, *রমেশ শীল* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭), পৃষ্ঠা ১৬-১৭

হয় আসাম-বেঙ্গল রেল ধর্মঘট। যতীন্দ্রমোহন বাড়িঘর বন্ধক দিয়ে রেল-শ্রমিকদের জন্য খোলেন বারোয়ারি রন্ধনশালা। রমেশ শীল সেই ধর্মঘট নিয়ে গান লেখেন। তার কিছু অংশ তুলে ধরা হল :

"আর যায় না চুপ করে থাকা,
যতীনবাবুর নেতৃত্বেতে বন্ধ হবে রেলের চাকা।
মজুরদের একতার জোরে,
রেলের বিটে মরিচা পড়ে,
আমার রক্তে উদর পুরে
আমাকে ড্যাম ব্লাডি ডাকা"...

১৯২৩ সালে রমেশ শীলের জীবনে ঘটে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। চট্টগ্রামের নাজিরহাটের নিকটবর্তী মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের পীর গোলাম রহমানের খ্যাতি তখন চট্টগ্রামের নিকটবর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতি বছর মাঘ মাসের ওরশে মাইজভাণ্ডারে তখনও প্রচুর লোকসমাগম হত। এ বছর রমেশ শীল প্রতিবেশী সারদা চরণের সাথে প্রথম মাইজভাণ্ডারে যান। রমেশ শীল মাইজভাণ্ডার পৌঁছার পর তিনি আবেগপ্রবণ ও ভাবাপ্লুত হয়ে পড়েন। দরবারের পীরের প্রথমদর্শনই তাঁকে মোহাবিষ্ট করে ফেলে। তাঁর ভাষায় :

...'দেখলাম গদির উপরে উলংগ অতি উজলবরণ এক পুরুষ নির্বাক। সিদ্ধ বলে মেনে নিলাম। সেইখানে গানগুলি ভাষা নাই দেখে গান তৈরি করলাম।'...[১০]

অন্যত্র তিনি লিখেছেন :

'হযরত গাউচুল আজম কেন যে আমার মতন নিরক্ষর লোকের উপর এমন মহান কাজের ভার দিলেন তাহা তিনিই জানেন।...

তথায় উপস্থিত হওয়া মাত্র প্রাণ যেন কী একটা অনির্বচনীয় আনন্দ হিল্লোলে খেলিতে লাগিল এবং কে যেন কানে কানে বলিল, রমেশ এই মাইজভাণ্ডারের ভক্তগণকে তোর গান শুনাইতে হইবে। প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, শরীর আড়ষ্ট হইল।'

রমেশ শীল সুফিবাদের সাধনকেন্দ্র মাইজভাণ্ডার শরিফে গেলেন। সেখানে মানবতাবাদী জীবনাদর্শ তাঁকে আকৃষ্ট করে। তাঁর গাওয়া ও রচিত মাইজভাণ্ডারী গান এখনো ভক্ত, অনুরক্তসহ মানুষের মুখে মুখে ফেরে। রমেশ শীল ছিলেন মাইজভাণ্ডারী গানের দিকপাল। মাইজভাণ্ডারী ভাবধারার আলোকে তাঁর রচিত মরমী গীতিকাব্য শৈলী ও সুরের মূর্ছনায় সুফি জীবনদর্শনের অভিব্যক্তি ছুঁয়ে দিয়েছে সমাজের সকল পেশা-শ্রেণি মানুষের। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় রমেশ শীলের অবদান জাতি-ধর্মের গণ্ডি ছাড়িয়ে ধারণ করেছে বিশ্বমানবতার বাণী। তাঁর গানের একটি অংশ তুলে ধরা হল :

"ও নিদানের বন্ধু আমার গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারী
আমি যে দিকে চাই সে দিকেতে তোমায় হেরি মাইজভাণ্ডারী"

মাইজভাণ্ডারের গানের আদি স্রষ্টা রমেশ শীল না হলেও তিনি নিশ্চিতভাবেই মাইজভাণ্ডারী গানের নবযুগের স্রষ্টা। ১৯২৩ সালেই তিনি মাইজভাণ্ডারের ওপর গান রচনা শুরু করেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় যে রমেশ শীল একটানা সাত বছর এ-জাতীয় গান রচনা করেছিলেন। রমেশ শীল নিজে প্রতি বছর মাইজভাণ্ডারের ওরশে উপস্থিত হয়ে এ সকল গান পরিবেশন করতেন। মাইজভাণ্ডারের ভক্তকুল এবং পীর স্বয়ং রমেশ শীলের গানের ভক্ত হয়ে ওঠেন। এভাবে রমেশ শীলের গান মাইজভাণ্ডারের ওরশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়।[১১]

---

১০. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, *রমেশ শীল* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭), পৃষ্ঠা ১৯

১১. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, *রমেশ শীল* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭), পৃষ্ঠা ২০

রমেশ শীল চট্টগ্রামের যুববিদ্রোহ নিয়ে প্রবলভাবে আন্দোলিত হয়েছিলেন। চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহ নিয়ে তাঁর রচিত গানের সংখ্যা অনেক। যেমন :

"পরাধীন শৃঙ্খল ছিড়িতে যারা
দেশে তুলিল শির
স্বাধীনতা রণে শহীদ যাহারা
তারাই অমর বীর।"

কিংবা "শহীদখুনে রাঙ্গা তুমি জালালাবাদ,
দুশমন হটাতে তব বক্ষ মাঝে,
রুখিয়া দাঁড়াল বীরের দল।
হটিয়া গেল বিপক্ষ সেনানী
টুটিল তাদের ধৈয্যের বাঁধ।"...[১২]

পরবর্তী সময়ে এই যুববিদ্রোহের নায়কেরা যখন ফাঁসিকাষ্ঠে আত্মদান করেন, আন্দামানে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর কিংবা দীর্ঘ কারাদণ্ড ভোগ করেন তখনও তাঁদের প্রশস্তিতে উচ্ছ্বসিত ছিলেন রমেশ শীল :

"চট্টগ্রামের মুক্তবীর
ছিল যারা শান্তধীর
কারারুদ্ধ রয়েছে সকল।
গণেষ ঘোষ কল্পনা দত্ত
তারা সদা নির্ভীক চিত্ত
সুকর্মেতে ফলিল কুফল।
সুখেন্দু দস্তিদার
বরণ করে কারাগার,
অগ্রজ শহীদ অর্ধেন্দুর পিছে,
কালী চক্রবর্তী সঙ্গে আছে
প্রিয়দা দেশের প্রিয়
সর্বজন বরণীয়
এখন তারা বিস্মরণে রহিয়াছে।"[১৩]

১৯৩৮ সালে বাংলা কবিগানের ইতিহাসে প্রথম গড়া হল 'রমেশ উদ্বোধন কবি সমিতি'। রমেশ শীল তাঁর কবিগানে ধন-বিজ্ঞান, যুদ্ধ-শান্তি, চাষি-মজদুর, স্বৈরতন্ত্র-গণতন্ত্র ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এলেন। কবিগানে দেবী বন্দনা, আগমনী সংগীত ও গুরুবন্দনা পরিবর্তন করে প্রচলন করেন মাতৃভূমি ও তার কৃতী সন্তানদের বন্দনা। তিনি আরও প্রচলন করেন গণসংগীত, লোকবাদী শাস্ত্রগান ও ছড়াগান।

দারিদ্র্যের শোষিত সন্তান রমেশ শীল। দারিদ্র্যের সাথে যুদ্ধ করেই তাঁর জীবনসংগ্রাম। তাঁর কথা ও সুরে উৎসারিত হয়েছে বাংলার গণমানুষের চালচিত্র। তিনি আজীবন গেয়েছেন এদেশের মাটি ও মানুষের জয়গান। দেশের প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে তাঁর কথা, সুর, গান ও লেখনী ছিল রণতুর্যের মতো। আগ্নেয়গিরির মতো ফুঁসে ওঠেন তিনি। ব্রিটিশ শাসনামলের নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে রমেশ শীলের লেখনী ছিল রণতরবারির মতো।

---

১২. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, *রমেশ শীল* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭), পৃষ্ঠা ২১
১৩. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, *রমেশ শীল* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭), পৃষ্ঠা ২৩

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সারা বঙ্গে দুর্ভিক্ষ নেমে আসে। অনাহারে অর্ধাহারে শত শত লোক মারা যায়। গ্রামে গ্রামে কবিগানের আসর বন্ধ হয়ে যায়। সে সময় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যোগাযোগ হয় রমেশ শীলের। মানুষের ওপর মানুষের শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের যে আন্দোলন, সে আন্দোলনে রমেশ শীলের দল শরিক হয়ে দেশের নানা স্থানে কবিগান পরিবেশন করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও মন্বন্তর নিয়ে অনেকগুলো মর্মস্পর্শী গান লিখেছিলেন রমেশ শীল। তার মধ্যে কয়েকটি গান ছড়িয়ে পড়েছিল চাঁটগার মানুষের মুখে মুখে। যেমন :

"দেশ জ্বলে যায় দুর্ভিক্ষের আগুনে
এখনও দেশ জাগিল না কেনে।
দিনমজুর ঘরজা যারা গত সন মরেছে তারা
ঘরের ছানি দিব আজ কেমনে।
... দুই বেলা কেহ খায় না কেহ কারো পানে চায় না
ভিক্ষা পায় না অন্ধআতুরগণে।
অনাহারে শরীর জীর্ণ মার বুকেতে দুগ্ধ শূন্য
দুগ্ধপোষ্য মরে মুগ্ধ বিনে।'...
কিংবা 'জ্বলে পুড়ে গেল দেশ অত্যাচারের এক শেষ
দেশবাসী হিন্দু মুসলিম ঘুমাইওনা আর।
দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ি পয়ত্রিশ লক্ষ গেল মরি
অবাল বৃদ্ধ মইল কত হাজারে হাজার।
তার উপর কাপড়ের জ্বালা যত সব কুল বালা
ঘরের বাহির দিনের বেলা হতে নারে আর।
কেহ আত্মহত্যা করে কোন পুরুষ নারী ছাড়ে
পেপারে খবর তার পাই অনিবার।...
... মেয়ে মানুষ বেচা কিনাজীবনে যাহা শুনি না
নোটের আশে হল দেশে এই অত্যাচার।
কাগজরে তুই কোথায় ছিলি নোট হয়ে দেশে আসিলি
তুই যে অঘটন ঘটালি তোরে নমস্কার।"[১৪]

১৯৪৩ সালে রাউজান থানার বাগোয়ানে অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম জেলা কৃষক সম্মেলন। এই সম্মেলনে রমেশ শীলের দল কবিগান পরিবেশন করে। কবিগানের বিষয় ছিল 'চাষি ও মজুতদার।' এই সম্মেলনে সমবেত চট্টগ্রামের কবিয়ালরা শপথ নেয়–

> 'লোকসংগীতকে লুপ্ত হতে দেব না, তাকে উন্নত করব– কবিগানের মধ্য দিয়ে মুমূর্ষু দেশবাসীর প্রাণে আশা ও উদ্যম জাগিয়ে তুলব।'

সম্মেলন মণ্ডপে নতুন করে গঠিত হয় 'চট্টগ্রাম কবি সমিতি'। কবিয়াল রমেশ শীল নির্বাচিত হন সমিতির সভাপতিরূপে।[১৫]

রমেশ শীলের পূর্বোল্লেখিত নতুন গান নিয়ে মানুষ জাগানোর চিন্তা এই সময়ে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির চিন্তা-চেতনার সঙ্গে সমন্বিত হয়েছিল সহজেই। এই সময় কমিউনিস্ট পার্টি সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন মাধ্যমে জনতার সামনে জনযুদ্ধের রাজনীতিকে উপস্থিত করার ওপর বিশেষভাবে জোর দেয়।

---

১৪. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, *রমেশ শীল* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭), পৃষ্ঠা ২৭

১৫. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, *রমেশ শীল* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭), পৃষ্ঠা ২৮

কবিয়াল রমেশ শীল ১৯৪৪ সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদ লাভ করেন। ১৯৪৪ সালে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' তৃতীয় সম্মেলনে কবিগান গেয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবিয়াল উপাধি পান। এই খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে কোলকাতার রাজা ও জমিদারদের পূজামণ্ডপে কবিগানের আমন্ত্রণ আসে তাঁর কাছে। একটি গানের বায়না ছিল পঁচিশ টাকা। রমেশ শীল আজীবন কবিগান গেয়েছেন ক্ষুধা-দারিদ্র্য, অভাব-ক্লিষ্ট, বঞ্চিত-নিপীড়িত মানুষের জন্য। রাজা-জমিদারদের সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতেন তিনি। তাঁর লেখাতেই ফুটে উঠে

"একটু দুখের কথা কই মালিক
দুখের কথা কই, দুখে দুখে জীবন গেল
সখ দেখিলাম সই।"

১৯৪৫ সালে কবিগানের দল নিয়ে রমেশ শীল চট্টগ্রাম অঞ্চলের বাইরে গেলেন। তাঁর এ পর্যায়ের প্রথম কবিগান বর্ধমানের হাটগোবিন্দপুরে কৃষক সভার অষ্টম প্রাদেশিক সম্মেলনে। মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে রমেশ শীলের কবিগান তাঁকে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের বামপন্থী কর্মীদের চোখে শ্রদ্ধার আসন দান করে।

এ বছরের মার্চ মাসের শেষদিকে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন। সম্মেলনে রমেশ শীল কবিগান করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুরস্কারধন্য শেখ গোমানীর সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কবিয়াল ফণী বড়ুয়া ও রাইগোপাল দাস; দোহার মনমোহন নাথ, যজ্ঞেশ্বর শীল ও মনোমোহন দাস এবং ঢুলিবাদক বিনয় বংশী জলদাস।

এই সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন খ্যাতিমান সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়সহ আরও অনেকে। তাঁরা কবিগানের পূর্বেই এই দুই কবিয়ালের মধ্যে একটি পরিচিতিমূলক বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। উদ্দেশ্য রাত্রের কবিগান সম্পর্কে আলোচনা। কেননা উদ্যোক্তারা চান রাতের গানে উদ্দেশ্যহীন তর্কের পরিবর্তে বরং কোলকাতার মানুষ কবিগান সম্পর্কে লাভ করুক একটি স্বচ্ছ ধারণা। স্থির হল গানের বিষয় হবে 'কৃষক ও মজুতদার'। রমেশ শীল বেছে নিলেন অপেক্ষাকৃত কঠিন মজুতদারের পক্ষ।[১৬]

সে সন্ধ্যার বিপুল লোক সমাগম ঘটেছিল কোলকাতার মোহাম্মদ আলী পার্কে। গান শুরু করেন গোমানী-সহকারী লম্বোদর চক্রবর্তী। সরস্বতী বন্দনার পর তিনি ছড়ায় উপস্থিত করেন কবিগানের বিষয়। প্রশ্ন করেন– গোমানী তাঁর পিতৃতুল্য, রমেশ শীল পিতামহের মতো। তাহলে, পিতার পিতা শেষ পিতা কে এবং পিতামহের পিতামহ শেষ পিতামহ কে?

সমাজ-সচেতন বিষয় 'কৃষক ও মজুতদার'-এর পরিবর্তে 'দাদা ও নাতি'র মতো সনাতন বিতর্ক উপস্থাপনে মর্মাহত হলেন রমেশ শীল। কিন্তু তখন বিতর্কে অবতীর্ণ না হয়ে উপায় নেই। তাঁর পক্ষে ফণী বড়ুয়া বন্দনা গাইলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর শহিদদের নামে। উত্তরে শেখ গোমানী বন্দনা গাইলেন কোলকাতা মহানগরীর। রমেশ শীল বন্দনা গাইলেন চট্টগ্রামের কৃতি সন্তানদের স্মরণে। তারপর উত্তর দিলেন লম্বোদরের প্রশ্নের। শুরু করলেন এভাবে :

"আদরের নাতিরে আমার
নিত্য থাক নদীর কুলে
না জান সাঁতার।
সাঁতারিয়ে ভবে এল
সাঁতার খেলে যাবে চলে

১৬. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, *রমেশ শীল* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭), পৃষ্ঠা ৩১

ঢেউ তরঙ্গের ভয়ে কেন বসিয়া রহিবে?
বি. এ. এম. এস পাশ করে
সাঁতার না জানিলে
স্রোতের মুখে মার খেয়ে কুল পাবে না আর।"...

এই কবিগান শেষ হওয়ার পূর্ব-নির্ধারিত সময় ছিল রাত এগারোটা। কিন্তু শ্রোতারা চাইল গান চলুক। তাই দুই কবির মধ্যে আপোসমূলক জোটক হল তখন রাত দুটো। পরদিন কোলকাতার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল রমেশ শীলের বিজয়সংবাদ :

...When Ramesh Seal portrayed the devastation that imperialists expoloitation has brought upon our land and sang of national unity, it was obvious that any day Ramesh could beat most speakers hollow.

তিরিশ ও চল্লিশের দশকে শেখ গোমানী ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবিয়াল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপস্থিতিতে শান্তিনিকেতনের পৌষমেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল তাঁর কবিগান। রবীন্দ্রনাথের সোনার মেডেল বিজয়ী কবিয়াল তিনি। তাঁর বিপক্ষে রমেশ শীলের এই বিজয় তাই রাতারাতি রমেশ শীলকে কোলকাতার মানুষের কাছে বিস্ময়কর শ্রদ্ধার আসন দান করল। রমেশ শীলের কবিয়াল-প্রতিভার চূড়ান্ত বিকাশ ও স্বীকৃতি মিলল এই পর্বেই।

কবিয়াল হিসেবে রমেশ শীলের খ্যাতি কোলকাতা শহরে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার ধনী ব্যক্তিরা রমেশ শীলকে তাঁদের বাড়িতে গানের জন্য আমন্ত্রণ জানান। তাঁর কাছে এ ধরনের প্রথম আমন্ত্রণ আসে কোলকাতার বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি রাজা হৃষিকেশ লাহার প্রাসাদে। গানের বায়না পাঁচশত টাকা। পরবর্তী সময়ে কোলকাতার বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী তাঁকে তাদের দুর্গাপূজামণ্ডপে কবিগান পরিবেশনের আমন্ত্রণ জানান। তবে এ ধরনের আমন্ত্রণের অধিকাংশই রমেশ শীল প্রত্যাখ্যান করতেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তির জয়লাভের পর ভারতীয় উপমহাদেশকে তাদের প্রতিশ্রুত স্বাধিকার দানে ব্রিটিশ সরকার টালবাহানা শুরু করে। এই পর্যায়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের বন্দিদের মুক্তির জন্য সমগ্র ভারতে তীব্র গণআন্দোলন শুরু হয়। কোলকাতার গঠিত হয় 'নিখিল বঙ্গ বন্দিমুক্তি কমিটি'। এই কমিটি রমেশ শীলকে আমন্ত্রণ জানায় কবিগান পরিবেশনের জন্য। গানের বিষয় চাষি ও মজুতদার। পূর্ণেন্দু দস্তিদার এই কবিগানের বর্ণনা দিতে গিয়ে জানিয়েছেন :

> ... 'বন্দীমুক্তি আন্দোলন পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে চার আনা করে টিকেটের ব্যবস্থা হয়েছিল। টিকিট করেও সেদিন প্রায় বিশ হাজারের মতো লোক রমেশ শীল ও ফণী বড়ুয়ার কবিগান শুনতে সমবেত হয়েছিল।... কবিগানের মারফত এই দুই কবিয়াল তৎকালীন সরকারের খাদ্য ও বস্ত্রনীতির এমন চমৎকার সমালোচনা করেছিলেন যে, শ্রোতারা তাঁদের দলকে বিপুলভাবে অভিনন্দিত করে।'...

১৯৪৫ সালে ময়মনসিংহের নেত্রকোণায় অনুষ্ঠিত হয় 'সারা ভারত কৃষক সম্মেলন'। রমেশ শীল সেখানেও কবিগান পরিবেশন করেন। ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী লক্ষাধিক শ্রোতার সামনে কবিগান পরিবেশন করে রমেশ শীল সেদিন পুলকিত বোধ করেছিলেন। এর প্রায় বিশ বছর পরে কবিয়াল এক পত্রে লিখেছিলেন,

> 'সবচেয়ে গানে আনন্দ পেয়েছি নেত্রকোণা সারা ভারত কৃষক সম্মেলনে'...।

সেবারের নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের (এ.আই.এস.এফ.) বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রামে, ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে। সে সময়ের গান্ধী ময়দান, যাকে ঘিরে এখন মুসলিম ইনস্টিটিউট সেখানে সম্মেলন উপলক্ষে বিশাল প্যান্ডেলে আয়োজন করা হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। ছাত্রদের উদ্দেশ্যে রমেশ শীলের একটি গান দিয়ে উদ্বোধন হয়েছিল সম্মেলনের। সম্মেলনের আকর্ষণ ছিল সত্যপাল অমৃত পদ ডাঙ্গের ভাষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য আলোচনা, সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা পাঠ এবং রমেশ শীলের কবিগান।

সেদিনের কবিগানের বিষয় ছিল 'যুদ্ধ ও শান্তি'। রমেশ শীল যুদ্ধের ভূমিকায়, ফণী বড়ুয়া শান্তির। সুচরিত চৌধুরী সে কবিগানের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

> ...'বন্দনার পর রমেশ শীল আর ফণী বড়ুয়া মঞ্চের সম্মুখভাগে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। পরনে অতি মামুলী পোষাক, গ্রাম্য তো বটেই। চেহারায় কোন শিল্প-ভঙ্গিমা নেই, সাদাসিধে-অর্কেস্ট্রা নেই, একটি তারের যন্ত্র পর্যন্ত নেই। শুধু ঢোল আর কাঁসি। সুর ছাড়া কি করে গান হয়? কবিগান শুরু হবার পর বুঝেছিলাম– এতে সুর না হলেও চলে, কেন না কথার রসই হলো কবিগানের প্রাণ।'...[১৭]

রমেশ শীল সেদিন বিতর্ক শুরু করে বলেছিলেন :

"ওরে মূর্খ,
শান্তি শান্তি শান্তি বলে
শাস্ত্রে কোনো কথা নাই,
রাম রাবণে যুদ্ধ করি
প্রমাণ করিল এই কথাই।
দেহে যুদ্ধ, মনে যুদ্ধ, যুদ্ধ বিনে মানুষ নাই
খাইতে যুদ্ধ, যাইতে যুদ্ধ, শান্তি কোথায় বল চাই?"...

শেষরাতের দিকে ফণী বড়ুয়া উত্তর দিলেন গুরুর কাছে শেখা গানে :

..."কাঁদে আকাশ, কাঁদে বাতাস
সোনার সংসার জ্বলি ছাই
ঘর ছাড়িয়া বাহির হৈলাম
পেটে দানা পানি নাই।
কিসের রাবণ! কিসের লক্ষ্মণ!
কিসের রামের রামায়ণ!
যুদ্ধ যদি ধ্বংস আনে
সে সব গ্রন্থ অকারণ–
রাজায় রাজায় যুদ্ধ তাহা
মরে জনসাধারণ।
তুমি বৃদ্ধ কবিপতি
শ্রদ্ধা জানাই চরণে,
প্রশ্ন করি তুমিও কি
চাওনা শান্তি জীবনে?
দেহে যুদ্ধ মনে যুদ্ধ
যুদ্ধ নাই যে বিবেকে
শান্তি বিরাজ না করিলে
প্রাণের বাতি জ্বালবে কে?
বৃদ্ধ কবি চক্ষু মেলি
চেয়ে দেখো চারিধার
শান্তি শান্তি শান্তি বলে
কাঁদছে ধরা অনিবার।"

গানের সঙ্গে সঙ্গে ঢোলের কাঠি বেজে উঠেছিল দ্রুতছন্দে, কাঁসিতে বেজে উঠেছিল বিজয়ী সেনার নৃত্যের তাল, রমেশ শীল বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন ফণী বড়ুয়াকে। তখন রাত কেটে ভোর হয়ে গেছে।

---

১৭. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, *রমেশ শীল* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭), পৃষ্ঠা ৩৪

বিশ শতকের চল্লিশের দশক ভারতীয় উপমহাদেশের জন্য যুগসন্ধিকাল। ভারতের স্বাধীনতা, উপমহাদেশকে বিভক্ত করে দু'টি রাষ্ট্রগঠন, বঙ্গবিভাগ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে তখন চট্টগ্রামেও চলছে প্রবল উত্তেজনা। এ পর্বের প্রথম কয়েক বছরে রচিত রমেশ শীলের গান হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও বঙ্গবিভক্তির বিরোধিতার বার্তাবাহক। যেমন :

"বঙ্গভঙ্গ করো না। হিন্দু মুসলিম ভাই
মিলেমিশে চল সবে অভিযানে যাই
পশ্চিম বঙ্গ ছুটে গেলে, শিক্ষা শিল্প যাবে চলে,
পাট খেলে কি উদর চলে,
ভেবে চাও সবাই।
উনিশ শ' আট চল্লিশে, পূর্ণ স্বাধীন আসছে দেশে,
এটলি সাহেব ঘোষে, নিজের সুযোগ চাই।
এর ভিতর এক বছরে, যদি গণ্ডগোল লাগাতে পারে,
তারপর দিবে বুদ্ধি করে, দশ বছর পিছাই।
যেই রূপ স্বাধীনতা দিবে, ভ্রাতৃঘাতির ডিপো হবে,
জন্মভূমি খণ্ড হবে, দুখের সীমা নাই।
... এখনও মঙ্গল চাও, হিন্দু মুসলিম এক হও
পিতৃ সম্পদ আবার মোদের
জোরে লও ছিনাই।"[১৮]

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে এসে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি কার্যত দ্বিজাতি তত্ত্বকে সমর্থন করে। তারা উপমহাদেশকে বিভক্ত করে স্বাধীন করার প্রস্তাবও মেনে নেয়। এই জন্য পার্টি অবশ্য লীগ-কংগ্রেস-কমিউনিস্ট ঐক্যের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে। কৃষকসভা ১৯৪৩ সাল থেকে এই প্রচারকে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কৃষকদের কাছে নিয়ে যাওয়ার কর্মসূচি গ্রহণ করে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে রমেশ শীলের গান ছিল এই প্রচারের অন্যতম মাধ্যম :

..."কালা চামড়া একযোগ হইলে মন্ত্রি হৈত পারে,
তারা করের মারামারি বুঝায়ম কারে
যদি সাদা চামড়া মিয়াল করে
তাহলে কোয়াল খাইয়ে।
দেশত্যা হক্কুলুন চল তারার কাছে কই
লীগ কংগ্রেস কমিউনিস্ট মিলি যাইত গৈ,
লাডালাডি কাডাকাডি বহুত করি চাইয়ে।..."

[অনুবাদ : কালো চামড়া একতাবদ্ধ হলে মন্ত্রী হতে পারে/ তারা নিজেরা ঝগড়া করছে কাকে কী বুঝাব/ যদি সাদা চামড়ার সঙ্গে মিশে যায়/ তাহলে কপাল মন্দ/ দেশবাসী সকলে চল তাদের কাছে বলি/লীগ, কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট একত্র হোক/ লাঠালাঠি মারামারি অনেক হয়েছে।]

তবে স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যে ঐ ধরনের রাজনৈতিক চিন্তায় রমেশ শীল স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসাহী হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। তাই মাত্র দু'বছরের মধ্যে শুনতে পাওয়া যায় তাঁর হতাশ কণ্ঠস্বর :

"... মোদের দেশ স্বাধীন করা হল না,
কপালের দুঃখ ঘুচিল না,
নানা রকম টেকস জারী
দিনের পর দিন এই যাতনা ॥...

---

১৮. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, *রমেশ শীল* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭), পৃষ্ঠা ৩৫

... হিন্দু মুসলিম মারামরি
দেশে এল কি ঘটনা
যত কুলী মজুর গরীব মরে,
নেতারত কেউ মরে না ॥"...[১৯]

কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত তেভাগা আন্দোলন ১৯৪৬ সালের জুন মাসে তেলেঙ্গানায় এসে সশস্ত্র সংঘর্ষের রূপ নেয়। চট্টগ্রাম কবি সমিতি প্রস্তুতকৃত তথ্যে দেখা যায় যে, এ সময়ে তেভাগা আন্দোলন চট্টগ্রামের পটিয়া-বোয়ালখালী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। রমেশ শীল ও তাঁর কবিগানের দল এই আন্দোলনেও যুক্ত ছিলেন।

তবে এই সময়ে রমেশ শীলের অধিকতর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা নিরসনে। বিশ, তিরিশ ও চল্লিশের দশকে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় রক্তাপ্লুত হয়ে পড়ে। এই দাঙ্গা চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৯৪৬ সালে কোলকাতায় 'ডিরেক্ট অ্যাকশন ডে'-কে কেন্দ্র করে। দাঙ্গা নিরসনে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের প্রচেষ্টায় কোলকাতায় গঠিত হয় 'শান্তি কমিটি'। এই শান্তি কমিটির আহ্বানে রমেশ শীল ও শেখ গোমানী কোলকাতার দাঙ্গা-বিধ্বস্ত এলাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গান পরিবেশন কয়েন দিনের পর দিন। তাঁর এ সময়ের একটি গান :

"... সাইমন ক্রীপস কুপল্যাণ্ড গেল শেষে মন্ত্রী মিশন এল।
বিভেদের বিষ ঢুকাইল বাঙ্গালীর শরীরে ॥
সেই বিষে উন্মাদ হয়ে মারামারি করে।
রক্তগঙ্গা বহাইয়া ভাইরে ধরি ভাই সংহারে।"[২০]

১৯৪৬ সালে কবিয়াল রাইগোপাল দাসের সঙ্গে 'যুদ্ধ ও শান্তি' শীর্ষক কবিগান পরিবেশন করেন রমেশ শীল কোলকাতার পার্ক সার্কাস এলাকায়। ১৯৪৭ সালে ভারত ও বঙ্গবিভাগের পর রমেশ শীল কোলকাতায় একাধিকবার কবিগান পরিবেশন করেন।

১৯৪৮-৫১ পর্বে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন গণআন্দোলনের গায়েন ছিলেন রমেশ শীল। জমিদারি প্রথা বিলোপের আন্দোলন, বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক-প্রতিরোধ, ছাত্র ধর্মঘট, দাঙ্গাবিরোধী কার্যক্রম প্রভৃতিতে রমেশ শীল ছিলেন সোচ্চার। কেননা তখন পাকিস্তান সৃষ্টির আনন্দ তাঁর বোধনে ম্লান হয়ে জেগেছে নতুন উপলব্ধি :

..."সাদা চামড়া চলে গেছে, এখনও তার দালাল আছে,
বুঝতে বাকি নাই কিছু আর
সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টি দিলে জমা খরচ যাবে মিলে,
দাঙ্গার তলে গোপন হস্ত কার।"...

এই পর্বে চাঁটগার হরিখোলার মাঠে ১৯৫১-এর ১৬ মার্চ 'পূর্ব পাকিস্তান সংস্কৃতি সম্মেলন'-এ এবং কুমিল্লায় ৫২-র আগস্টে, পরবর্তী সম্মেলনে কবিগান পরিবেশন করেন রমেশ শীল।
পূর্ব বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের প্রথম পর্যায় বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রাজপথে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণ সমগ্র পূর্ব বাংলাকে এক অভূতপূর্ব সংগ্রামী অবয়ব দান করে। তৎকালীন প্রদেশের সমস্ত বিবেকবান মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে ভাষা আন্দোলন। রমেশ শীল গান গেয়ে বেড়ান চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে :

"ভাষার জন্য জীবন হারালি বাঙ্গালী ভাইরে ॥
রমনার মাটি রক্তে ভাসালি।

---

১৯. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, *রমেশ শীল* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭), পৃষ্ঠা ৩৬
২০. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, *রমেশ শীল* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭), পৃষ্ঠা ৩৭

(ও বাঙ্গালী ভাইরে) বাঙ্গালীদের বাংলা ভাষা জীবনে মরণে
মুখের ভাষা না থাকিলে জীবন রাখি কেনে ॥
কীট পতঙ্গ পশুপক্ষী স্বীয় ভাষায় বুলি,
তার থেকে কি অধম হলাম অভাগা বাঙ্গালী ॥"[২১]

১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। ভাসানী ফজলুল হক-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে এ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এ নির্বাচনি প্রচারে রমেশ শীল সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে 'পৃথক নির্বাচন প্রথা'র বিরুদ্ধে এবং যুক্তফ্রন্টের পক্ষে চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে গান পরিবেশন করেন। এই নির্বাচনি প্রচারের সময় লালদিঘি ময়দানে পূর্ব বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের একটি জনসভা জনতা পণ্ড করে দেয়। সে ঘটনা নিয়ে রমেশ শীল একটি চমৎকার ব্যঙ্গগীতি রচনা করেন :

"শুনরে ভাই আজগুবী খবর
মন্ত্রী করে চট্টগ্রাম সফর।
দিনের তিনটা বেজে গেল ময়দানে সভা বসিল
হায় কি দেখিলাম কি ঘটিল ভয়ে মানুষ জড়সড়।
হঠাৎ দেখি পচা আণ্ডা মন্ত্রীরে করিতে ঠাণ্ডা
উড়তে লাগলো কালো ঝাণ্ডা মন্ত্রীর চোখের উপর।
আণ্ডার মিছিল শুরু হল মেঘে যেন বৃষ্টি এল,
মন্ত্রী সাহেব চমকে গিয়ে আসন ছাড়ি দিল দৌড়।
তারপর এক আশ্চর্য কথা ছুটে এল ছেড়া জুতা
মন্ত্রী ভাবে যাবে কোথা"...

এই গানটি তখন এত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল যে চট্টগ্রাম-নোয়াখালী অঞ্চলে তা যুক্তফ্রন্ট-এর নির্বাচনি সভার অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছিল।

১৯৫৪ সালে ঢাকায় 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন', ১৯৫৭ সালে টাঙ্গাইল 'কাগমারি সাংস্কৃতিক সম্মেলন', ১৯৬১ সালে বুলবুল ললিতকলা একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত 'লোকসংগীত ও শিল্প উৎসব'-এ কবিগান পরিবেশন করেন।

কবিয়াল রমেশ শীল ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের দেয়া সামরিক আইনের বিরোধিতা করায় তাঁর 'সাহিত্যিক ভাতা' বন্ধ করে দেয়া হয়। এছাড়া বিগত সময়ে পাওয়া সাহিত্যিক ভাতাও ফেরত দিতে বলা হয়। ঢাকা কারাগারে থাকার সময় তিনি কবিতা রচনা করেন। এই কবিতার মধ্যে তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা ও আশাবাদ লক্ষ করা যায়।

"... বাংলার জন্য জীবন গেল হব স্বর্গবাসী
আমার কি থাকিবে বাংলার দাবী যদিও হয় জেল ফাঁসি।"

১৯৬৪ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে আসন্ন সরকারবিরোধী গণআন্দোলনকে লক্ষ্যচ্যুত করার উদ্দেশ্যে তৎকালীন প্রতিক্রিয়াশীল চক্র সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সৃষ্টি করে। রমেশ শীলের সংবেদনশীল হৃদয় অসুস্থ অবস্থায়ও এই অমানবিক হত্যাযজ্ঞে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। রোগশয্যায় শুয়ে তিনি রচনা করেন :

"হিন্দু মুসলিম দেশবাসী শুন বন্ধুগণ।
বারে বারে দেশে কেন ঘটে অঘটন ॥

২১. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, *রমেশ শীল* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭), পৃষ্ঠা ৪১

জাতির পিতার বাণী[২১] নিলে মানি হিন্দু মুসলমানে।
ভ্রাতৃত্ব মিলনে আছি স্বাধীন পাকিস্তানে ॥
তবে কোন বিশৃঙ্খল[২২] ভাই সকল দেখ বিচারিয়া।
সমস্যা সমাধান হয় কি লাঠি ছুরি দিয়া ॥"...

তবে বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও থেমে থাকেনি তাঁর সাহিত্যসাধনা। ১৯৬৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি গান লেখেন ফাতেমা জিন্নাহ্'র পক্ষে। সমস্ত '৬৫-৬৬ সাল জুড়ে আবার তিনি গান লিখেছেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে। যেমন:

..."সার্বজনীন ভোটে ভাই, প্রত্যক্ষ নির্বাচন চাই,
আরো চাই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ॥
দেশরক্ষা, মুদ্রা, পররাষ্ট্র–এই তিন হয়ে তুষ্ট,
কেন্দ্রের হাতে সবে করুন সমর্পণ।
আর যত প্রদেশের হাতে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে,
স্বায়ত্তশাসনে দেশ হবে উন্নয়ন ॥"...[২২]

পূর্বে কবিগানের মুখ্য বিষয় ছিল পৌরাণিক কল্পকাহিনি ও চরিত্র নির্ভর, অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ। সে কবিগানেই রমেশ শীল নিয়ে আসেন সমকালীন জীবন-জিজ্ঞাসা, উন্নত রুচিবোধ, প্রকৃত নীতি-নৈতিকতা, সমাজ-সচেতনতা এবং রাজনীতি। নানা পৌরাণিক আবহে আবর্তিত কবি-বিতর্ক ছাড়িয়ে রমেশ শীল প্রবর্তন করেন জার্মান-ইংরেজ, জোতদার-কৃষক, মহাজন-খাতক এবং ধনতন্ত্র-সমাজতন্ত্রের মতো বাস্তব ও জীবন্ত বিষয় নিয়ে কবির লড়াই। দু'টো বিশ্বযুদ্ধ, অগ্নিযুগের স্বাধীনতা সংগ্রাম, স্বরাজ আন্দোলন, কৃষকদের অধিকার আদায়ের লড়াই, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভারত বিভাগ, ভাষা-আন্দোলন প্রভৃতি রমেশ-মানসে সক্রিয় ও সদর্থক আবেগের সৃষ্টি করে। কবিয়াল রমেশ শীল জীবনে বহু কষ্ট ভোগ করেছেন। কিন্তু কোনোভাবে মিথ্যার সাথে আপোস করেননি।তাই তৎকালীন স্বৈরাচারী সরকারের কোপানলে তাঁকে ভোগ করতে হয় কারানির্যাতন।

কবিয়াল রমেশ শীলের হাতেই কবিগান হয়ে ওঠে সমাজ ভাঙার হাতিয়ার। কেবল চট্টগ্রাম নয়, সারা পাক-ভারত উপমহাদেশে কবিয়াল সম্রাট রমেশ শীল যে বিজয়কেতন উড়িয়েছেন তা শাশ্বতকালের জন্য অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে আমাদের জাতীয় জীবনে। আর স্বদেশ, জাতি, স্বভাষা ও স্বাধীনতার প্রতি রমেশ শীলের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা ও অনুরাগ কত গভীর ও নিবিড়, তা তাঁর গানই প্রমাণ করে :

"মোরা মাটির মানুষ মাটি নিয়া সারাদিন কাটাই,
মাটির সঙ্গে কোলাকুলি মাটি দিয়া সোনার ধান ফলাই।
এই মাটিতে মোদের জন্মগত অধিকার,
অস্বীকার করিবে যে সে দৈত্য দুরাচার,
এই মাটিতে দেহ গড়া, বুকের রক্ত দিয়া মাটি চাই।"[২৩]

কবিয়াল-সংকটে তিনি দেশের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে কবিয়ালদের সংগঠিত করে পুনর্গঠন করেন 'চট্টগ্রাম কবি সমিতি'। বিভিন্ন জেলায় কবিগানের আসর দিয়ে তিনি কবিগান ও পল্লিগীতি গানকে অবলুপ্তির থেকে রক্ষা করেন। লোকজ সংস্কৃতিকে জাগিয়ে তোলেন। তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও মানবতার কবি। গণআন্দোলন আর সাম্য-মৈত্রীর গান গাওয়া রমেশ শীলের জীবনসাধনা। তাঁর কথা ও সুরে বেজেছে এদেশের দ্রাবিড় মানুষের চালচিত্র। ব্রাত্যজন ও লোকসমাজের প্রতিধ্বনি।

---

২২. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, *রমেশ শীল* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭), পৃষ্ঠা ১৩

২৩. এস এম নূর-উল-আলম, *চট্টগ্রামের কবিয়াল ও কবিগান* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৩), পৃষ্ঠা ১৭

রমেশ শীল শুধু কবিগানই গাইতেন না। সংগীতের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি এক সময় যাত্রাদলেও কাজ করেছিলেন। গোমদণ্ডী গ্রামের অদূরে হাওলা ধোপাদিয়া গ্রাম। সেই গ্রামে ছিল এক যাত্রাগানের দল। এই গ্রামের যাত্রারসিকদের আহ্বান পেয়েছিলেন রমেশ শীল। তিনি সেই যাত্রাদলে যোগ দেন। এই যাত্রাদলে তিনি 'কুরুক্ষত্র যুদ্ধ' পালায় অভিনয় করেছিলেন। রমেশ শীলের অভিনয়খ্যাতি এলাকায় দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়েছিল।

শহরের চাইতে কবিগানের কদর ছিল গ্রাম-গঞ্জে বেশি। রমেশ শীল বাংলার মানুষকে গান শোনাতে ছুটে বেড়াতেন এ গ্রাম থেকে সে গ্রাম। প্রচুর প্রাণশক্তির অধিকারী ছিলেন। এভাবে ছুটে বেড়াতে তিনি ক্লান্তি বোধ করতেন না। প্রায় ৬০ বছর ধরে বাংলার হাটে মাঠে ঘাটে তিনি কবিগান করেন। এত দীর্ঘ সময় ধরে এভাবে ছুটে বেড়ানো ও গান করা এক বিরল ক্ষমতাই বটে।

প্রতিভাবান কবিয়াল রমেশ তাঁর জীবনকালেই খুব পরিচিতি পেয়েছিলেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই কোলকাতা ও চট্টগ্রামের গবেষকগণ রমেশ শীলের জীবন ও রচনা নিয়ে কাজ শুরু করেন। রমেশপুত্র কবিয়াল যজ্ঞেশ্বর শীল উৎসাহী হয়ে তখন গবেষকদের নানা ধরনের তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন।[২৪]

ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে রমেশ শীল ছিলেন সদা সক্রিয়। কবিগানকে তিনি করেছিলেন জাতীয় মুক্তির হাতিয়ার। ভাষা আন্দোলনের পক্ষে তাঁর লেখনী ছিল ক্ষুরধার। ভাষা আন্দোলনের পক্ষে কবিতা লেখার কারণে তাঁকে এক বছর কারানির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। স্বদেশচেতনার কবি কিংবা মাইজভাণ্ডারী গানে নবযুগের স্রষ্টা হিসেবে তাঁর খ্যাতি কিংবদন্তিতুল্য। তবে জীবনাচার সৃষ্টির আলোকে রমেশ শীলের সর্বশেষ পরিচয় হল তিনি মানবতার মহাকবি।

কবিয়াল রমেশ শীল তাঁর চিন্তায় ও রচনার মধ্যে এনেছিলেন নানা ভাব ও বিষয়। আর তাতে তিনি সার্থক হয়েছিলেন। বাংলা লোকসংগীতে রমেশ শীল বহু ধরনের গান রচনা করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তবে যে কাজটি তাঁকে অধিক স্মরণীয় ও বরণীয় করে রেখেছে তা হল, মাইজভাণ্ডারী গানের রচয়িতা ও সুরকার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ। তিনি বাংলা মরমি গানের ইতিহাসের আদিগুরু। আমাদের মরমি সংগীত ও মরমি সংগীতের ইতিহাসে রমেশ শীল যে স্বীকৃতি লাভ করেছেন তা কোনোদিন কোনোভাবেই ম্লান হওয়ার নয়।

কবিয়াল রমেশ শীল বহু কষ্ট ভোগ করেছেন। কিন্তু কোনোভাবে মিথ্যার সাথে আপোস করেননি। তাঁর জীবনে এসেছে অনাহার। চিকিৎসা পাননি। সয়েছেন সামাজিক অত্যাচার তবু তিনি ছিলেন অবিচল। এমনকি ৭৭ বছর বয়সেও তাঁকে নিরাপত্তার অজুহাতে কারাগারে আটক রাখা হয়। বৃদ্ধ বয়সে দীর্ঘদিন কারাগারে থাকার নির্যাতন ভোগ করতে হয়।

কবিয়াল সম্রাট-লোককবি রমেশ শীল ১৯৬৭ সালের ৬ এপ্রিল দেহত্যাগ করেন। তাঁর শেষ ইচ্ছে অনুসারে বাড়ির পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত হয়েছিল শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে গোমদণ্ডীতে প্রতি বছর রমেশ শীলের মৃত্যুবার্ষিকীতে তিনদিন ব্যাপী 'রমেশ মেলা' অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

প্রকাশনা বিবরণ

কবিয়ালরা প্রধানত গান রচনা করেন পরিবেশন আসরে দাঁড়িয়ে। খুব দ্রুত তা মানুষের সামনেই সুরে ও তালে পরিবেশিত হয়। তাই এই গানগুলো শিখে রাখা হয় না। কিংবা লিখে রাখার প্রয়োজন হয় না। আসরে রচনা করা গান ছাড়া কবিয়ালরা কিছু গান আগেও রচনা করে রাখেন যা আসরে সুরে-তালে গেয়ে থাকেন। এই গানকে বলে 'বাঁধাই গান'। এই 'বাঁধাই গান' কবিয়ালের কোনো সহকারী লিখে রাখেন। এই গানগুলো আসরে গাওয়া ছাড়া কোনো প্রচারমাধ্যমে পাঠানো হয় না। তবে কোনো

---

২৪. মহসিন হোসাইন, *রমেশ শীল* (ঢাকা : যুক্ত, ২০০৯), পৃষ্ঠা ২২-২৩

গান যদি শ্রোতাদের মুগ্ধ করে তা হলে শ্রোতারা তা সংগ্রহ করে থাকেন কবিয়ালের সহকারীদের কাছ থেকে। তাই কবিয়ালের কোনো আসরি গান কবিয়ালের জীবদ্দশায় বই আকারে প্রকাশ পায় না। এর একটি কারণ হল বিত্তহীন কবিয়ালদের এইসব গান বই আকারে প্রকাশ করার মতো আর্থিক সঙ্গতি থাকে না। এছাড়া শহরের প্রকাশনা সংস্থাগুলোর সাথে গ্রামীণ কবিয়ালদের যোগাযোগহীনতাও প্রকাশনা থেকে তাঁদের পিছিয়ে পড়ার কারণ।

তবে কবিয়াল রমেশ শীল কিছু রচনা বই আকারে প্রকাশ করেছিলেন। তিনি প্রথমজীবনে ছিলেন কবিরাজ। পরে হয়েছিলেন কবিয়াল। গান গাইতে গাইতে তিনি প্রগতিশীল রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি জড়িয়ে পড়েন। তৎকালীন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যও হয়েছিলেন। বঙ্কিম সেন, কল্পতরু সেনগুপ্ত, সদাচরণ শীল এবং পরবর্তীকালে পি সি যোশী প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতার সঙ্গ কবিয়ালের রচনাকে বেশ প্রভাবিত করেছিল। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেবার প্রসঙ্গে রমেশ শীল জানিয়েছিলেন :

> 'মুন্সির হাটে হঠাৎ একটি চেনা ছেলের সঙ্গে দেখা। তার হাতে একটা কাগজ। তার ওপর লেখা 'জনযুদ্ধ'। ছেলেটি বলল, নিয়ে যান পড়ে দেখবেন। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আগাগোড়া পড়লাম। দেশের কথা ঠিক এইভাবে জানার কোন সুযোগ হয়নি। নতুনভাবে গান লেখার একটা দারুণ সাড়া পেলাম। অনেকদিন ধরে মনের ভেতর কেমন যেন হাঁচর-পাঁচর চলছিল। একদিন একটা রাস্তা পেয়ে গেলাম। ঠিক করলাম সারারাত চাঁটগায়ে এবার গান দিয়ে মানুষ জাগাব। তারপর গাঁয়ে গাঁয়ে নতুন গান নিয়ে গিয়েছি।'[২৫]

এই রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার কারণে রমেশ শীল সমাজ সচেতনতামূলক কবিতা ও গান রচনায় উৎসাহিত হন। তাঁর এই সময়কার রচনাই বই আকারে প্রকাশ করেছিলেন।
রমেশ শীলের এক চিঠি থেকে জানা যায়, তাঁর মোট আটটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য তাঁর পরলোকগমনের পরে আরও রচনা ও গ্রন্থ প্রকাশ পায়। কবি ও গায়ক কবি বা কবিয়ালদের লেখার ধরন ও প্রকাশভঙ্গি আলাদা। কবিয়ালগণ লোকজ ধারায় জীবন যাপন করেন। তাই তাঁদের সবকিছু খুব গোছালো নয়। কবিয়ালগণ শুধু পরিবেশনের আনন্দে সুখী হন। কমিউনিস্ট-সংশ্লিষ্টতার কারণে রমেশ শীল কিছু পুস্তক প্রকাশে আগ্রহী হন বটে তবে অধিকাংশ রচনাই গ্রন্থিত করার উদ্যোগ নেননি। গ্রন্থিত পুস্তকগুলোতেও তথ্য সংযোজনে অমনোযোগিতা লক্ষ করা যায়। এখানে তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত আটটি গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করা হল :

আশেকমালা

এই পুস্তকে রয়েছে মোট ৪২টি গীতিকবিতা। গীতিকবিতাগুলোর কোনো শিরোনাম নেই। শুধু আছে রচনার সংখ্যা পরিচয়। এই বইয়ের গানগুলোতে যে রাগ ব্যবহার হয়েছে তা হল, ললিতা। ফকিরি হালকা সুর ও হালকা সুর নাম দিয়ে গানগুলোর সুর নির্দেশ করা হয়েছে। এই গানে যে সব তাল ব্যবহার করা হয়েছে, তা হল, ঠুমরি, গৌড় খেমটা, দাদরা, খেমটা, বাসমিরা, কাওয়ালি ও অদ্ধা।
'আশেকমালা' পুস্তকের প্রথম রচনাটির মধ্যে রয়েছে প্রভুভক্তির কথা। এই রচনাটির কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যায় :

"প্রণমি চরণে, দীনহীন সন্তানে
বিশ্বপতি তুমি পরমদয়াল।
করুণ নয়নে চাও দীন পানে
ভক্তিশূন্য আমি অধম সাওয়াল।"

'আশেকমালা' বইয়ে শুধু ভক্তিমূলক গানই স্থান পেয়েছে তা নয়। বরং আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে রাধা-বিচ্ছেদ সম্পর্কিত গানই বেশি। আগে প্রচলিত ছিল 'কানু বিনে গীত নাই'। রমেশ শীলও এই

---

২৫. মহসিন হোসাইন, *রমেশ শীল* (ঢাকা : যুক্ত, ২০০৯), পৃষ্ঠা ২৪

সত্যকে আঁকড়ে ছিলেন। তাই আমরা তাঁর 'আশেকমালা' বইয়েও দেখতে পাই রাধা-বিচ্ছেদ গান। এই বইয়ের তৃতীয় গানটির অংশবিশেষ :

"আর কী কুলমান এ শুনা যার শ্যামের বাঁশির গান।
বাঁশির সুরে প্রাণ হরে যমুনা বহে উজান ॥
হৃদয় কদম্ব মূলে বাজায়ে মোহন বাঁশি
প্রাণ বঁধুয়ার বাঁশির সুরে মন করিস উদাসী ॥"[২৬]

শান্তি ভাণ্ডার

রমেশ শীলের দ্বিতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ 'শান্তি ভাণ্ডার'। এই বইয়ে রয়েছে মোট ৪০টি গান। 'শান্তি ভাণ্ডার' বইয়ের গানগুলোতে যেসব তাল ব্যবহার করা হয়েছে তা হল; যৎ, দাদরা, গৌড়, খেমটা, কাহারবা, কাশ্মিরী, বৃন্দাবনী, কাওয়ালি, ঠুমরি, একতার ও অদ্ধা। 'শান্তি ভাণ্ডার' বইটির গানগুলোতে স্থান পেয়েছে সনাতন ধর্মীয় ভাবধারার গান, চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাণ্ডারী গান, ইসলাম ধর্মের প্রস্তুতিমূলক গান, গুরুবন্দনামূলক গান, মুর্শিদী গান গোপন সাধন-ভজনের গান ও উপদেশমূলক গান। 'শান্তি ভাণ্ডারে' প্রকাশ পাওয়া একটি ভাণ্ডারি গানের উদ্ধৃতি দেয়া হল :

"ভাণ্ডারি রহিম রহমান
কে বুঝিতে পারে তোমার কুদরোতির সান।
আরবে আহম্মদ ছিলে বোগদাদে বড় পিরহনে
খাজা হয়ে প্রকাশিলে চিস্তিয়া খান্দান।
চট্টগ্রামের উদয় হলে চার চরিকা প্রকাশিলে
মাইজভাণ্ডারে উড়াইলে নুরানি নিশান।
আদম খলিপা ইসা মুছা, ইছুপ, ইন্নুশ মুস্কিল কোশা
করিয়া দেখালে দিশা কোরানে প্রমাণ।
খাদেমহীন রমেশের উক্তি তোমার পদে যায় নাই ভক্তি
কোটি জন্মে নাহি তার মুক্তি করি অনুমান ॥"[২৭]

মুক্তির দরবার

'মুক্তির দরবার' বইয়ে আছে মোট ৩৮টি গীতি কবিতা। এই বইয়ের অধিকাংশ গানই মাইজভাণ্ডারীর পীর কেবলাকে নিয়ে লেখা। তবে 'মুক্তির দরবার' বইয়ের প্রথম গানটি ব্যতিক্রমধর্মী।

"দয়ার অবতার করুণা আঁধার এসেছ পাতাল তরাতে
মহিমা মহান, হয়ে কৃপাবান সত্যের সন্ধান জানাতে।
হতাশ নিরাশ, পাতকি দলে, অবগাহি তব পূর্ণ সলিলে
দেখায়ে নিবে পাপ পংকিলে তোমার করুণা ধারাতে।"
... 'মুক্তির দরবার' পুস্তকটি প্রথম প্রকাশ পায় বাংলা ১৩৪৪ সালে।[২৮]

নূরের দুনিয়া

'নূরের দুনিয়া' পুস্তকটির রচনাগুলোর বিষয়বস্তু হল, সৃষ্টিতত্ত্ব, মাইজভাণ্ডারী পীর ও আধ্যাত্মিক ভাবনা। এই বইয়ের উপদেশমূলক একটি গানের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল :

---

২৬. মহসিন হোসাইন, *রমেশ শীল* (ঢাকা : যুক্ত, ২০০৯), পৃষ্ঠা ২৫
২৭. মহসিন হোসাইন, *রমেশ শীল* (ঢাকা : যুক্ত, ২০০৯), পৃষ্ঠা ২৬
২৮. মহসিন হোসাইন, *রমেশ শীল* (ঢাকা : যুক্ত, ২০০৯), পৃষ্ঠা ২৭

"মন অহংকারে দিন কাটালি মানুষ হবি কেমন করে।
তোর সাধনা ভজন নষ্ট হইল; হিংসা নিন্দা অহংকারে ॥
জেলে ধোপা মুচি জাতি, এই সকল ব্যবসার খ্যাতি
মূলে সকল মানুষ জাতি, আর জাতি নেই এই সংসারে।"[২৯]

জীবন সাথী

'জীবন সাথী'র গানগুলো অধ্যাত্মবাদ নিয়ে রচনা করা। বিশেষ করে ইসলাম ধর্মকে আশ্রয় করে ভক্তিবাদই হল এর প্রাণরস। এখানে আরাধনামূলক গানের চেয়ে বেশি স্থান পেয়েছে ভালো, শুদ্ধ হওয়ার উপদেশ। কবিয়াল সংসারের দুঃখ-যাতনা থেকে মুক্ত হয়ে আধ্যাত্মিক সাধনা বলে পরপারে যেতে চান।

"বহু বাধা আছে যেই পথে
ভয় করলে তুই পারবি নারে পার হতে।
যত ঝড় ঝাপটা চালিয়ে যাবে অটল থাকবি তাহাতে।
বনে গেলে হিংস্র জন্তুর ভয়,
মান অপমান বিষয় বিত্ত ঘরেও কম নয়,
তোরে বাধা দেবে সকল সময়... ॥"[৩০]

সত্য দর্পণ

'সত্য দর্পণ' বইয়ে স্থান পেয়েছে আধ্যাত্মিক গান, মাইজভাণ্ডারী গান, সাধনতত্ত্বের গান। তবে এই বইয়ের প্রথম গানটিতে স্থান পেয়েছে বেদের দর্শন :

"সত্য পরমাত্মনে ভাব অনন্য মনে
সত্যের সন্ধানে থাক অনুক্ষণ,
এক নিত্য বিমল অচল নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ সনাতন ॥"
... 'সত্য দর্পণ' বইটির পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ সালে।[৩১]

ভাণ্ডারে মাওলা

গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারী হল এই গানগুলোর মূল বিষয়। মাইজভাণ্ডারীকে রমেশ শীল তাঁর সাধনাগুরু হিসেবে নির্ধারণ করে যেসব গান রচনা করেন তার অনেকগুলো এই বইয়ে স্থান পেয়েছে।

"ভাণ্ডারে ভাণ্ডারির কুদরত দেখবি আয়,
আজবা শানে খেলে আমার বাবা মাওলানায়।"

এই বইটি বেশ জনপ্রিয় হয় বিধায় এটির তিনটি সংস্করণ প্রকাশ হয়।[৩২]

বিচ্ছেদ তরঙ্গ বা হরিসংকীর্তন

'বিচ্ছেদ তরঙ্গ বা হরিসংকীর্তন' হল মহাপ্রভু চৈতন্যের প্রতি ভক্তি প্রকাশ। বইয়ের প্রথমে স্থান পেয়েছে বিচ্ছেদ তরঙ্গ বা বন্দনা। এরপর এসেছে আসর বন্দনা, নাগরি বিচ্ছেদ, শচিআক্ষেপ, গুরুভজন, রাই বিচ্ছেদ, শ্রীদাম বিচ্ছেদ, কৃষ্ণ বিচ্ছেদ ও গৌর ব্রজ যাত্রা। এই ধারার একটি গান হল :

---

২৯. মহসিন হোসাইন, *রমেশ শীল* (ঢাকা : যুক্ত, ২০০৯), পৃষ্ঠা ২৭
৩০. মহসিন হোসাইন, *রমেশ শীল* (ঢাকা : যুক্ত, ২০০৯), পৃষ্ঠা ২৭
৩১. মহসিন হোসাইন, *রমেশ শীল* (ঢাকা : যুক্ত, ২০০৯), পৃষ্ঠা ২৮
৩২. মহসিন হোসাইন, *রমেশ শীল* (ঢাকা : যুক্ত, ২০০৯), পৃষ্ঠা ২৮

"... কোথায় গেল অবলার পরাণ
তুমি বিনে পঞ্চপ্রাণে মদন হানে পঞ্চ বান।
মনেরে বুঝায়ে রাখি, প্রাণেত মানে না সখি
কায়ে রাখি এ পোড়া পরাণ।"[৩৩]

কবিয়াল রমেশ শীলের ৮টি গীতিকাব্য ছাড়াও তাঁর বেশ কিছু খণ্ড খণ্ড কবিতার সংকলন পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া আছে কয়েকটি অগ্রন্থিত রচনা। বেশ কয়েকটি চিঠিও পাওয়া গেছে।

কবিয়ালের মোট রচনার সংখ্যা কত তা বলা কঠিন। এক বিবরণীতে জানা যায়, কবিয়াল রমেশ শীলের পরলোকগমনের পরে তাঁর লেখা গান-কবিতা ১৮টি কাপড়ের পুটলিতে বাঁধা ছিল। এ থেকে বোঝা যায় সারাজীবনে যা তিনি লিখেছিলেন তার অতি সামান্য অংশই ছাপা হয়েছিল।

রমেশ শীলের পরলোক গমনের পরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী শুধু প্রাণহরণই নয় এদেশের মানুষের সমস্ত সম্পদ ধ্বংস করতে থাকে। মানুষের ধনসম্পদ লুট করে নিয়ে বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেবার চেষ্টা করে। দেশের এই দুঃসময়ে আরও অনেক পরিবারের মতো রমেশ শীলের পরিবারও রেহাই পায়নি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রাজাকাররা রমেশ শীলের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুন লাগানোর আগে তাঁর বাড়িতে লুটপাট চালানো হয়। এই সময় রাজাকাররা রমেশ শীলের লেখাবাঁধা পুটলিগুলো মূল্যহীন ভেবে পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে। পরে ১৮টি পুটলির ভেতর ১টি মাত্র পুটলি উদ্ধার করা গিয়েছিল। ওই পুটলির ভেতর থেকে বড় একটি বাঁধাই খাতা ও ছোট দুটি খাতার লেখাগুলো কোনোভাবে পড়া সম্ভব হয়।

উদ্ধার করা পাণ্ডুলিপি দুটিতে পাওয়া যায় সাতগাছিয়া পীর মুলতানপুরির উদ্দেশে লেখা ২৪টি গান। এই ২৪টি গানের ১৩টি গান সম্পূর্ণ নতুন। দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপির কপির লেখা ছিল 'দেশ প্রেম'। এই পাণ্ডুলিপিতে লেখা ছিল ১৯টি গান। পরবর্তীকালে 'দেশপ্রেম' পৃথক সংকলন হিসেবে প্রকাশিত হয়।

কবিয়াল রমেশ শীলের অপ্রকাশিত ও অগ্রন্থিত লেখাগুলো ৩টি পুস্তকে ছাপা হয়েছে। এইগুলো হল 'বিধবা বিবাহ; বা 'সমাজ রহস্য', 'চট্টল পরিচয়' বা 'চট্টল প্রশস্তি' ও 'দেশ পরিচয়'। এছাড়া ১২০টি অপ্রকাশিত রচনাও পরবর্তীকালে প্রকাশ পেয়েছে।

রমেশ শীল দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন। তাঁর কর্মজীবনও কেটেছিল নানা ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে। তাই বিভিন্ন সময়ে যোগাযোগ রক্ষার জন্য তিনি বিভিন্ন লোকের কাছে চিঠি লিখেছিলেন। কবিয়াল রমেশ শীলের লেখা ১৭টি চিঠি পাওয়া গিয়েছিল। এছাড়া আরও পাওয়া তাঁর লেখা একটি আবেদনপত্র। চিঠিগুলো ও আবেদনপত্রটি কবিয়াল রমেশ শীলের গদ্য রচনার উদাহরণ হয়ে আছে।

কবিয়াল রমেশ শীলের রচনায় শিরোনাম নেই। সম্ভবত এর কারণ, রমেশ শীল যেহেতু একজন গীতিকার, তাই তিনি তাঁর রচনাগুলো গানের আঙ্গিকে সাজিয়ে ছিলেন। সাধারণত গানের কোনো শিরোনাম থাকে না, তাই রমেশ শীলও তাঁর রচনার কোনো শিরোনাম দেননি। এই রকম শিরোনামহীন রচনা নিয়ে বেশ কয়েকটি পুস্তিকা পরবর্তীকালে প্রকাশ পেয়েছে। আবার খণ্ড কবিতাগুলোও প্রকাশ পেয়েছে রমেশ শীলের রচনাবলিতে। এই পর্যায়ে রমেশ শীলের ২৫টি পুস্তক কিংবা প্রচারপুস্তিকার পরিচয় পাওয়া যায়। এইগুলো হল যথাক্রমে ১. দেশের গান (১৩৫২ সালে প্রকাশিত প্রথম দেশাত্মবোধক গানের বই), ২. শীল সমিতির কবিতা (শীল সম্প্রদায়ের দারিদ্র্যের চিত্রকল্প বিষয়ক কবিতা), ৩. লোক কল্যাণ (বিপ্লবী গণসংগীত), ৪. ভোট রহস্য (১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ ও দেশবিভাগের পরে পাকিস্তানের নির্বাচন বিষয়ক), ৫. পাকিস্তান সংগীত (পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পর রচিত সংগীত), ৬. মানববন্ধু (মাইজভাণ্ডারী শরিফের পীরকে নিয়ে লেখা গান), ৭ এস্কে সিরাজিয়া (পীর সিরাজ বাবাকে নিয়ে লেখা গান), ৮, মহাকাব্যবহি (শীল সম্প্রদায়ের বিয়ের মন্ত্র),

৩৩. মহসিন হোসাইন, *রমেশ শীল* (ঢাকা : যুক্ত, ২০০৯), পৃষ্ঠা ২৯

৯. ভণ্ড সাধুর কবিতা (ভণ্ডসাধুর কর্মকাণ্ড ভিত্তিক রচনা), ১০. দেশ দরদি গানের বহি (দেশাত্মবোধক গান), ১১. বদলতি জামানা (মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে নিয়ে রচিত গনের সংকলন), ১২. চাঁটগাঁওয়ের পল্লীগীতি (চট্টগ্রামের পল্লির গানের সংকলন), ১৩. ১৩৬৭ সালের কবিতা (১৯৬০ সালের ঘূর্ণিঝড়ের বর্ণনা নিয়ে রচিত পদ্য ও গান), ১৪. চাঁটগায়ের পল্লীগীতি দ্বিতীয় ভাগ, ১৫. ১৯৬৩ সালের তুফানের কবিতা, ১৬. শান্তির কবিতা (১৯৬৪ সালে জানুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ওপর রচিত পদ্য ওগান), ১৭. বিধবা বিবাহ বা সমাজ রহস্য, ১৮. চট্টল পরিচয় বা চট্টল প্রশস্তি, ১৯. দেশ পরিচয় (দেশাত্মবোধ গান), ২০. সত্য দর্শন, ২১. দেশ প্রেম, ২২. দেশাত্মবোধক গান, ২৩. মরমি গান, ২৪. লোকগীতি, ২৫. বিবিধ।[৩৪]

শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান, সম্মাননা

কবিয়াল রমেশ শীল অতি সাধারণ মানুষের কাতারে থেকে জীবন যাপন করেছেন। তাঁর মনে ছিল না কোনো অহংকার। সারাজীবন মানুষকে ভালোবেসে মানুষের জন্য গান রচনা করেছেন। নিজের দুঃখকষ্ট সবকিছু ঢেকে অন্যদের আনন্দ দিয়েছেন। জীবন-জীবিকার জন্য সামান্যই অর্থ ছিল তাঁর কাম্য। এইভাবেই কেটে গেছে এই খ্যাতিমান কবিয়ালের সারাজীবন। জীবনে কারও কাছে কারও বিরুদ্ধে কোনো অনুযোগ করেননি। কারও অকল্যাণ চিন্তা করেননি।

সহজ-সরল জীবনের অধিকারী মানুষ রমেশ শীল বিশেষ সম্মানলাভের জন্য কারও লেজুড়বৃত্তি করতেন না কখনও। ভাববাদী হয়েও তিনি ছিলেন বাস্তবচিন্তা ও চেতনার অধিকারী।

রমেশ শীল সারাজীবন কাটিয়েছেন গান রচনা ও সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে। জীবনে অন্য কোনো প্রাপ্তির কথা ভাবেননি। তাঁর জীবনের বড় সম্মাননা হল মানুষের কাছ থেকে পাওয়া ভালোবাসা, যে ভালোবাসার কোনো মৃত্যু নেই। কারণ সাধারণ মানুষের দেবার মতো কোনো পার্থিব সম্পদ থাকে না– শ্রদ্ধা-ভালোবাসাই হল দেবার মতো একমাত্র সম্পদ তাদের। রমেশ শীল যে অক্ষয় সম্মান পেয়েছিলেন তার চেয়ে বড় আর কী থাকতে পারে। সোনা-রুপা কিংবা অর্থের পরিমাপে তা কোনো ভাবে তুলনা করা যাবে না! এরপরও তাঁর জীবনে জাগতিক সম্মান ও বড় বড় কিছু অনুষ্ঠানে যোগ দেবার মতো ঘটনা ঘটেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পরে সারা ভারতের রাজবন্দিদের মুক্তির জন্য কোলকাতাসহ বড় বড় শহরে আন্দোলন শুরু হয়। কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে এই আন্দোলন হয়েছিল। কোলকাতায় গঠন হয়েছিল 'নিখিল বঙ্গ বন্দি মুক্তি কমিটি'। এই কমিটি রাজবন্দিদের পরিবার-পরিজনকে সাহায্য করার জন্য উদ্যোগ নেয়। তাঁদের উদ্দেশ্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করে তা তাঁরা রাজবন্দি পরিবারকে দেবেন। এই উদ্দেশ্যে কোলকাতায় আয়োজন করা হয়েছিল কবিগানের। এই কবিগানের আসরে যোগ দিয়েছিলেন রমেশ শীল ও কবিয়াল ফণী বড়ুয়া। এই কবিগানের অনুষ্ঠান ছিল রমেশ শীলের জন্য খুব সম্মানজক ও স্মরণীয়। এই গান শ্রোতাদের শুনতে হয়েছিল টিকেট কেটে। এই আসরে শ্রোতার সংখ্যা ছিল প্রায় ২০ হাজার।

রমেশ শীল এক সময় পত্রপত্রিকায় লেখালেখির সম্মান অর্জন করেছিলেন। তাঁর আগে এই বিরল সম্মান কোনো কবিয়ালের ভাগ্যে জোটেনি। তিনি পঞ্চাশ দশকের শেষ দিকে 'সমবায়' পত্রিকায় লিখতেন দেশাত্মবোধক গান। এই গানগুলো তখন বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

পঞ্চাশের দশকে রমেশ শীলের সাধনা আরেকটি সম্মানজনক অবস্থায় পৌঁছে। সেটি হল সরকারি প্রচারমূলক 'টকি'তে প্রচারের জন্য গান রচনা করা। বেশ কিছু গানে তিনি নিজেই কণ্ঠ দিয়েছিলেন। এই প্রচারমূলক টকিগুলো তৈরি হয়েছিল সেই যুগে প্রাদেশিক সমবায় পরিদপ্তর থেকে। টকি'র পরিচালক ছিলেন বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী কলিম শরাফী।

---

৩৪. মহসিন হোসাইন, *রমেশ শীল* (ঢাকা : যুক্ত, ২০০৯), পৃষ্ঠা ২৯-৩১

কবিয়াল রমেশ শীল লোকজ সংগীতধারার সাধক। এই ধারাকে তিনি বাঁচিয়ে রাখার জন্য অন্যান্য এলাকার কবিয়ালদের সঙ্গে নিয়ে গত শতাব্দীর ত্রিশের দশকে গঠন করেন 'কবি সমিতি'। অনেকের মতে এই সংগঠনের নাম ছিল 'রমেশ উদ্বোধন কবি সংঘ'। সমিতি কিংবা সংঘের সম্মানজনক সভাপতির পদটি দেয়া হয়েছিল কবিয়াল রমেশ শীলকে। নানা কারণে এই সমিতির কার্যক্রমে স্থবিরতা দেখা দেয়। পরে চল্লিশের দশকে রমেশ শীল এটিকে আবার চাঙ্গা করে তোলেন। সেবারেও তাঁর পদ ছিল সভাপতিরই।[৩৫]

১৯৪৫ সালে রমেশ শীল কবিগান নিয়ে বর্ধমানের হাট গোবিন্দপুরে কৃষক সভার অষ্টম প্রাদেশিক সম্মেলনে কবিগান পরিবেশন করেন। সে যুগের কমিউনিস্টদের নেতা-কর্মীদের সামনে তাঁকে গান পরিবেশন করতে হয়। এই বছরই কোলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন'। এই অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয়েছিল কবিগানের। কোলকাতার মুহম্মদ আলী পার্কে কবিগানের আসরে রমেশ শীলের প্রতিপক্ষ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের দেয়া পুরস্কারধন্য কবিয়াল শেখ গোমানী দেওয়ান। পরের দিন সকালের পত্রিকায় রমেশ শীলের খুব প্রশংসা করা হয়। পরে রমেশ শীলকে সম্বর্ধনা দেয়া হয়।
১৯৪৮ সালে কোলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে আবারও বসে কবিগানের আসর। এই আসরে প্রচুর লোক সমাগম হয়। এখানে কবিয়াল রমেশ শীলকে শ্রেষ্ঠ কবিয়ালের স্বর্ণপদক দেয়া হয়।

১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় শান্তির জন্য নিখিল ভারতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন ও উৎসব (All India Cultural conference and festival for Peace)। লক্ষ্য ছিল শান্তির সপক্ষের সাংস্কৃতিক কর্মীদের সমবেত করে শান্তির জন্য সর্বভারতীয় পর্যায়ে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন। রমেশ শীল একজন আমন্ত্রিত প্রতিনিধি হিসেবে এই সম্মেলনে যোগ দেন।

পাকিস্তানি স্বৈরশাসনের প্রতিবাদে পঞ্চাশের দশকে দেশের প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ ও নেতৃবৃন্দ এক সারিতে দাঁড়িয়ে যান। ঠিক সেই সময়ে ১৯৫৪ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় পূর্ববঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন। এই সম্মেলনের লোকসাহিত্য শাখার সভাপতির পদ দেয়া হয়েছিল কবিয়াল রমেশ শীলকে। সভাপতি হিসেবে রমেশ শীল একখানি মূল্যবান ভাষণও দিয়েছিলেন। ঠিক একই বছরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল টাঙ্গাইলের কাগমারিতে বিশাল রাজনৈতিক সম্মেলন। এই সম্মেলনে শুধু প্রগতিশীল রাজনীতিকদেরই দেখা যায়নি– সেখানে গিয়েছিলেন শিল্প, সাহিত্য, সংগীত ও সংস্কৃতির কৃতি মানুষেরা। পশ্চিমবাংলার তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লেখকও উপস্থিত হয়েছিলেন কাগমারিতে মাওলানা ভাসানীর ডাকে। সেই সম্মেলনে রমেশ শীলেরও ডাক পড়েছিল। তিনি সেখানে গান পরিবেশন করেছিলেন। সম্মেলন কর্তৃপক্ষ তাঁকে 'শ্রেষ্ঠ কবিয়াল' সম্মাননায় ভূষিত করেন।
১৯৬২ সালের ১ জুলাই বুলবুল একাডেমির সপ্তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে কবিয়াল রমেশ শীলকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে আয়োজিত এ সভার সভাপতি ছিলেন ওস্তাদ আয়েত আলী খান। সংবর্ধনা সভায় কবিয়ালকে যে মানপত্র উপহার দেওয়া হয় তা ছিল মূল্যায়নধর্মী। মানপত্রে বলা হয় :

> ... মহান লোক-সংস্কৃতির যোগ্য উত্তরাধকার বহন করছেন আপনি। আপনার গানে এই দেশের লোকসাধারণের মর্মবাণী রূপ পেয়েছে।
> ... সার্থক শিল্পীর ও সচেতন নাগরিকের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে আপনার মধ্যে। অসাধারণ শিল্প-সাফল্য জনসাধারণের সঙ্গে আপনার দূরত্ব রচনা করে নি, বরঞ্চ নৈকট্য সৃষ্টি করেছে।...

১৯৬২ সালে 'বাফা' সাংস্কৃতিক সংসদ কবিয়াল রমেশ শীলকে পূর্ব পাকিস্তানের 'শ্রেষ্ঠ লোককবি'র সম্মান প্রদান করে। বাফা তাঁকে একটি সম্মাননা স্মারকসহ অভিনন্দন পত্র দিয়েছিল। কবিয়ালের প্রতি অভিনন্দনপত্র বা মানপত্রে লেখা হয়েছিল :

---

৩৫. মহসিন হোসাইন, *রমেশ শীল* (ঢাকা : যুক্ত, ২০০৯), পৃষ্ঠা ৩৪

> 'সাধারণ জনের প্রতিনিধি হিসাবে (আপনি) গানের মাধ্যমেই ক্ষুধার অবসান, তৃষ্ণার শান্তি, হিংসার অবলুপ্তি ও সৌন্দর্যলোক সৃষ্টির জন্য সংগ্রাম করেছেন। আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাসে আপনার নাম উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।'[৩৬]

এরপর ১৯৬৪ সালে চট্টগ্রাম ও ঢাকায় কবিয়াল রমেশ শীলকে পৃথকভাবে সম্বর্ধনা দেয়া হয়। দুই স্থানেই তাঁকে 'শ্রেষ্ঠ লোককবি' উপাধি দেয়া হয়।

রমেশ শীল দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন তত দিনই সৃষ্টির কাজে নিজেকে মগ্ন রেখেছিলেন। ক্লান্তি বলে কিছু ছিল না তাঁর অভিধানে। কাজের মধ্য দিয়েই জীবনকে করে তুলেছিলেন গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার সব কাহিনি আর আমাদের পক্ষে জানবার উপায় নেই। তাঁর জীবনের বিশেষ ঘটনাগুলোর সামান্যই জানা গেছে।

রাজনৈতিক প্রতিকূলতা ছাড়াও রমেশ শীলের জীবনে সামাজিক প্রতিকূলতাও কম ছিল না। রমেশ শীল মাইজভাণ্ডারের মুসলমান পীরের ওপর প্রচুর আধ্যাত্মিক গান রচনা করেন। তিনি সারাজীবন জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে গান করে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়কারী সমাজসচেতন কবিয়াল।

বাংলাদেশ ও ভারত তথা পূর্ব-পশ্চিম বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবিয়াল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন রমেশ শীল। কবিয়ালদের রাজ্যের রাজা তিনি। তাঁকে বিবেচনা করা হয় সে সাম্রাজ্যের মুকুটহীন সম্রাট হিসেবে। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিয়াল।

---

৩৬. মহসিন হোসাইন, *রমেশ শীল* (ঢাকা : যুক্ত, ২০০৯), পৃষ্ঠা ৩৬

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা কবিগানের ধারায় বিজয় সরকারের ভূমিকা

কবিয়াল বিজয় সরকার আমাদের পল্লিসংগীতাঙ্গনের একজন কিংবদন্তি প্রাণপুরুষ। বাংলাদেশ তথা ভারতীয় ভূখণ্ডে যে সকল কবিয়াল তাঁদের সৃষ্টিমাহাত্ম্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে বিজয় সরকার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল নক্ষত্র। বিজয় সরকার অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গে কবিগান পরিবেশন করে আসছেন। গ্রামবাংলার মানুষের কাছে বিজয় সরকার অতিপ্রিয় ও পরিচিত নাম।

কবিয়াল বিজয় সরকার ১৯০৩ সনের ২০ ফেব্রুয়ারি নড়াইল জেলার সদর থানার ডুমদি গ্রামে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের বৈরাগী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বিজয় সরকারের পূর্বপুরুষ বৈষ্ণবগুরু নাটু বৈরাগী ও উদ্ভব বৈরাগী। তাঁর পিতার নাম নবকৃষ্ণ বৈরাগী ও মায়ের নাম হিমালয় কুমারী। বিজয় সরকারের সম্ভবত ঊর্ধ্বতন ৯ম পুরুষ ছিলেন বিখ্যাত সাধক নাটু বৈরাগী। আর নাটু বৈরাগীর পুত্র ছিলেন উদ্ধব বৈরাগী। বিজয়ের পিতামহের নাম গোপালচন্দ্র বৈরাগী। প্রপিতামহের নাম সনাতন বৈরাগী। বিজয়ের পিতামাতা যথাক্রমে নবকৃষ্ণ বৈরাগী ও হিমালয় কুমারী। মা হিমালয় কুমারীর বাবার বাড়ি ছিল নড়াইলের রামসিধি গ্রামে। তিনি ছিলেন এক চাষি পরিবারের কন্যা। বিজয় সরকারের বংশাবলি সম্পর্কে যেসব তথ্য পাওয়া গেয়েছে সে আলোকে তাঁর বংশলতিকা দাঁড়ায় এমন :

সনাতন বৈরাগী
↓
গোপাল বৈরাগী
↓
নবকৃষ্ণ বৈরাগী
↓
কবিয়াল বিজয় সরকার (অধিকারী)
↓
কানন বিশ্বাস (বুলবুলি) মঞ্জু কাজল অধিকারীবাদল অধিকারী[১]

জনাব মহসিন হোসাইন তাঁর রচিত গ্রন্থে বিজয় সরকারের পরিচিতি দিয়েছেন এভাবে :

> 'গোপালের পুত্র নবকৃষ্ণ দৈহিক শক্তিতে বলীয়ান ছিলেন; নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর বিশেষ মর্যাদা ছিল। দৈহিক শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার জন্য তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। বৈরাগী বংশের সন্তান তরুণ বিজয় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বংশের নাম (পদবি) পরিবর্তন করেন। বিজয় সরকারের যৌবনকাল থেকেই বৈরাগীর পরিবর্তে তাঁকে অধিকারী লিখতে দেখা যায়। পরবর্তীতে কবিগানের সুবাদে বিজয় সরকার-এর 'অধিকারী' খেতাব ম্লান হয়ে 'সরকার' খেতাবেই তিনি অধিক পরিচিতি পেয়ে আসছেন।[২]

---

১. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ১০

২. মহসিন হোসাইন, *কবিয়াল বিজয় সরকারের জীবন ও সঙ্গীত* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪), পৃষ্ঠা ১১

কবি পরিচিতি

বিজয় সরকারের পিতা নবকৃষ্ণ ছিলেন পিতার ৬ষ্ঠ সন্তান। তিনি সামান্য লেখাপড়া জানতেন। তিনি জমি চাষাবাদ করে সংসার নির্বাহ করতেন। তবে তিনি সংগীতের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। নবকৃষ্ণ বৈরাগীর পাঁচ পুত্র ও পাঁচ কন্যার মধ্যে বিজয় সরকার ছিলেন দশম বা শেষ সন্তান। শৈশবে পরিবারের সবার আন্তরিক স্নেহে পালিত হয়েছিলেন তিনি। বড় সংসারের গৃহিণী হয়ে মা হিমালয় কুমারী বিজয়কে বেশি সময় দিতে পারতেন না। তাই বিজয়ের সার্বক্ষণিক দেখা-শোনার জন্য বড়দিদি সোহাগীই নিয়োজিত ছিলেন। রাতের বেলায় চাঁদপনা ছোট ভাইটিকে নিয়ে নানা ধরনের শিশুতোষ কিস্‌সা-কাহিনি শোনাতেন সোহাগী। দিনের বেলায় সমবয়সী সাথিদের সাথে কখনও-বা বড়দের সাথে নৌকা কিংবা ডোঙায় চড়ে নাল (শাপলা) ও পদ্মফুল তুলতে যেতেন। বছরের অধিকাংশ সময়ই নবকৃষ্ণের বাড়িটি জলবেষ্টিত থাকায় শাপলা আর পদ্মফুলের সৌরভ বিজয়ের কিশোর মনকে আন্দোলিত করত। আগ্রাহাটি বিলের পদ্মফুল আর পদ্মনাল সংগ্রহের অনেক কাহিনি বিজয় সরকার স্মৃতি থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে বলতেন।[৩] বিজয়ের পূর্ণ বয়সে যখন তিনি সার্থক গান রচনায় হাত দেন তখন তাঁর বাল্যের দেখা আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্রে দেখা বিলের যে বিশ্বস্ত অনুপম ছবি অঙ্কন করেছেন সত্যি তার তুলনা হয় না। মায়ের অদর্শনে বিজয়ের একটি প্রহরও কাটত না। হিমালয়কুমারী একবার নবদ্বীপ-তীর্থে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। সব ঠিকঠাক, কিন্তু বাদ সাধলেন বিজয়। মায়ের কাছে তাঁর আবদার, তুমি চলে গেলে আমি বাঁচব না। হিমালয়কুমারীকে সেবার তাঁর নবদ্বীপ যাত্রা বন্ধ করতে হল। কারণ যানবাহনের স্বল্পতার যুগে শিশু বিজয়কে নবদ্বীপ নিয়ে যাওয়া ছিল দুঃসাধ্য। বাবা নবকৃষ্ণ বিজয়কে বাড়িতে থাকাকালে চোখে চোখে রাখতেন। বিজয়ের কোনোরকম অযত্ন হলে রেগে-মেগে তিনি অস্থির হয়ে উঠতেন। ধারণা করা যায়, বাড়ির অদূরে কিশোর বিজয় তাঁর মায়ের সাথে বিভিন্ন মেলা ও উৎসবে যোগ দিয়েছেন। একবার নড়াইল জেলার কালিয়া থানার চালনা কবিগান-এর বায়না রক্ষা করতে গেলে চালনার পাশের গ্রাম লক্ষ্মীপুরের চান্দের দোয়া (চাঁদের দহ প্রাচীন নদীর দহ) দেখিয়ে বিজয় সরকার তাঁর জীবনীকার জনাব মহসিন হোসাইনকে বলেছিলেন,

> 'এই দোয়ায় আমি ছোটবেলায় একবার আমার মায়ের সাথে মানত দিতে আর পুণ্যস্নান করতে এসেছিলাম।'[৪]

কবিয়াল বিজয় কিশোর বয়সেই লক্ষ্মীপাশার কালীবাড়ি, ওড়াকান্দির (গোপালগঞ্জ) হরিঠাকুরের মেলায়ও তাঁর নিকটআত্মীয়দের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। লোকসংস্কৃতি ও গ্রামীণ লোকঐতিহ্যের সাথে তাঁর অজান্তেই তিনি একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন।

কবিয়াল বিজয় সরকার তাঁর পাঁচ সহোদর ও সহোদরার কথা মনে করতে পারতেন। বাকি সহোদর-সহোদররা সম্ভবত তাঁর জ্ঞান উন্মেষের আগেই বাল্যে কিংবা কৈশোরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বিজয়ের মধ্যম সহোদর কেশবকুমার বৈরাগী যুবক বয়সেই অবিবাহিত অবস্থায় মারা যান। এছাড়া তাঁর ভাই শ্রীমন্ত, হৃদয়নাথ, পুলিন বিহারী ও বোন সোহাগী যথাসময়ে বিয়ে করেন এবং পরিণত বয়সে পুত্রকন্যাদি রেখে পরলোকগমন করেন। কবিয়াল বিজয় সরকার যখন দশম শ্রেণির ছাত্র তখন তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। ইতোমধ্যে তাঁর স্নেহময়ী মা হিমালয় কুমারীও পরলোকে পাড়ি জমান। ১৯৪৭ সনের দেশবিভাগের পরে বিজয় সরকারের যৌথ পরিবারের অনেকেই বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে পড়েন।

শিক্ষাজীবন

ছোটবেলায়ই শিশু বিজয়ের মধ্যে বিদ্যা অর্জনের ঝোঁক দেখা যায়। অপেক্ষাকৃত বয়সী বালকদের সাথে তিনি পাঠশালায় যেতে চাইতেন। পাঠশালার প্রতি এই অভাবনীয় আকর্ষণ দেখে পিতা নবকৃষ্ণ

---

৩. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ১১

৪. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ১২

তাঁর এক ভাইপো অভয়চন্দ্র বৈরাগীকে নিয়োগ করেন বিজয়ের পড়া-লেখার জন্য। অভয় পাঠশালার যাওয়া-আসা করতেন। আর এই অভয় বৈরাগীর হাতে বালক বিজয়ের হাতেখড়ি হয়। অভয় বিজয় সরকারের থেকে কয়েক বছরের বড় ছিলেন। অভয়ের হাতে বিজয় হাতেখড়ি পেয়ে তালপাতায় সুন্দর সুন্দর অক্ষরগুলো বসাতে লাগলেন। বিজয়ের হাতের লেখা দেখে তাঁর বাবা ও মায়ের মন ভরে গেল। এবার তাঁরা তাঁকে গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্তি করে দেওয়ার তাগিদ অনুভব করলেন। তখনকার দিনে ডুমদি গ্রামের মধ্যপাড়ায় একটি পাঠশালা ছিল। এটিকে বলা হত এল পি স্কুল বা লোয়ার প্রাইমারি স্কুল। অর্থাৎ নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামবাসী বিদ্যালয়টিকে বলত 'নেপালপণ্ডিতের পাঠশালা।'

পাঠশালার শিক্ষক ছিলেন ডুমদি গ্রামনিবাসী নেপাল বিশ্বাস। নেপাল বিশ্বাস নানাগুণে গুণী ছিলেন। তিনি ছিলেন শিক্ষক, তেমনি ছিলেন উচ্চাঙ্গ সংগীতজ্ঞানের অধিকারী। সে যুগের বিশিষ্ট ঢোলবাজিয়ে। এছাড়া যাত্রাদলের অভিনেতা ও পরিচালক। নেপাল বিশ্বাস মধুর কণ্ঠে সংগীত পরিবেশন করতেন।

বিজয় সরকারের বেলায় একটি জিনিস সেই বাল্যকালে যুগপৎভাবে শুরু হয়েছিল– তা হল একাডেমিক শিক্ষার আয়োজন ও ভবিষ্যতের গায়ক-কবিয়াল হওয়ার জন্য সংগীতবিদ্যা অর্জনের আপ্রাণ চেষ্টা। ডুমদি মধ্যপাড়া এল পি স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর শিক্ষক নেপাল পণ্ডিত ঘটনাক্রমে জানতে পারলেন তাঁর ছাত্র বিজয় গ্রামে মেয়েদের সাথে বিয়ের গান ও জাগরণ গান গাওয়ায় পারদর্শী। দূর থেকে এক মেয়েলি আসরে নেপাল পণ্ডিত কিশোর বিজয়ের মধুক্ষরা কণ্ঠ শুনে বিস্মিত হলেন। এরপর নেপাল বিশ্বাস তাঁর সাধ্যমতো বিজয়কে গান শেখাতে লাগলেন। নেপাল চেয়েছিলেন, তাঁর ছাত্র বিজয় পড়াশোনায় যেমন ভালো করবে তেমনি হবে সুকণ্ঠের নায়ক।

> 'এইভাবে বিজয় সরকারের সংগীতে হাতে খড়ি হয়। তিনি চেয়েছিলেন বিজয় পড়াশোনায় যেমন অদ্বিতীয় হবে, অভিনয় ও সংগীতের হবে খ্যাতিমান। নেপালবাবু তাঁর পাঠশালার চারজন কিশোরকে যাত্রাদলের জন্য নাচ ও গান শিক্ষা দিয়েছিলেন। বিজয় সরকার ছাড়া তারা হলেন, উপেন বিশ্বাস, উপেন মজুমদার ও পুলিন বিশ্বাস। এই চারজন কিশোর সে সময়ে যাত্রাদলে নেচে ও গেয়ে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। কিশোর বিজয় 'অনন্ত মাহাত্ম্য' যাত্রায় 'চিত্রাঙ্গদ'-এর পুত্রের ভূমিকায় প্রথম অভিনয় করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণে করেন।'[৫]

'অনন্ত মাহাত্ম' যাত্রায় অভিনয়ের মাধ্যমে কিশোর বিজয়ের সংগীত, নৃত্য ও অভিনয়দক্ষতা সবার প্রশংসা অর্জন করে।

লোয়ার পাঠশালায় অধ্যয়ন শেষে বিজয়ের মেজদাদা হৃদয়নাথ বৈরাগীর আন্তরিক ইচ্ছেয় পার্শ্ববর্তী গ্রাম হোগলাডাঙ্গা ইউ পি স্কুলে বিজয় ভর্তি হন। এই সময় কিশোর বিজয়ের মধ্যে সংগীতপ্রতিভার স্বভাবজাত কবিপ্রতিভার উন্মেষ ঘটে। সে সময় ঘটনাক্রমে ডুমদি গ্রামে উপস্থিত হয়েছিলেন ফরিদপুরের বিখ্যাত কীর্তনগীতিকার চণ্ডি গোঁসাই। গান রচয়িতা হিসেবে সে যুগে চণ্ডি গোঁসাইয়ের নাম মুখে মুখে ফিরত।

> 'আজো গ্রাম্য প্রাচীন গায়কদের কণ্ঠে চণ্ডি গোঁসাইয়ের সুমধুর পদ শোনা যায়। বিজয়ের মুখে গান শুনে চণ্ডি গোঁসাই ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, "ভগবান তোমাকে একদিন বড়ো গায়ক করবেন।" হোগলাডাঙ্গা ইউ পি স্কুলে (আপার প্রাইমারি স্কুল) পাঠ্যাবস্থায় সবুজ ধানক্ষেতের আলপথ দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে এক অনির্বচনীয় ভাবাবেগে আপন মনে গান গাহিতে গাহিতে চলিতেন তিনি। সেই গানের কথা কাহারও নিকট হইতে শিক্ষা করা নহে, ধার করা নহে সেই ভাব, তাহা ছিল একান্ত আপনার, বাক্য ও মনের অগোচরে কেহ যেন তাঁহার মর্মপটে আসিয়া ভাব, সুর ও কথা যোগাইত। কোন কোন দিন বিজয় কাঁধের ছাতার বাটে টোকা মারিতে মারিতে তাৎক্ষণিক রচিত "দাতাকর্ণ" কিম্বা "রামের বনবাস" পালাটি গাহিতে গাহিতে বিদ্যালয়ের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইতেন। ইহাতে সহপাঠীদের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। ঐ সময়ই মুখে মুখে কিশোর বিজয় যে কোন বিষয়ের উপর পাঁচালি রচনা করিয়া শ্রোতাদের মুগ্ধ করিতে পারিতেন। ইহাতে গ্রামীণ মানুষেরা বিজয়ের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তিনি পুলিনবিহালী, পঞ্চানন মজুমদার প্রমুখ গ্রাম্য কবিদের সঙ্গে পাল্লায় পাঁচালি

৫. মহসিন হোসাইন, *কবিয়াল বিজয় সরকারের জীবন ও সঙ্গীত* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪), পৃষ্ঠা ১২

গাহিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কিশোর বয়সেই তিনি তাঁহার বিশেষ সাঙ্গীতিক ঠাটের জন্য খ্যাতি অর্জন করিতে সমর্থ হন।'[৬]

হোগলাডাঙ্গা ইউ পি স্কুলে অধ্যয়নকালে বিজয় শিক্ষক রামচরণ বিশ্বাসের বিশেষ সহযোগিতা ও আন্তরিক সাহায্য পেয়েছিলেন। রামচরণ চাইতেন, বিজয় পড়াশোনায় যেমন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবেন তেমনি সংগীতবিদ্যায়ও পারদর্শী হবেন। কারণ হোগলাডাঙ্গা স্কুলে অবস্থানকালেও বিজয় সংগীত ও অভিনয়কে আগের মতো আঁকড়ে ধরেন। তাতে কোনো কোনো লোক বিজয়ের পিতা নবকৃষ্ণের কাছে বিজয়ের সংগীতশিক্ষা নিয়ে আপত্তি তোলেন। শিক্ষক রামচরণ বিশ্বাস নবকৃষ্ণকে জানালেন, সংগীত একটি বিশেষ বিদ্যা, এটি শিক্ষা করায় কোনো দোষ নেই। বরঞ্চ সংগীত আয়ত্ত করতে পারলে ভালো। সম্ভবত বিজয়ের সংগীতশিক্ষার বিষয়ে তাঁর দাদা হৃদয়নাথ বিরোধিতা করেছিলেন। ইতোপূর্বে হৃদয়নাথ ও আরো কয়েকজনের প্ররোচনায় ডুমদি মধ্যপাড়া লোয়ার প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা থেকে নেপাল পণ্ডিতকে সরিয়ে গ্রামবাসী নিয়োগ দিয়েছিলেন গোপালগঞ্জের চরভাটপাড়া গ্রামের রাজেন্দ্রনাথ বিশ্বাসকে। রাজেন্দ্রনাথের কাছেও বিজয় কিছুদিনের জন্য লেখাপড়া করেছিলেন।

নেপালপণ্ডিত জাত গাইয়ে ছিলেন। ডুমদি মধ্যপাড়ার শিক্ষকতা গেলেও তাঁর সংগীত-প্রীতি শেষ হয়নি। তিনি বিজয়সহ চারটি প্রশিক্ষণ দেওয়া কিশোরকে নিয়ে নড়াইলের চন্দ্রকান্ত ভদ্রের যাত্রাদলে যোগ দেন। বিজয় এই সময় হোগলাডাঙ্গা ইউ পি স্কুলের ছাত্র। চন্দ্রকান্ত ভদ্রের দলে সম্ভবত কাজের খুব অনুকূল পরিবেশ ছিল না। তাই নেপালপণ্ডিত বিজয়সহ চারটি কিশোরকে নিয়ে নড়াইলের জমিদারদের এক শরিক মনীন্দ্রনাথ রায়ের সংগঠিত যাত্রা দলে যোগ দেন। এই দলে বিজয় সরকার 'হরিশ্চন্দ্র', 'সুরথ উদ্ধার', 'রামবনবাস', 'সীতাহরণ' প্রভৃতি যাত্রানাটকে অভিনয় ও বিবেকসংগীত পরিবেশন করে বিভিন্ন মহল থেকে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। বিজয়য়ের সুরেলা কণ্ঠে যাত্রার শ্রোতা-দর্শকেরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেতেন। তাঁর বিদ্যা-অর্জন ও সংগীতচর্চা সমান্তরাল ধারায় চলেছিল। বিজয় সরকার কিশোর বয়সে অতি চঞ্চল ছিলেন। হোগলাডাঙা স্কুল থেকে ফেরার পথে তিনি বই-খাতা একস্থানে রেখে বৃক্ষে আরোহণ করতেন। একদিন তেঁতুলগাছ থেকে পড়ে গিয়ে বিজয়ের ঠোঁট কেটে যায়। আজীবন ঐ কাটা দাগ নিয়ে 'ঠোঁটকাটা' বিজয় হিসেবেও পরিচিতি অর্জন করেন তিনি। 'ঠোঁটকাটা' অর্থে তাঁকে নির্দয় সত্যাশ্রয়ী তার্কিক বলা হয়েছে।

ষোল/সতের বছর বয়সে বিজয় হোগলাডাঙা স্কুল থেকে বাঁশগ্রাম এম ই স্কুলে ভর্তি হন। যে কোনো বিচারে তখন তাঁর বয়স একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল। তখনকার দিনে বয়স নিয়ে তেমন কোনো সমস্যা হত না। ডুমদির নিজ বাড়ি থেকেই বিজয় বাঁশগ্রামের এম ই স্কুলে যাতায়াত করতেন। মাঝে মাঝে বাঁশগ্রামের কোনো নিকটআত্মীয়ের বাড়িতে থেকে যেতেন।[৭] লেখাপড়ায় বিজয়ের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। বাঁশগ্রাম এম ই স্কুলে বিজয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। ঐ স্কুলের প্রধানশিক্ষক ছিলেন বাঁশগ্রামের কায়স্থ সম্প্রদায়ের ভুবনমোহন ঘোষ। ভুবনমোহন রবীন্দ্রসংগীতের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বিজয়ের সংগীতাভ্যাস ও অভিনয়দক্ষতা জেনে প্রধানশিক্ষক মশাই তাঁকে আন্তরিক সহযোগিতা ও উৎসাহ দিয়েছিলেন।

বাঁশগ্রাম এম ই স্কুলে অধ্যয়ন শেষে বিজয় সরকার নড়াইলের সিংগে-শোলপুর কে পি ইনস্টিটিউশনের ৭ম শ্রেণিতে ভর্তি হন। ইনস্টিটিউশনের প্রধানশিক্ষক ছিলেন মনোখালির বিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য। উপ-প্রধানশিক্ষক ছিলেন ফরিদপুর জেলার ভাঙা থানার অরুণেশ্বর রায় ও হেডপণ্ডিত ছিলেন কিরণচন্দ্র। অরুণবাবু যেমন রবীন্দ্রসাহিত্যানুরাগী ছিলেন, তেমনি ছিলেন নাট্যপ্রিয় লোক। তাই বিজয় সরকারের প্রতি তাঁর দুর্বলতা ছিল। প্রধানশিক্ষক বিজয় বাবু ও হেডপণ্ডিত কিরণচন্দ্র বিজয়কে বিশেষ স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন– তাঁর ভবিষ্যৎ নির্মাণে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। ঐ স্কুলে

---

৬. মহসিন হোসাইন, *ভাটিয়ালী গানের রাজা পাগল বিজয়* (যশোর : শ্রীমানিক বিশ্বাস, ১৯৮০), পৃষ্ঠা ১২

৭. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ১৪

অধ্যয়নকালে সুমেরুখোলার মথুরাবাবুর বাড়িতে বিজয় সরকার জায়গির থেকে পড়াশোনা করতেন। বিজয় সরকার স্কুলের নাট্যাভিনয় ও সংগীত পরিবেশনায় প্রধান ভূমিকা রাখতেন। বিজয় সরকার স্মৃতিচারণায় বলেছিলেন, শিক্ষক অরুণেশ্বর রায়ই তাঁকে সংগীতজগতে টেনে নেন। বিজয় শিক্ষকদের কথা অতি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতেন।[৮]

বিজয় সরকার বারবার তাঁর স্মৃতিচারণায় দাবি করেছেন, তিনি সিংগে-শোলপুর কে পি ইনস্টিটিউশনে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেছিলেন। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তিনি। অধ্যয়নই ছিল তখন তাঁর তপস্যা। কিন্তু বিধি বাম। বিজয়ের আর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়া হল না। টেস্ট পরীক্ষা দেওয়ার পরেই বিজয়ের পিতৃবিয়োগ ঘটে। মা-র মৃত্যু হয়েছিল আগেই। পারিবারিক আরো দুঃসংবাদ ছিল তাঁর। ইতোমধ্যে নবকৃষ্ণের কৃষিজমি হাটবাড়িয়ার জমিদারদের দ্বারা নিলামে নিঃশেষ হয়। বিজয়ের সহোদরেরা যার যার মতো সংসার পেতে জীবিকার জন্য কঠোর সংগ্রাম করছেন। তাই সর্বকনিষ্ঠ বিজয়কে আর দেখবার কেউ রইল না। নিজের জীবন ও জীবিকার জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এইভাবেই শেষ হয়ে গেল বিজয় সরকারের একাডেমিক পড়াশোনা।[৯]

কবিগান শিক্ষা

কবিয়াল বিজয় সরকারের কবিয়াল পেশায় আসতে তাঁকে কবিয়ালগুরুদের কাছে অবস্থান করতে হয়েছিল। তাঁকে দিতে হয়েছিল অবিরাম শ্রম ও সাধনা। তাই পেশাগত শিক্ষাই বিজয়ের প্রকৃত শিক্ষা বলে গণ্য করা যায়। বিজয় সরকার আর্থিক অনটনে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে অসমর্থ হলে তিনি উপার্জনের দিকে দৃষ্টি দেন। বিজয় পর পর দুটো গ্রামীণ লোয়ার প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। বিজয় সরকার গোপালপুর কাচারির নায়েব অথবা সহকারী নায়েব হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তখন বাংলা ১৩৩২ সন। বিজয় সরকার লোকমুখে শুনতে পেলেন, হোগলাডাঙায় কবিগান হবে। কবিগানের বিখ্যাত দুই কবিয়াল পাল্লা করবেন। একজন গোপালগঞ্জের বিখ্যাত কবিয়াল মনোহর সরকার ও অন্যজন খুলনার কবিয়াল রাজেন্দ্রনাথ সরকার। গোপালপুরের কাচারি-বাড়ি থেকে হোগলাডাঙার তেমন দূরত্ব নয়। এ ছাড়া হোগলাডাঙা বিজয় সরকারের নিজগ্রামেরও কাছে। অনেকদিন পর কবিগানের আসর হবে জেনে বিজয় মনের মধ্যে অসম্ভব ব্যাকুলতা অনুভব করলেন। কারণ স্কুলজীবনেই বিজয় বায়নায় ভাব গানের আসর করেছেন। আর সংগীতের ভাবরস মিশেছিল তাঁর দেহের অনু-পরমাণুতে। গানের দিন বিজয় সরকার গোপালপুর কাচারির কয়কজন সংগীতপ্রিয় লোকের সঙ্গে হোগলাডাঙায় মনোহর সরকার ও রাজেন সরকারের কবিগান শুনলেন। হাজার হাজার শ্রোতার মধ্যে বিজয় একজন উৎসাহী শ্রোতা। মনোহর সরকারের গানে বিজয় এমন অভিভূত হলেন যে, গভীর রাতে গান শেষ হলেও তিনি স্থানত্যাগ করেননি। সকালবেলায় যে বাড়িতে মনোহর সরকারের থাকাখাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল বিজয় সেই বাড়িতে উপস্থিত হন। আঙিনার মিষ্টি রোদ পোহাতে দেখলেন মনোহর সরকারকে। বিজয় অতি বিনীতভাবে প্রণাম করলেন মনোহর সরকারকে। ঋষিতুল্য লম্বা দাড়িওয়ালা চেহারার মনোহর সরকার বিজয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবা, কী চাই তোমার?' বিজয় ভক্তিগদগদ হয়ে চোখের জল ফেলে জানালেন, 'বাবা, আমি আপনার কাছ থেকে কবিগানের 'সরকারি' শিখতে চাই। আপনি আমাকে গ্রহণ করেন।' মনোহর সরকার বিজয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিলেন। পারিবারিক ও আবস্থিক খবরাখবর নিলেন। বিজয়কে জানতে মনোহর সরকার কিছু আর বাকি রাখলেন না। শেষে তিনি বিজয়ের কাছে একটি গান শুনতে চাইলেন। এরপর তরুণ বিজয় সরকার একতারা বাজিয়ে একটি গান গেয়ে শুনালেন। ঐ গানের প্রথম অংশ ছিল এমন:

"আমি গুরু বৈমুখ হইয়া রইলাম ভাই
এ মুখ কেউ দেখ না,

৮. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ১৫
৯. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ১৫

আমার এ মুখ দেখলে পরে
তার দুঃখ আর যাবে না ॥”

ভাবে তন্ময় হয়ে বৃদ্ধ কবিয়াল মনোহর সরকার চোখের জল ছেড়ে কাঁদতে লাগলেন। বিজয় সরকারের মধুকণ্ঠের গান বিশেষত গুরুপদের ঐ গানটি শুনে তিনি বিস্মিত হলেন। এছাড়া তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কবিয়াল রাজেন সরকারের কাছে বিজয়ের গানের প্রশংসা করলেন। ঐ দিনই সিদ্ধান্ত হল, বিজয় পরবর্তী বছর মনোহর সরকারের সঙ্গে কবিগান শিক্ষার্থে সার্বক্ষণিকভাবে থাকবেন।[১০]

১৩৩৩ সনে বিজয় সরকার কবিগান শিক্ষা লাভের জন্য তাঁর গুরু কবিয়াল মনোহর সরকারের বাড়ি গোপালগঞ্জ জেলার দুর্গাপুরে উপস্থিত হন। সে যুগে গুরু-কবিয়ালের কাছে শিষ্যের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল ঋষিদের আশ্রমে থেকে বিদ্যার্জনের মতোই। আশ্রম শিক্ষার সাথে ‘কবির লড়াই’ শিক্ষার তেমন কোনো পার্থক্য দেখা যেত না। কবিয়ালের বাড়িতেই শিষ্যের সার্বক্ষণিক থাকাখাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এমনকি গুরুর ঘর-গেরস্তালির সব কাজই শিষ্যকে করতে হত। সংসারের পানি তোলা, গরুরাখা, মাছশিকার, কেনাকাটা, গুরু ও গুরুমায়ের প্রত্যক্ষ সেবা ও পোশাক-আশাক পরিষ্কার করতে হত। শিষ্য বা শিক্ষার্থীকে ওইসব মেনে নিয়েই গুরু-কবিয়ালের কাছে কবিগান শিক্ষা করার প্রথা ছিল। তবে শিক্ষার্থীকে সবসময়ই ঘর-বাড়ির কাজ করতে হত না। কবিগানের সিজন শুরু হলেই শিক্ষার্থী গুরুর সাথে গ্রাম-গ্রামান্তরে কবিগানের আসরে আসরে থাকতেন– প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গ্রহণ করতেন পাঠ। কবিয়াল বিজয় সরকারকে সব প্রতিকূলতা জেনেই কবিয়াল মনোহর সরকারের দুর্গাপুরের বাড়িতে দুই বছরের জন্য থাকতে হয়েছিল। দুর্গাপুরেই বিজয় সরকারের সাথে ফরিদপুরের নিশিকান্ত সরকারের সম্পর্ক হয়। নিশিকান্তও ঐ সময়ে মনোহর সরকারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে দুর্গাপুরে কবিগান শিখতে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালের ‘বিজয়-নিশির কবির লড়াই’ এক উজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে আছে।

গুরুর সাংসারিক কাজকর্ম দেখে শিক্ষার্থী বিজয় সরকার গুরুর নিকট থেকে শাস্ত্রজ্ঞান, ব্যাকরণ, অলংকার প্রভৃতি আয়ত্ত করতেন। ধীরে ধীরে ত্রিপদী ও চৌপদী ছন্দের পাঁচালি মুখে মুখে বলার অভ্যাসও বিজয় নিজের আয়ত্তে আনেন। সকালবেলায় গুরুর নির্দেশে বিজয় ও নিশিকান্ত ফাঁকাস্থানে গিয়ে মনের সমস্ত মাধুর্য মিশিয়ে পাঁচালি ও টপ্পা বলার অভ্যাস করতেন। তাঁরা পক্ষ নিয়ে প্রতিপক্ষ সরকারের বিরুদ্ধে ‘চাপান’ গাওয়াতেন দোহারদের সাহায্যে। ঐ সময় কবিয়াল বিজয় সরকার মনোহর সরকারের রচিত বেশ কিছু আগমনী, সখি সংবাদ, কবি প্রভৃতি গান মুখস্থ রেখেছিলেন। আসরের প্রয়োজনে ঐ ধারার বেশে কয়েকটি গান তিনি রচনাও করেছিলেন। বিজয় সরকার মনোহর সরকারকে ‘রাঙাকর্তা’ সম্বোধন করতেন। সাধারণত ভক্তিপ্রবণ বিজয় তাঁর গুরুর নাম উচ্চারণ করতেন না। তাঁর কাছ থেকে দুই বছর কবিগান শিক্ষাগ্রহণ করেন। মনোহর সরকারের কাছ থেকে বিজয় যেমন আন্তরিকতা লাভ করেছিলেন, তেমনি তাঁর পারিবারিক সদস্যদের কাছ থেকে তিক্ত অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছিলেন।[১১]

দুর্গাপুরের শিক্ষাজীবন শেষ করে কবিয়াল বিজয় সরকার সুপণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ সরকারের কাছে আরো এক বছর কবিগান শিক্ষাগ্রহণ করেন। বিজয় সরকার রাজেন্দ্রনাথকে দাদা সম্বোধন করতেন। বিজয় সরকার রাজেন্দ্রনাথের সাথে তাঁর বাগেরহাট জেলার চুনখোলার বাড়িতে থেকে শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করেন। শিক্ষা সমাপ্ত হলে গুরুর অনুমতিক্রমে কবিয়াল বিজয় সরকার ১৩৩৬ সনে নিজেই কবির দল গঠন করেন।

---

১০. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ১৬
১১. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ১

সংসারজীবন

কবিয়াল বিজয় সরকার নিজস্ব কবিগানের দল গঠন করায় তাঁর দলের যেমন বায়না বৃদ্ধি পায় তেমনি সুরেলা কণ্ঠের গায়ক হিসেবে তাঁর পরিচিতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কবিগান গেয়ে তখন তাঁর দুপয়সা রোজগার শুরু হয়েছে। কিন্তু একটি মহল বিজয় সরকারের প্রচণ্ড বিরোধিতা করতে থাকেন। এই বিরুদ্ধবাদীদের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন কবিয়াল রাজেন্দ্রনাথ সরকার। রাজেন্দ্রনাথ সরকার বিজয় সরকারকে কোথাও কারো সাথে জোট বাঁধতে না দেওয়ায় বিজয়ের কবিদল অচল হয়ে পড়ে। এভাবে আর্থিক প্রতিকূলতার কারণে বিজয় ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সংসারজীবন সময়মতো শুরু করতে পারেননি। বিজয় কোনোভাবে পিছু হটবার মানুষ ছিলেন না। তিনি তাঁর প্রতিভাশক্তিকে আরো শাণিত করার প্রয়াস পান। কোনোভাবেই তিনি কবিগানকে ছাড়তে চাননি, পরাজয় মানতে চাননি। এবার তিনি ফরিদপুরের ঘোষালকান্দি গ্রামের সংগীতসমঝদার শ্যামলাল রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্যামলালও আন্তরিক চেষ্টার পরে বরিশালের বিখ্যাত কবিয়াল নকুল সরকারের সাথে বিজয় সরকারের কবিগানের জোট বেঁধে দেন। কারণ কবিগান একা কিংবা একক কোনোদলের গাইবার গান নয়। অবশ্যই দুইদলের মধ্যে 'কবির পাল্লা' বা কবিগান পরিবেশিত হয়। নকুল সরকারের সাথে বিজয় সরকার প্রায় আড়াই বছর জোটে কবিগান পরিবেশন করেছিলেন। এরপর কবিয়াল বিজয়ের আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে আসে।

১৩৪২ সনে বিজয় সরকার বরিশাল জেলার বড়োমগরা গ্রামের শশিভূষণ পাণ্ডের কন্যা বীণাপাণি পাণ্ডেকে বিয়ে করেন। বীণাপাণি সে যুগের শিক্ষিতা রমণীদের মধ্যে গণ্য হতেন। তিনি কোলকাতা 'বাণী ভবন' ব্রাহ্মসমাজ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। বিয়ের পরপরই বিজয় সরকার তাঁর পৈত্রিক ভিটায় ঘর তুলে সংসারযাত্রা শুরু করেন। মা-বাবার পরলোকগমনের পর বিজয় সরকার পৈত্রিক ভিটেমাটি ত্যাগ করে নানা স্থানে দিন কাটিয়েছেন। বিয়ের পরে দিশেহারা নাবিক যেন কূল খুঁজে পেলেন। ভাগ্যবতী বীণাপাণির গভীর আন্তরিকতায় কবিয়াল বিজয় সরকার একটি সুখের সংসার পেলেন। কবিয়াল বিজয়কে কবিগানের বায়নার তাগিদে সারা দক্ষিণ বঙ্গ ঘুরতে হয়। বীণাপাণি অবসর কাটানোর জন্য ডুমদি'র বাড়িতে শিশুদের একটি পাঠশালা চালাতে থাকেন। কবিগানের বায়নার ফাঁকে ফাঁকে বিজয় সংসারের টুকিটাকি কাজকর্ম দেখে আবার ফিরে যান কবিগানের আসরে। এভাবে চলতে চলতে বিজয়-বীণাপাণির একটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে। কন্যাসন্তানটির নাম রাখা হয় কাননবালা। বিজয় সরকার কাননকে আদর করে ডাকতেন 'বুলবুলি' নামে। কিছু দিন পরে তাঁদের আরেকটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে, তার নাম রাখা হয় মঞ্জু। ছোট্ট সুখের সংসারে বিজয়ের কোথাও অভাব কিংবা দারিদ্র্য নেই। পরিমিত ব্যয়ে তাঁরা সুখী ছিলেন। বিজয় সরকারের বায়নার কোনো ফাঁক থাকত না– তাই দ্রুততার সাথে সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসে তাঁর। কিন্তু এই সুখ তাঁদের বেশিদিন থাকেনি। অচিরে বিজয় ও বীণাপাণির মধ্যে বিচ্ছেদের বাঁশি বেজে ওঠে। বরিশাল সদর হতে চিঠি এল, বিজয়ের একমাত্র শ্যালক অক্ষয় কুমার পাণ্ডে টিবি-তে আক্রান্ত। সে কালে টিবি বা যক্ষ্মার ভালো চিকিৎসা ছিল না। তবু একমাত্র ভাইয়ের অসুস্থতায় স্বামীর অনুমতি নিয়ে বীণা বরিশালে যাত্রা করেন। ইতোমধ্যে তাঁর কনিষ্ঠ কন্যা মঞ্জু অধিকারী মৃত্যুবরণ করেছে। বীণাপাণি অধিকারী বরিশালে গিয়ে ভাইয়ের সেবায় নিজেকে সমর্পণ করেন। কিন্তু কালান্তক ব্যাধি যক্ষ্মায় অক্ষয় পাণ্ডে মারা যান।

বীণাপাণি অধিকারী ভাইয়ের শোকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন ছিলেন। তবু বীণাপাণি গেলেন ডুমদিতে প্রাণপ্রিয় কন্যা কাননবালা ও স্বামী বিজয় সরকারের আকর্ষণে। কিন্তু যে, কালব্যাধি যক্ষ্মা ততদিনে তাঁর দেহেও বাসা বেঁধেছে। সহোদর অক্ষয় পাণ্ডে'র মৃত্যুর কিছুকাল পরে বাণীপাণিও অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্ত্রীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বিজয় সরকারের চেষ্টার অন্ত ছিল না। কিন্তু বীণাপাণি অকালেই মারা যান। স্ত্রী-বিয়োগ বিজয় সরকারকে দারুণ মর্মাহত করে। বীণাপাণি ১৩৫২ সনের ২৪ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ডুমদিতেই দেহত্যাগ করেন। বিজয় সরকারের ভাষায় :

"তের শত বাহান্ন সাল ছাব্বিশে মাস বেদ
গুরুবারে শুরু হল বিজয় বীণার ভেদ ॥"

বীণাপাণির প্রতি অপরিমেয় নির্ভরতা ছিল বিজয়ের। প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যুতে বিজয় সরকার যেমন দিশেহারা হলেন, তেমনি মাতৃহারা কন্যা কাননবালাকে নিয়ে আরো চিন্তিত হলেন। বিজয়ের সংসার অচল হলে গেল। অন্য কোনো উপায় না দেখে বন্ধুবান্ধব শুভার্থীদের অনুরোধে বিজয় সরকার দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে রাজি হলেন। বিজয় সরকার দ্বিতীয় বিয়ে করলেন ১৩৫৩ সনে গোপালগঞ্জ জেলার সাতপাড় গ্রামের রমেশচন্দ্র বিশ্বাসের প্রথমা কন্যা প্রমদাসুন্দরীকে। প্রমদাসুন্দরী শিক্ষিতা, বিবেচনাসম্পন্ন মহিলা। তিনি ডুমদি'র স্বামীগৃহে গিয়ে সাথে সাথে সংসারের হাল ধরলেন। ধীরে ধীরে কবিয়াল বিজয় সরকার প্রথম স্ত্রী-বিয়োগ ভুলতে চেষ্টা করেন। কন্যা কাননবালাকে লেখাপড়া শেখাতে উৎসাহী হলেন তার নতুন মা প্রমদাসুন্দরী। হিসেবি ও পরিণামদর্শী রমণী প্রমদা বিজয়ের উপার্জনের অর্থে সংসারটাকে দ্রুত সুন্দর করে তুললেন। এই প্রমদার চেষ্টায় বিজয় সরকারের বাড়িতে একটি একতলা দালান নির্মিত হয়; কেনা হয় মাঠে বেশ কিছু চাষের জমি। ঐ জমির ফসলে শনৈঃ শনৈঃ বিজয়ের সংসারের উৎকর্ষ দেখা দেয়। প্রমদা'র উৎসাহে বিজয় গান রচনায় ও সংগীতচর্চায় অধিক সময় দিতে পারেন।

১৩৫৪ সনের ২০ কার্তিক বিজয়-প্রমদা'র প্রথম পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। বিজয়ের এই পুত্রের নাম কাজলকুমার অধিকারী। প্রথম পুত্রের জন্মের কয়েক বছর পরে তাঁদের আর এক পুত্রের জন্ম হয়, নাম বাদলকুমার অধিকারী। এইভাবে বিজয় সরকারের সংসারে এক কন্যা, দুই পুত্র, স্ত্রী ও ও নিজেকে নিয়ে পাঁচজন সদস্য দাঁড়ায়। কন্যা কাননবালাকে কিছুটা লেখাপড়া শিখিয়ে বিজয় সরকার বিয়ে দেন।

বিজয়ের দুই পুত্র কাজলকুমার অধিকারী ও বাদলকুমার অধিকারী উভয়ই গ্রামের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা শুরু করেন। এরপর তাঁরা নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজ ও বাগেরহাট পি সি কলেজ থেকে বিএসসি ও বিএ পাশ করেন। বেশ কিছুকাল হল তাঁরা ভারতে সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত আছেন। কবিয়াল বিজয় সরকার তাঁর বায়না রক্ষা ও অবিরাম সংগীত-চর্চার মধ্যে থেকেও পুত্রদের লেখাপড়ার প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। বিজয় মনে করতেন, একাডেমিক পড়াশোনার বিকল্প নেই। তিনি তাঁর পুত্রদের কোনোভাবেই তাঁর নিজ পেশায় টানতে চাননি। পুত্রদের যুগোপযোগী শিক্ষালাভের জন্য পিতা যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন। কাজল ও বাদলকে চারিত্রিক নীতিবোধ ও সততা শিক্ষা দিতে তিনি কখনো কখনো কঠোরতাও অবলম্বন করেছিলেন। বিজয় যা-ই করেছেন তাঁর পুত্রদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্যই করেছেন।

১৯৭১ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বিজয় সরকারের অবর্ণনীয় সাংসারিক ক্ষতি হয়েছিল। প্রমদাসুন্দরীর দীর্ঘ সাধনার আসবাবপত্র, বিজয়ের পুরস্কারপ্রাপ্ত সোনা-রুপার মেডেল, বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক দেওয়া সনদপত্র ও গানের খাতা লুণ্ঠিত হয়। লুণ্ঠিত হয় বিজয় সরকারের দালানবাড়ি। রাজাকার ও লুটেরাদের দ্বারা সংসারের সবকিছু হারিয়ে বিজয় সরকার, স্ত্রী প্রমাদসুন্দরী, পুত্র কাজল ও বাদলের হাত ধরে হাজার হাজার শরণার্থীর সাথে ভারতের মাটিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিজয় সরকার পরিবার-পরিজন নিয়ে পশ্চিমবাংলায় ২৪ পরগনা জেলার শক্তিগড় স্কুলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।[১২] স্বাধীনতা লাভের পর বিজয় সরকার নড়াইলের ডুমদি গ্রামে ফিরে এলেন।

কর্ম ও সংগীতজীবন

বিজয় সরকার আনন্দ ও বিনোদনের পথ ধরে তাঁর অজান্তেই কর্মময় জীবনে প্রবেশ করেন। বাল্যকালে তিনি যখন ডুমদি মধ্যপাড়া লোয়ার প্রাইমারি স্কুলে পড়াশোনা করেন তখন নেপাল

১২. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ২০

পণ্ডিতের অধীনে যাত্রাপালায় কাজ করেও দু'পয়সা উপার্জনের সুযোগ পেয়েছিলেন। সেই সামান্য পয়সায় বিজয়ের লেখাপড়ার খরচাদি চলে যেত।

এরপর হোগলাডাঙা আপার প্রাইমারিতে অধ্যয়নকালে বিজয় জমিদার মনিন্দ্রনাথ রায়ের যাত্রাদলে খ্যাতিমান তরুণ শিল্পী হিসেবে পারিশ্রমিক পেতেন। এই ধারা অব্যাহত থাকে বাঁশগ্রাম এম ই স্কুলে অধ্যয়নকাল পর্যন্ত। বিজয় সরকার যখন সিংগে-শোলপুর কে পি ইনস্টিটিউটে অধ্যয়নরত তখন তিনি পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে ভাবগান বা বিচার গানের সরকার বা বয়াতি হিসেবে বায়না রক্ষা করে যে-অর্থ পেতেন তার কিছু কিছু যৌথ সংসারে পাঠিয়ে দিতেন। সিংগে-শোলপুর স্কুলেও সুমেরুখোলার মথুরা বাবুর আশ্রয় ত্যাগ করে বিজয় চলে গেলেন নিজ গ্রাম ডুমদিতে। তখন তাঁর পারিবারিক অবস্থা হতশ্রী। পিতৃমাতৃহীন বিজয় হৃদয়ে হাহাকার অনুভব করতে থাকেন। এমন সময় গ্রামবাসীরা ঠিক করলেন, ডুমদি মধ্যপাড়ার এল পি স্কুলের পণ্ডিত হিসেবে বিজয়কে নিয়োগ দিতে হবে। বিজয় সরকার এই স্কুলের নেপালপণ্ডিত ও রাজেন্দ্রপণ্ডিতের কাছে লেখাপড়া করেছিলেন। রাজেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের অপসারণের পরে বিজয় সরকার ডুমদি মধ্যপাড়া এল পি স্কুলের পণ্ডিত-মাস্টার নিযুক্ত হলেন। এল পি স্কুলের শিক্ষকতার পেশায় বিজয় সরকার তিন বছর অতিবাহিত করেন। তবে অল্পদিনের মধ্যে তাঁর আরেকটি শিক্ষকতার চাকরি জুটে যায়। জীবন ও জীবিকার তাগিদে বিজয় সরকার বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু কোনো ভাবেই তিনি কাজে মনস্থির করতে পারেননি। এরপর বিজয় সরকার হোগলাডাঙ্গার কবিগানের আসরে মনোহর সরকারের কবিগান শুনে কবিগান শিখতে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিন বছর কবিগান শিক্ষা করে নিজেই গুরুর অনুমতি নিয়ে পেশাদার কবির দল গঠন করেন।

কবিয়াল বিজয় সরকার কবিগানের দল গঠন করায় সে যুগের বড় বড় গায়ক অন্যান্য দল ত্যাগ করে বিজয়ের দলে যোগদান করেন। যোগদান-করা শিল্পীরা ছিলেন : (১) বড় গাইয়ে নগেন মাস্টার (৩) গাইয়ে সদানন্দ মল্লিক (৩) রসিক সানদার (৪) ম্যানেজার মতি বাবু (৫) হারমোনিয়াম বাদক ধীরেন্দ্রনাথ রায় ও (৬) দুইজন ধরতা গায়ক। উল্লিখিত শিল্পীরা ছিলেন কবিয়াল রাজেন সরকারের কবিদলের লোক। বিজয় সরকারের দলের বায়না বেশি হওয়ার সম্ভাবনা ও অন্যান্য সুবিধা লক্ষ করেই ঐ গায়কেরা বিজয়ের দলে যোগদান করেন।[১৩]

বিজয় সরকার কবিগানের দল গঠন করে প্রথম গান করেন ১৩৩৬ সনের ১২ অগ্রহায়ণ গোপালগঞ্জের ভেন্নাবাড়ি গ্রামের কবিগানের আসরে। তাঁর প্রতিপক্ষ কবিয়াল ছিলেন মহিম সরকার। প্রথমদিনের প্রথম আসরেই কবিয়াল বিজয় শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। হাজার হাজার শ্রোতা-দর্শক তাঁকে প্রাণ থেকে আশীর্বাদ করেন। এইভাবে সারা ফরিদপুর, খুলনা ও যশোর এলাকার কবিগানের শ্রোতাদের মধ্যে কবিয়াল বিজয় সরকারের নাম-পরিচয় মুখে মুখে ছড়িয়ে যায়। নতুন কবিয়াল বিজয়ের গান শোনার জন্য একের পর এক বায়না আসতে থাকে। বিজয়ের মোহনীয় কণ্ঠের জন্য তাঁর গান বেশি আকর্ষণীয় হয়। কিন্তু কবির দল গঠন করার শুরু থেকেই তিনি শত্রুতার সম্মুখীন হন। কবিয়াল রাজেন্দ্রনাথ সরকার বিজয় সরকারকে কবিগানের অঙ্গন থেকে বয়কট করেন। রাজেন সরকারের দলের গায়কেরা বিজয়ের দলে যোগদান করায় তিনি উত্তেজিত হয়েছিলেন। এছাড়া বিজয় সরকারের দলের বায়না হচ্ছিল বেশি। রাজেন সরকার সুপণ্ডিত কবিয়াল ছিলেন। তিনি ছিলেন নরসিংদীর হরিচরণ আচার্যের শিষ্য। রাজেন সরকারের গায়কি ও ব্যক্তিত্ব ছিল বিশাল। সেইসাথে সারা কবিয়াল সমাজের মধ্যে ছিল বিপুল প্রভাব। তাই রাজেন সরকারের ঘোষিত বয়কট সারা দেশের কবিয়ালেরা গ্রহণ করেন। মাঝখানে বিজয় সরকার কবির দল গঠন করার কিছুদিন পরই বায়না থেকে বঞ্চিত হলেন। বিজয় সরকার চারদিকে নিরাশার অন্ধকার দেখতে পেলেন। বিজয় সরকারের কবিয়াল পেশা যেমন শুরুতেই বাধাগ্রস্ত হল, তেমনি তাঁর মান-সম্মানেরও প্রশ্ন দেখা দেয়। ফরিদপুর, বর্তমান

১৩. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ২২

গোপালগঞ্জ জেলার ঘোষালকান্দি গ্রামের শ্যামলাল রায় বিজয় সরকারের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন।

শ্যামলাল তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের বইপত্র বিজয় সরকারকে ব্যবহার করার জন্য দিয়ে দিলেন। বিজয়কে তিনি উৎসাহী করতে লাগলেন 'কবির দল' চালু রাখার জন্য। এছাড়া তিনি ঝালকাঠির বিখ্যাত কবিয়াল নকুল সরকারের সাথে যোগাযোগ করে বিজয় সরকারের সাথে নকুল সরকারের কবিগানের 'জোট' বেঁধে দেন। বিজয় সরকার ও নকুল সরকার জোট বেঁধে কবিগান করেছিলেন প্রায় আড়াই বছর। নকুল সরকারের সাথে বিজয় সরকারের কবিগানের 'জোট' বাঁধায় রাজেন সরকার আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।

শ্যামলাল রায়ের বাড়িতে বিজয় সরকার প্রায় তিন বছর অবস্থান করেছিলেন। এ বাড়িতে অর্থাৎ গোপালগঞ্জের ঘোষালকান্দিতে অবস্থানকালেই তিনি বিয়ে করে সংসারী হয়েছিলেন। ধীরে ধীরে শ্যামলালের পরামর্শেই বিজয় সরকার তাঁর গ্রামের বাড়িতে স্ত্রীকে নিয়ে সংসারযাত্রা শুরু করেছিলেন। এরপর কবিয়াল সমাজের কোনো অবরোধ রইল না বিজয়ের ওপর। নিশ্চিন্তে বিজয় সরকার রাজেন সরকারের সাথেও বায়নার গান করতে থাকেন।

রাজেন্দ্রনাথ সরকারের কাছে প্রায় এক বছর কবির লড়াই-এ প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন কবিয়াল বিজয় সরকার। নকুল সরকারের সাথেও তিনি দীর্ঘদিন কবিগানের পাল্লা করেছিলেন। এরপর কবিয়াল বিজয় সরকার তাঁর নিজস্ব রুচি মেধা ও আধুনিক মননশীলতা দিয়ে কবিগানকে নতুনভাবে শ্রোতাদের কাছে উপস্থিত করতে প্রয়াসী হন। জীবনের প্রথমদিকেই তিনি শুদ্ধ কবিগান রচনায় নিজেকে নিয়োগ করেন। বিজয় সরকার সার্থক ও সুবিন্যস্ত কবিগান রচনায় জীবনের প্রথমেই মনোসংযোগ করেন। বিজয় সরকার পুরনো দিনের বহুল প্রচলিত কবিগানের বাণীবিন্যাস ও অতি জটিল শব্দ ব্যবহার বর্জন করেন। তিনি তাঁর রচনা হতে সব রকমের দুর্বলতা ঝেড়ে মুছে নতুন সংগীতসম্ভার নিয়ে শ্রোতাদের সামনে হাজির হন। এ ভাবে তাঁর সরল অথচ স্বরবৃত্ত ছন্দের পয়ার, ত্রিপদীও চৌপদীর ছড়া শ্রোতাদের আন্দোলিত করে।

বাংলা সাহিত্যে ত্রিশোত্তর যুগের প্রতিষ্ঠিত কোনো কোনো আধুনিক কবির মতোই বিজয় সরকার তাঁর বন্দনা রচনা করেছেন। ছন্দ, শব্দ প্রয়োগ সবই আধুনিক। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে বিজয় বলেছিলেন,

> 'কবিগানে কবিয়ালদের গতানুগতিক রচনার অসারতা, শব্দের বাগাড়ম্বরতা শিক্ষিত দর্শক ও শ্রোতাদের মনোযোগী ছিল না। তাই কবিগান এবং নিজের পেশার উন্নয়নের জন্য আমি আধুনিক কবি-সাহিত্যিকদের রচনাবলী পাঠ করে নতুন ধারায় গান রচনা করেছি। বিশেষত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, অতুলপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত, কবি জসীমউদ্‌দীন প্রমুখকে সামনে রেখে চিরন্তন বিরহের গান রচনা করি।'[১৪]

সত্যি সত্যি বাংলার মানুষের কাছে বিজয় সরকারের যদি সামান্য পরিচিতি থাকে তা তাঁর বিচ্ছেদী গানের জন্য। তাঁর চেয়ে অনেক শক্তিশালী কবির সরকার সে যুগেই ছিলেন কিন্তু কাল তাঁদের ধরে রাখেনি। বিজয় সরকারের রচিত বিচ্ছেদী ধুয়া গানের জন্য প্রচুর বায়না হয়েছে। দুই বাংলায়ই কবিগান নিরপেক্ষ গানের জন্য পরিচিত। বিজয় সরকার একজন কবির সরকার হয়েও আধুনিক কবিমনস্ক গান তৈরি করেছেন।

প্রাচীনকালে কবিগানের ধুয়া দেওয়ার প্রচলন ছিল না। পরবর্তীকালে 'গৌরচন্দ্রিকা' কিংবা 'গড়ে কীর্তনাঙ্গের' গান দিয়ে ধুয়া দেওয়ার প্রচলন ছিল। তাতেই শ্রোতারা সন্তুষ্ট ছিলেন। আমরা বিজয় সরকারের নিজের কথায় জানতে পেরেছি, পেশাগত উৎকর্ষের জন্য তিনি বিচ্ছেদী–ধুয়া গানের প্রচলন করেন। বিজয় সরকার এই বিচ্ছেদী গান রচনার আগে তিনি রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও জসীমউদ্‌দীনের সে-সময়কার গ্রামোফোন কোম্পানির রেকর্ডকৃত ও প্রচারিত অতি জনপ্রিয় গানগুলো ধুয়া হিসেবে

---

১৪. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ২৭

ব্যবহার করতেন। বিজয় সরকার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে', 'বিশ্ব যখন নিদ্রা মগন গগন অন্ধকার', 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলির পরে', কাজী নজরুল ইসলামের 'গহীন জলের নদী', 'কে উদাসী বনবাসী বাজাও বাঁশী বাঁশের বনে', 'আজি এ শ্রাবণরাতি কাটে কেমনে', 'বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিসনে আজি দোল' প্রভৃতি গান কবিগানের আসরে পরিবেশন করতেন। বিজয় সরকারের এই নতুন উদ্যোগ খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল। তখনকার দিনে বাংলার ঘরে ঘরে গ্রামোফোন রেকর্ডে ঐসব গান বাজত। পরিচিত ও প্রিয় গানগুলো শ্রোতারা বিজয়ের কবিগানের আসরে নতুনভাবে শুনতে পেয়ে সবাই অবাক হয়ে গেলেন। এরপর দেখা গেল, কবিয়াল বিজয় সরকারের গুরুজনস্থানীয় কবিয়ালেরা তাঁর মতো অবিসংবাদী জনপ্রিয়তা পেতে ব্যর্থ হচ্ছেন। অবশ্য বিজয়ের সমসাময়িক কবিয়ালেরা ও তাঁদের মতো করে আধুনিক গান তথা রবীন্দ্র-নজরুল-অতুলের লোকপ্রিয় সংগীতগুলো পরিবেশন করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বিজয় সরকারের ধারালো ও মিষ্ট কণ্ঠের কাছে তাঁরা মুখ থুবড়ে থাকেন। এইভাবে কবিয়াল বিজয় সরকার বৃহত্তর যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া, বরিশাল, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ঢাকা, পাবনা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি এলাকার অগণিত আসরে কবিগান গেয়ে অল্পদিনের মধ্যে জনপ্রিয়তার শীর্ষদেশে আরোহণ করেন। বিজয় সরকারের জোটের কবিয়াল ছিলেন বিখ্যাত নিশিকান্ত সরকার। নিশিকান্ত সরকার গোপালগঞ্জের অধিবাসী ছিলেন। ত্রিশ দশক থেকে পঞ্চাশ দশক পর্যন্ত বাংলাদেশের বিরাট অংশ ও সারা পশ্চিম বাংলা বিজয় সরকার ও নিশির গান শোনার জন্য উন্মুখ ছিল। সম্ভবত ঐ সময়ই এই প্রবচনের জন্ম হয়, 'যদি শোনো কবিগান ছেড়া কাঁথা মাথায় বান'। কথাটি গ্রামবাংলায় আজো প্রচলিত আছে। অল্পদিনের মধ্যে কবিগান গেয়ে বিজয় সরকার প্রচুর আর্থিক সাফল্য লাভ করেন। দেখতে দেখতে তাঁর পৈত্রিক ভিটেয় নির্মিত হল একটি দালান। তিনি টাবরা, আগ্রাহাটি, ডুমদি ও নন্দকোলের মাঠে বেশ কিছু জমি ক্রয় করতে সমর্থ হন। তবে বৈষয়িক সাফল্যের জন্য বিজয় সরকারের দ্বিতীয় পত্নী প্রমদাসুন্দরীর শ্রম ও মেধা অধিক ক্রিয়াশীল ছিল।[১৫] এরপর বিজয় সরকারের সংসার ও পারিপার্শ্বিকতায় উন্নতি দেখা দেয় প্রায় রাতারাতি। বিজয়ের মেধা, প্রতিভা, সৃজনশীলতা সব মিলিয়ে তিনি দুই বাংলার কবিয়ালদের জগতে অনন্য হয়ে ওঠেন। তিনি রবীন্দ্র-নজরুল সংগীত কবির আসরে পরিবেশন করে একটি নিজস্ব ভাবধারায় গান রচনা করতে শুরু করলেন।তিনি পূর্বসূরিদের ভাব ভাষা, সুর ও মর্মবাণী মনে রেখে নিজেই নির্ভেজাল ভাটিয়ালি-বিচ্ছেদী-ধুয়া গান রচনা শুরু করেন। এই পর্যায়ের কয়েকটি গান,

'ভাদরের নদী জানো নি তার কথা',
'আমার জীবন নদীর নাইয়ারে'
'আমার গোপন প্রাণের ব্যথারে',
'অনেক দিনের এক বিরহের'
'অনেক পুরানো এক ব্যথারে',
'ও নিঠুর, শ্রাবণ রে তুই আবার কেন এলি রে এই দেশে',
'ও পরান প্রিয়ারে তুমি আমার খবর নিয়ো রে',
'ও মন বাউল রে তোর পথে চলার গান',
'ওরে অবুঝ বুঝলি না রে দিনের দিনে',
'কি ভাবলাম আর কি হল সব ভোলা রে',

'আমার দরদিয়া রে আমি কোন দেশে যাব তোর লাগিয়া রে' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কবিয়াল বিজয় সরকারের এইসব সহজ-সরল ভাষার গানের গভীর দার্শনিকতা ও জীবনবোধ মননশীল কবিদের রচনার সাথে তুল্যমূল্য। রচিত গানগুলো বিজয়কে যুগোত্তীর্ণ গীতিকারের মর্যাদা দিয়েছে।

---

১৫. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ২৮

দেশবিভাগের পূর্বেই কবিয়াল বিজয় সরকার বাংলাদেশে ও পশ্চিম বাংলায় বিপুল পরিচিতি লাভ করেন। এই পরিচিতি যেমন লৌকিকধারায় শুরু হয়েছিল তেমনি তা মননশীল লোকদের কাছেও পৌঁছে গিয়েছিল। পূর্ব বাংলার কয়েকজন কবিয়াল সেই ত্রিশ দশকে কোলকাতার বিদগ্ধজনকে কবিগান শোনানোর অভিপ্রায় নিয়ে কোলকাতায় কবিগান প্রচারের জন্য গিয়েছিলেন। এঁদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কবিয়াল রাজেন সরকার। অন্যান্য কবিয়ালদের মধ্যে ছিলেন মনোহর সরকার, বিজয় সরকার, নিশিকান্ত সরকার প্রমুখ। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিজয় সরকারকে দেয়া সার্টিফিকেট ও জসীমউদ্‌দীনের রচনা থেকে অনুমান করা যায়, বিজয় সরকার ১৯৩২ সন থেকে অন্তত ১৯৩৭ সন পর্যন্ত বর্ষাকালে কোলকাতায় কবিগান গাইতে গিয়েছিলেন। পল্লিকবি জসীমউদদীন লিখেছেন,

> ১৯৩২ সনে ওড়াকান্দির রাজেন সরকার তাঁর দুই শিষ্য বিজয় আর নিশিকান্তকে লইয়া আমার কলিকাতার মেসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া জানিলাম তাঁহারা সদলবলে আসিয়াছেন কলিকাতায় কবিগান প্রচারের জন্য। দলের অন্যান্য গায়কেরা নৌকায় অবস্থান করিতেছে। কলিকাতার এলবার্ট হল ভাড়া লইয়া নির্দিষ্ট তিন দিন তাঁহাদের কবিগানের ব্যবস্থা করিলাম। টিকেটের মূল্য তিন টাকা, এক টাকা আর চার আনা। তারপর আমার মেসে সারাদিন চলিল তাঁহাদের গানের মহড়া। যে সব ধুয়ার সুর চটকদার এবং বিলম্বিত লয়ে করুণ সুর, সে গুলিকে দিয়া নতুন করিয়া পালাটি রচনা করিয়া দিলাম। কলিকাতার কাগজগুলিতে কবিগানের উপর নানা খবর ও প্রবন্ধ ছাপাইবার ব্যবস্থা করিলাম।
>
> নির্দিষ্ট দিনে এলবার্ট হলে কবিগান হইল। তেমন আশানুরূপ জনসমাগণ হইল না। পূর্ব ভট্টাচার্য নামে এক ব্যক্তি 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' এক বিবৃতি দিলেন। তার বক্তব্য ছিল, 'কবিগানকে এই দলের লোকেরা আধুনিকরূপ দিয়া ইহার রসাত্মক দিকটিকে ক্ষুণ্ন করিয়াছেন। সখিসংবাদ, ভোরগান প্রভৃতি যাহা কবিগানের অলংকার স্বরূপ ছিল তাহা বর্জন করিয়া ইহারা কবিগানের আসল রূপটি নষ্ট করিয়াছেন।' ইত্যকার সমালোচনার পরদিন আর কবিগানে তেমন লোকসমাগম হইল না। রাজেন সরকার আশাভঙ্গ হইয়া পাগলের মত হইয়া পড়িলেন। সঙ্গী সাথীদিগকে দেশে পাঠাইতে রাজেন সরকারকে তার বহুকালের সঙ্গী নৌকাখানিকে বিক্রয় করিয়া দিতে হইল। কত আশা লইয়াই না তিনি কলিকাতা আসিয়াছিলেন। কবিগান উপলক্ষে বিজয় আর নিশিকান্তের সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হইয়া উঠে। আমার ঘরে বহুবার তাহাদের সঙ্গে কবিগানের পাল্লা দিয়াছি। একবার কলিকাতা বেতারে রাজেন সরকারের সঙ্গেও পাল্লা দিয়াছিলাম। আমাদের পাল্টার বিষয়বস্তু ছিল হুঁকো আর কলকে।"[১৬]

আকাশবাণী কোলকাতায় যে কবিগানের পাল্লা হয়েছিল ঐ পাল্লায় কবি জসীমউদ্‌দীন ও বিজয় সরকার যৌথভাবে হুঁকোর পক্ষ নিয়ে কবিগান করেছিলেন। কবি জসীমউদ্‌দীনের রচনা পাঠ করলে মনে হয়, রাজেন সরকার, বিজয় সরকার প্রমুখ ১৯৩২ সনে কোলকাতায় কবিগান প্রচারে ব্যর্থ হয়ে গ্রামে ফিরে এসেছিলেন। ১৯৩৭ সনের ১ অক্টোবর কোলকাতার এলবার্ট হলের এক রাতের কবিগানের পাল্লা শুনে পণ্ডিত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন প্রমুখ সুধী বিজয় সরকারকে হাতে লেখা প্রশংসাপত্র দান করছেন। ১৯৩৬/৩৭ সনে কোলকাতা বিধান স্ট্রীটের রামকৃষ্ণ বাগচী লেনের এক ভাড়াটে বাড়ির দ্বিতল কক্ষে একদিন কবিয়াল বিজয়ের সঙ্গে কবি জসীমউদ্‌দীন, কবি গোলাম মোস্তফা, সুরশিল্পী আব্বাসউদ্দীন প্রমুখের সাক্ষাৎ হয়। কবিয়াল বিজয় সরকার সেই দিন এই বিচ্ছেদী গানটি গেয়েছিলেন : 'সজনী ছুঁসনে আমারে, গৌররূপে নয়ন দিয়ে আমার জাত গিয়েছে, আমাকে স্পর্শ করিসনে যার কুলমানের ডর আছে।' নাগরিক জীবনের সঙ্গে পরিচিত সুধী ব্যক্তিবর্গ কবিয়াল বিজয়ের মুখে অনুপম ছন্দ ও সুরের ঐ গানটি শুনে সে দিন বিস্ময় প্রকাশ করেন।[১৭]

বিজয় সরকার কোলকাতা ও কোলকাতার আশেপাশে কবিগানের অনেক বায়না রক্ষা করেছিলেন। কাশিমবাজার মহারাজার পুত্র শ্রীশচন্দ্রনন্দী তাঁর নিজ বাড়িতে কবিগানের আয়োজন করেছিলেন। ওখানে কবিগান গেয়ে বিজয় সরকার যেমন প্রশংসাপত্র পেয়েছিলেন তেমনি পুরস্কৃত হয়েছিলেন। কোলকাতায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তিনি দুই বার দেখা করতে গিয়েছিলেন। প্রথমবার

---

১৬. জসীম উদ্‌দীন, *জীবনকথা* (ঢাকা : পলাশ প্রকাশনী, ১৯৬৪)

১৭. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮) পৃষ্ঠা ৩০

ব্যর্থ হলেও বিজয় সরকার খুলনার বিখ্যাত সাংবাদিক ডিএন সেন, অ্যাডভোকেট যোগেশ্বর মণ্ডলসহ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কিছু সময়ের জন্য তাঁদের সাথে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। বিজয় সরকার ঐ সময় চারণকবি মুকুন্দ দাস ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাথেও দেখা করেছিলেন। জাতীয় কবির কোলকাতার বাসায় দুইবার নিমন্ত্রিত হয়েও গিয়েছিলেন তিনি। এ-প্রসঙ্গে গবেষক জনাব মহসিন হোসাইন নিম্নোক্ত বর্ণনা দিয়েছেন :

> "ভাটিয়ালী ও বাউল সংগীতের অন্তরধর্ম' লইয়া পাগল বিজয় বৈচিত্র্যভরা রাগিণী সংযোগে একটি নিজস্ব ঘরানার প্রতিষ্ঠা করেন। আধুনিককালের কবিগানের মধ্যে প্রাচীন রীতির সাশ্রয় থাকিলেও পাগল বিজয়ের কবিগান অনন্য। সেই নিরিখে হৃদয়ধর্মে একেবারে নতুন। আধুনিক কাব্যে যে emotional delight বা রমণীয়তা থাকা একান্ত আবশ্যক, পাগল বিজয়ের গীতিকবিতায় তাহা আসিয়া সহজে ধরা দিয়াছে। সমালোচকদের মতে : 'কবিগান সাহিত্য, সংগীত ও ধর্মীয় চেতনার ত্রিবেণী সংগম।' সম্ভবত স্বরচিত সংগীত পরিবেশনের সাফল্য কিংবা অসাফল্যের ওপর চারণকবিদের ভাগ্য নির্ধারিত হইয়া থাকে। বিশেষত কবিকে সত্য ও সৌন্দর্যে আস্থাবান এবং mystical passion-এর অনুবর্তী হইতে হইবে। পাগল বিজয়ের রচিত সাংগীতিক ধারা বিশ্লেষণ করিলে তাহাকে একজন সৌন্দর্যপূজারি নৈষ্ঠিক সার্থক মরমী-কবিগীতিকার বলা যায়। পাগল বিজয় রচিত বিচ্ছেদী গান বা বিরহগীতি 'saddest thought' অনুপম কবিকল্পনা sweetest songs-এ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। নিম্নে কবিয়ালের হৃদয় আবেগের objectification গীতাংশ উদ্ধৃত করিলাম :
>
> 'আমার মনে বনে ঘরের কোনে জ্বলে এক আগুন
> কালবৈশাখীর ঝরাপাতায় কাঁদিছে ফাগুন,
> সই রে মলয় পবন জ্বালায় দ্বিগুণ– কালা বিরহি রে ॥'
>
> কবিয়াল বিজয় সরকারের সংগীতপ্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে ১৯৪৭ সনের দেশবিভাগের পূর্বে ২৪ পরগনার 'আর্যধর্ম প্রচারণী সংঘ' পাগল বিজয়কে 'কবিসুধাকর' উপাধিতে ভূষিত করে। দেশবিভাগের পরে বিজয় সরকার সংগীতচর্চা অব্যাহত রাখেন। এক সময় কবিগান ছিল অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত লোকের প্রাণের সম্পদ। তবে বিজয় সরকারের প্রচেষ্টায় সমাজের উচ্চবিত্ত শিক্ষিত লোকের কাছে কবিগান বিশেষত তাঁর বিচ্ছেদীগান জনপ্রিয়তা পায়। জনপ্রিয়তার বিজয় সরকারের নাম সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। একবার আমন্ত্রিত হয়ে তিনি তাঁর কবিগানের দল নিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা শহরে কবিগান পরিবেশন করতে আসেন। বিজয় সরকারের কবিগান হয়েছিল বাংলা ১৩৬৫ সনে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে ঢাকার জগন্নাথ হলে। সম্ভবত এ বছরই তিনি বাংলা একাডেমির লোকসংগীত সম্মেলনে তাঁর দল নিয়ে কবিগান করেন। ঐ সময় আবার দেখা হয়েছিল পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীনের সাথে। ঢাকায় কবিগান পরিবেশন করে বিজয় সরকার ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, দার্শনিক জি সি দেব, পণ্ডিত আবদুল হাই প্রমুখ মনীষীর প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। পণ্ডিত আবদুল হাই কবিয়াল বিজয় সরকারকে একটি পাইলট কলম উপহার দিয়েছিলেন। কলমটির গায়ে লেখা ছিল, 'ভাটিয়ালী সুরের রাজার করকমলে ভক্তি অর্ঘ্য– আ. হাই।"[১৮]

বাংলা একাডেমীর এ-সংগীত সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন এলাকার লোকসংগীত শিল্পীরা তাদের সংগীত পরিবেশন করেছিলেন। ঐ সম্মেলনের উদ্যোগীরা বিজয় সরকারকে একটি প্রশংসাপত্রও দান করেছিলেন।

বিজয় সরকারের ছিল সুদীর্ঘ কর্মজীবন। তিনি প্রায় অর্ধ শতাব্দীই সাংগীতিক জীবন কাটিয়েছিন। বিজয় সরকার কবিগান ছাড়া ফাঁকে ফাঁকে রামায়ণ গানও পরিবেশন করতেন। রামায়ণ গেয়ে তিনি নিজে কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন না। তাঁর দলের লোকেরা অর্থাৎ সহগায়ক ও বাদকেরাই রামায়ণ গেয়ে পরিশ্রমিক নিতেন। কবিয়াল বিজয় সরকার সারাবছর কয়েক শত আসরে কবিগানও 'রামায়ণ পালা' পরিবেশন করতেন। সারাজীবনে তিনি কয়েক হাজার আসরে কবিগান গেয়েছেন। এভাবে তাঁর কর্মজীবন ও সাংগীতিক জীবন আবর্তিত হয়েছে। বিজয় সরকারের জীবনে বড় কয়েকটি সংগীতানুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হল।

বর্তমান খুলনা মহানগরীর টুথপাড়া, পাবলা কবির বটতলা, ধর্মসভা রোডের কালীবাড়ি ও তৎকালীন 'পাকিস্তান কাউন্সিল'-এ প্রায় প্রতি বছরই বিজয় সরকারের কবিগান হত। প্রথমদিকে নিশিকান্ত

---

১৮. মহসিন হোসাইন, *কবিয়াল বিজয় সরকারের জীবন ও সঙ্গীত* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪), পৃষ্ঠা ২৬৮

সরকার তাঁর জোটের গায়ক ছিলেন। পরবর্তীকালে ফরিদপুর বর্তমান গোপালগঞ্জের কবিয়াল ছোট রাজেন সরকার, কালীপদ সরকার, বিনয় সরকার, বরিশালের স্বরূপ সরকার, নড়াইলের রসময় সরকার প্রমুখ বিজয় জোটের গায়ক হিসেবে গান করেছেন।

১৯৬৮/৬৯ সনে 'খুলনা পাকিস্তান কাউন্সিল' একটি সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। খুলনার দুই প্রখ্যাত সাহিত্যিক এ এফ এম আবদুল জলীল ও ডা. আবুল কাসেম সম্মেলনের মুখ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এ সম্মেলনের প্রথম দিন ছিল সাহিত্যসভা। দ্বিতীয় দিনে ছিল কবিগানের আয়োজন। প্রথমদিনের সম্মেলনের প্রধান অতিথি হিসেবে ঢাকা থেকে গিয়েছিলেন পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীন। সম্মেলনের আগের দিন জসীমউদ্‌দীন খুলনায় পৌঁছে অনুষ্ঠানের ছাপাকৃত অনুষ্ঠানসূচি দেখলেন। তিনি যখন জানলেন, অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে থাকছে বিজয় সরকারের কবিগান, তখন অনেক দিনের পুরনো বন্ধুর প্রতি কবি জসীমউদ্‌দীনের আবেগ উথলে পড়ে। বিজয় সরকার খুলনার দৌলতপুরের নিকট পাবলা গ্রামের সাহাবাড়িতে সে দিন সন্ধ্যায় রামায়ণ গান পরিবেশন করবেন। পরের দিন পাবলায় কবি বটতলায় কবিগান গাইবেন। এবং তৃতীয় দিনে খুলনায় পাকিস্তান কাউন্সিল আয়োজিত আসরে কবিগান করবেন।

স্বাধীনতা লাভের পরে ১৯৭৫ সনে 'খুলনা বাংলাদেশ পরিষদ' আয়োজিত সাহিত্য সম্মেলনে পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীন সম্মেলনের প্রধান অতিথি হয়ে গিয়েছিলেন। পল্লিকবিকে ঐ সময় খুলনা স্টেডিয়ামের হলে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। বিজয় সরকার তখন মহসিন হোসাইনকে সঙ্গে নিয়ে এ এফ এম আবদুল জলীলের বাসায় যান। পল্লীমঙ্গল গার্লস হাইস্কুলে তাঁর সংবর্ধনায় অংশ নেন। ডা. আবুল কাসেম ঐ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন। সে বছরও ঘটনাক্রমে ঐ সাহিত্য সম্মেলনের শেষ অংশে কবিয়াল বিজয় সরকারের কবিগানের আয়োজন ছিল। জসীমউদ্‌দীনের শরীর তখন মোটেই ভালো নয়। বিজয় সরকারের কবিগান শুনতে আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর গান শোনা হল না। তাঁকে ঢাকায় চলে যেতে হল। শ্রোতারা বিজয়ের সুছন্দের ছড়া, বিচ্ছেদীগান ও দার্শনিক বক্তব্যে খুব মুগ্ধ হয়েছিলেন।[১৯]

নাগরিক মানুষের কাছে কবিগান খুব আদৃত ছিল না। তবে শহুরে শ্রোতা ডাক, মালশি, কবি, সখি সংবাদ ইত্যাদি বাদ দিয়ে বিজয়ের বিচ্ছেদী গানের জন্য পাগল ছিলেন। তবু সারা মৌসুমে কবিগান গ্রামীণ মানুষেরই কাছে পরিবেশিত হলেও মাঝে মাঝে শহরে কবিগানের বায়না পেয়ে বিজয় বেশ আনন্দ প্রকাশ করতেন। তবে নাগরিক পরিবেশে গান গাইতে স্বাচ্ছন্দ্য প্রকাশ করতেন না। বরঞ্চ এক ধরনের দ্বিধা তাঁর মধ্যে কাজ করত। তিনি ভয়ে ভয়ে গান করতেন, আধুনিক যুগের তরুণেরা কবিগানের রস আস্বাদন করছে কি না, এই সন্দেহ তাঁকে দ্বিধাগ্রস্ত রাখত।

কবিয়াল বিজয় সরকার অন্তর্মুখী সাধক ছিলেন। বাইরের ঐশ্বর্য তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করত না। মহসিন হোসাইন ছিলেন কবিয়াল বিজয় সরকারের মানসপুত্র (ধর্মপুত্র)। তিনি কবিয়াল বিজয় সরকারের সাথে পরিচিত হওয়ার সময় (১৯৭৬ সন) থেকে তিনি বিজয় সরকারকে তাঁর গান সংগ্রহ করে গ্রন্থ প্রকাশে উৎসাহিত করতে থাকেন। প্রথমদিকে বিজয় সরকার তেমন সাড়া দেননি। এরপর কোলকাতা থেকে প্রকাশিত 'কবিয়াল : কবিগান' গ্রন্থ প্রকাশ পেলে বিজয় দুঃখ প্রকাশ করেন। গ্রন্থে নমশূদ্র কবিয়ালদের প্রতি অবিচার করা হয়। বিজয় সরকারের অনুরোধে তাঁর মানসপুত্র মহসিন হোসাইন 'কবিগান ও রাজেন্দ্রনাথ' (চারণকবি আচার্য রাজেন্দ্রনাথ ও কবিগান) পুস্তকটি রচনা করে। ১৯৭৭ সনে গোপালগঞ্জ থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। বিজয় সরকার বলেছিলেন, 'আমার জাতির কলঙ্ক মোচন হল।' এ পুস্তকে নিজের নাম-পরিচয় সেই প্রথম তিনি ছাপার অক্ষরে নাতিদীর্ঘ আকারে দেখে বেশ খুশি হলেন। এরপর বিজয় সরকার তাঁর রচনাগুলো প্রকাশে নিমরাজি হন। তিনি তাঁর মানসপুত্র মহসিন হোসাইনকে তাঁর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা গানগুলো সংগ্রহ করতে বলেন। মহসিন

---

১৯. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ৩৪

হোসাইন যেহেতু কবিগানের দলেই থাকতেন কিংবা কবিদলের সদস্য ছিলেন সেহেতু গান সংগ্রহ ও বিজয়ের জীবনের খুঁটিনাটি জানা ও সংগ্রহ তাঁর পক্ষে খুব সহজ ছিল। শিক্ষণীয় বিষয়, শাস্ত্রীয় বিষয়-আশয় জানার জন্য যে কোনো সময় বিজয় সরকারকে প্রশ্ন করলে তিনি বিরক্ত তো হতেনই না; বরঞ্চ শারীরিক প্রতিকূলতার মধ্যেও সহজ মনে জবাব দিতেন।[২০]

১৯৪৭ সনের দেশবিভাগের পরে বিজয় সরকার ভারতে গিয়েও কবিগান পরিবেশন করেছেন। একবার তিনি দিল্লির সর্বভারতীয় সংগীত সম্মেলনে ভারতের বিখ্যাত শিল্পীদের পাশাপাশি সংগীত পরিবেশন করার সুযোগ পান। কোলকাতার আধুনিক গানের শিল্পীরাও ঐ সংগীত সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। গুণী শিল্পীরা বিজয় সরকারের গান শুনে প্রশংসা করেছিলেন।

বিজয় সরকার বোলপুর-শ্রীনিকেতন ও উত্তর ভারতের কোথাও কোথাও গান করেছেন। সুদূর দণ্ডকারণ্যের লোকবসতিতেও বিজয় বহুবার কবিগান করেছেন। সারা পশ্চিম বাংলার অগণিত আসরেও তিনি কবিগান ও রামায়ণ গান পরিবেশন করেন।

বিজয় সরকার বাংলাদেশের কৃষ্টি-সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে কবিগানের জনপ্রিয়তা ও জনকল্যাণমুখিনতার পরিপ্রেক্ষিতে কবিগানের প্রসার, প্রচার ও সঠিক মূল্যায়নের প্রয়োজনে 'বাংলাদেশ চারণ কবি সংঘ' নামে বাংলাদেশ ভিত্তিক একটি অরাজনৈতিক কৃষ্টি-সংস্কৃতিমূলক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৭৯ সনের ২০ ফেব্রুয়ারি কবিয়াল বিজয় সরকার একুশে মেলা উপলক্ষে বাংলা একাডেমি চত্বরে কবিগান পরিবেশন করেন। তখন বাংলা একাডেমির ফোকলোর বিভাগের পরিচালক ও উপ-পরিচালক ছিলেন যথাক্রমে জনাব শামজ্জামান খান ও কবি আসাদ চৌধুরী। বাংলা একাডেমির গানের পর বিজয় সরকার জগন্নাথ হল, ঢাকা বেতার ও টেলিভিশনে কবিগান পরিবেশন করেছিলেন। বাংলা একাডেমির চত্বরে কবিয়াল বিজয় সরকার শ্রোতাদের অনুরোধে একের পর এক সতেরটি বিচ্ছেদী ধুয়া গান পরিবেশন করেন।[২১]

১৯৮১ সনের একুশে মেলায় কবিয়াল বিজয় সরকার ঢাকার শিল্পকলা একাডেমিতে কবিগান পরিবেশন করেন। এই সময় বিজয় সরকারের সঙ্গে ছিলেন ফরিদপুরে বোয়ালমারি থানার ধোপাপাড়া গ্রামের কালীপদ মণ্ডল।

বিজয় সরকার কবিগানের ব্যাপক প্রচার, সংরক্ষণ ও গবেষণার জন্য 'বাংলাদেশ চারণ কবি সংঘের' সভাপতি হয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সংঘের প্রচার করেছিলেন আসরে আসরে ছড়া-পাঁচালির মাধ্যমে। তিনি নিজ হাতে প্রচারপত্রও বিলিয়েছেন। বিজয় সরকার বৃহত্তর যশোর, খুলনা, ফরিদপুর-এর বিভিন্ন এলাকায় 'বাংলাদেশ চারণ কবি সংঘ'-এর শাখা গঠন করেন।

কবিগানের পেশা ত্যাগ করলেও কবিগানের গবেষণা ও সংরক্ষণে তাঁর আন্তরিকতার কমতি ছিল না। শেষজীবনে এটাকেই তিনি তাঁর কর্ম বলে ধারণ করেছিলেন। শিল্প সাহিত্য সংসদের পক্ষ থেকেই মহসিন হোসাইন 'ভাটিয়ালী গানের রাজা পাগল বিজয়' পুস্তকটি প্রকাশ করেন। এটাই বিজয় সরকারের প্রথম জীবনীগ্রন্থ ও গানের সংকলন।

দক্ষিণ-মধ্য বাংলায় কবিগান ও জারিগান আজো দুটো লোকপ্রিয় সংগীতধারা। হিন্দু সম্প্রদায়ের কবিয়ালেরা পরিবেশন করেন কবিগান আর মুসলিম সম্প্রদায়ের বয়াতি পরিবেশন করেন জারি গান। দুটো সংগীতধারাই কয়েক শত বছর ধরে পাশাপাশি চলছে। এই অঞ্চলের ফজর বিশ্বাস, পাগলা কানাই, ইদু বিশ্বাস, হাকিমচান, কালাচান, সোনাউল্লাহ, ছায়েজউদ্দিন প্রমুখ পুরনো জারিগানের বয়াতিদের জারি গান ও ধুয়া গানের কথা ও সুর দ্বারা কবিয়াল বিজয় সরকার প্রভাবিত হয়েছিলেন।

---

২০. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ৩৪

২১. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ৩৮

জারিগানের ধারা মুসলমান ও কবিগানের ধারাটি হিন্দুদের দ্বারা রক্ষিত হয়ে আসছে বহুকাল ধরে। তবে শ্রোতারা কবি ও জারিগানকে সমান আদরের চোখে দেখে আসছে। কিন্তু বিজয় সরকারের পূর্বে কবিগানকে জারির কিংবা জারিগানকে কবিগানের আসরে নেওয়ার প্রচেষ্টা হয়নি। নড়াইল জেলার তারপুর গ্রামের বিখ্যাত জারিয়াল মসলেম বয়াতি-র সহযোগে বিজয় সরকার কবিগান ও জারিগান একই আসরে পরিবেশন করেন। কবিগান ও জারিগানের শ্রেষ্ঠ দুই ব্যক্তিত্ব বিজয় সরকার ও মসলেম বয়াতির গান শোনার জন্য এক আসরেই হাজার হাজার শ্রোতাকে উপস্থিত হতে দেখা গিয়েছে। 'খুলনা সাহিত্য পরিষদ' আয়োজিত কবি-জারি এবং ফরিদপুরের বোয়ালমারি থানার ধোপাপাড়া গ্রামের কালীপদ মণ্ডল আয়োজিত (১৯৮০) 'কবি-জারির' আসর বিজয় সরকারের জীবনে দুটো উল্লেখযোগ্য আসর ছিল। এছাড়া আরো অনেক কবি-জারি আসরে বিজয় সরকার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। কবিয়াল বিজয় সরকার যে-সব জারিয়ালের সাথে পাল্লায় গান করেছিলেন তাঁরা হলেন, নড়াইলের মসলেম বয়াতি, খুলনার তোলার বয়াতি (দারোগা), বরিশালের গনি বয়াতি। কবি ও জারিগান পরস্পর গভীর সান্নিধ্যে আসলেও কবিয়াল ও জারিয়াল তাঁদের নিজের নিজের প্যাটার্নের প্রতি নিষ্ঠ ছিলেন। কেউ কারো সাংগীতিক 'প্যাটার্ন' ভাঙতে চাননি। কিংবা ভাঙতে উৎসাহও পাননি। তবে ভাটিয়ালি, ধুয়া-বিচ্ছেদ গান রচনার বেলায় দক্ষিণ-মধ্য বাংলার কবিয়াল-জারিয়ালেরা কখনো কখনো প্রায় অভিন্নসুর ও টেকনিক প্রয়োগের চেষ্টা পেয়েছেন।

কবিয়াল বিজয় সরকার তাঁর জীবনের সুদীর্ঘ সময় কবির লড়াই করেছেন। বাংলাদেশ ও ভারতের হাজার হাজার কবিগানের আসরে গান করেছেন তিনি। বৃহত্তর বরিশাল জেলার অসংখ্য আসরে বিজয় সরকার কবিগান গেয়েছেন।[২২]

বিজয় সরকার তাঁর দীর্ঘ কর্মময় জীবন কাটিয়েছেন যে-সব কবিয়ালের সাথে 'কবির পাল্লা' করে তাঁদের সবার নাম-পরিচয় আজ আর উদ্ধার করার উপায় নেই। যাঁদের নাম ও পরিচয় জানা গিয়েছে তাঁরা হলেন : (১) কবিয়াল মনোহর সরকার (গোপালগঞ্জ) (২) কবিয়াল হরিবর সরকার (গোপালগঞ্জ) (৩) কবিয়াল রাখাল আচার্য সরকার (বরিশাল) (৪) কবিয়াল হরিচরণনাথ নরকার (বরিশাল) (৫) কবিয়াল নিশিকান্ত সরকার (গোপালগঞ্জ) (৬) কবিয়াল কামিনী সরকার (খুলনা) (৭) কবিয়াল রাজেন সরকার (খুলনা) (৮) কবিয়াল রাজেন্দ্রমালো সরকার (নড়াইল) (৯) কবিয়াল রসময় সরকার (নড়াইল) (১০) কবিয়াল ছোট রাজেন সরকার (গোপালগঞ্জ) (১১) কবিয়াল নকুল সরকার (রবিশাল) (১২) কবিয়াল কালীপদ সরকার (গোপালগঞ্জ) (১৩) কবিয়াল চিত্ত সরকার (ফরিদপুর) (১৪) কবিয়াল গৌরসরকার (কুষ্টিয়া) (১৫) কবিয়াল নিতাই সরকার (ফরিদপুর) (১৬) কবিয়াল শেখ গুমানী (ভারত) (১৭) কবিয়াল সুরেন সরকার (ভারত) (১৮) কবিয়াল হরিচরণ সরকার (ঝালকাঠি) (১৯) কবিয়াল নারায়ণচন্দ্রবালা সরকার (ভারত) (২০) কবিয়াল কালশশীচক্রবর্তী সরকার (ভারত) (২১) কবিয়াল শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য সরকার (ভারত) (২২) কবিয়াল অমূল্য সরকার (ভারত) (২৩) কবিয়াল সরোজ সরকার (নড়াইল) (২৪) কবিয়াল শরৎ সরকার (খুলনা) (২৫) কবিয়াল কুমুদবিহারী সরকার (ঢাকা) (২৬) কবিয়াল বড়োরজনী সরকার (ফরিদপুর) (২৭) কবিয়াল ছোট হরিবর সরকার (খুলনা) (২৮) কবিয়াল বরদা সরকার (খুলনা) (২৯) কবিয়াল মোহিনী সরকার (খুলনা) (৩০) কবিয়াল স্বরূপ সরকার (বরিশাল) (৩১) কবিয়াল অশ্বিনী সরকার (খুলনা) প্রমুখ।[২৩]

বিজয় সরকার বৈদিক চিন্তা-চেতনার সাথে আধুনিক চিন্তা ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ যুক্ত করতে ইচ্ছুক ছিলেন। আদি কিংবা জরাগ্রস্ত বলে কোনো চিন্তা ও ধারণাকে দূরে রাখতেন না অন্তত যার মধ্যে কোনো-না-কোনো ভাবে মানবকল্যাণ নিহিত আছে। আহার-বিহার ছাড়া বিজয়ের দুটো হাতের তর্জনি ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা একসাথে মেশানো থাকত। মেডিটেশন বা ধ্যানের প্রবাহমানতাকে ধরে রাখার জন্য এই চেষ্টা। বিজয় ছিলেন অস্তিত্ববাদী দার্শনিক চিন্তার অধিকারী। তাই সারাক্ষণ ধ্যানের মধ্যে

২২. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ৪৩
২৩. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ৪৫

তিনি নিজেকে ডুবিয়ে রাখতেন। তবে সুযোগ হলে তিনি 'ইষ্টনাম' জপ করতেন। তিনি ঘুমিয়ে গেলেও তাঁর দু'হাতের চারটি আঙ্গুল জাগ্রত অবস্থার মতোই মেশানো থাকত। তবে তিনি নিজের ধর্মজীবন, সাধনপদ্ধতি নিয়ে কোনোপ্রকার আত্মপ্রচার কিংবা দম্ভোক্তি করতেন না। দর্শন ও জ্ঞানের আলোচনায় বিজয় ছিলেন সংস্কারমুক্ত।

কবিয়াল বিজয় সরকারের অসংখ্য গুণগ্রাহী ও ভক্ত ছিল। এছাড়া তাঁর ছিল কয়েক হাজার (বাংলাদেশ ও ভারতে) শিষ্য। তাই তিনি কবিগানের মৌসুমে ও অবসরে শিষ্যদের আন্তরিক আগ্রহে বিভিন্ন এলাকায় যেতেন। কবিয়াল বিজয় সরকার একাহারী ছিলেন। তিনি দিনে একবার বিশেষত দুপুরবেলায়ই অন্ন গ্রহণ করতেন।

বিজয় সরকার দীর্ঘদিন কবিগানের পেশায় থেকে সওয়াল ও জবাব নিয়ে কাজ করতে করতে একজন বিচক্ষণ বিচারশীল মানুষ হয়ে ওঠেন। তাই তিনি সত্যকে সত্য, মিথ্যাকে মিথ্যাই জানতেন, এর কোনো ব্যতিক্রম হত না। এর ব্যতিক্রম হলে বিজয় ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ হতেন। তবে অল্পপরিচিত লোকেরা তা বুঝতে পারত না। যারা বুঝতে পারত না তারা তাঁকে মেজাজি লোক হিসেবেই চিহ্নিত করত। সত্য প্রকাশার্থে এই মেজাজি মানুষটির ভেতরে ছিল অসম্ভব দয়ালু মানুষ।

জীবনের শেষ পর্যায়ে বিজয় সরকার নিজের বৈষয়িক ব্যাপারে বেশ উদাসীন ছিলেন। তাঁর আর্থ-সামাজিক ব্যাপার বলে কিছুই ছিল না। ইতোমধ্যে তাঁর স্ত্রী ও পুত্রগণ সংসারের স্বাভাবিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 'রামায়ণ গান' গেয়ে তিনি কোনো পারিশ্রমিক নিতেন না। কবিগান গেয়ে অর্থ উপার্জন করতেন। তবে তিনি সবসময় তাঁর সাধ্যমতো দুর্বল ও গরিবদের সাহায্য করে যেতেন।

কবিয়াল বিজয় সরকারের একটি দুর্বলতা ছিল শিক্ষিত মানুষের প্রতি। যদি কোনো দর্শনার্থী কিংবা ভক্তের পরিচয়সূত্রে তিনি জানতে পারতনে যে, ঐ ব্যক্তি বিএ পাশ কিংবা এমএ তাহলে তাঁকে একটু বেশি খাতির করতেন, মর্যাদাও দিতেন। তবে তিনি যদি জানতেন, 'শিক্ষিত লোকটি' সার্টিফিকেটই পেয়েছে কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা পায়নি, তখন তিনি আশাভঙ্গের যন্ত্রণা পেতেন।

বিজয় গান রচনার ব্যাপার খুব সচেতন ছিলেন। তিনি এক সময় বসে একটা গান রচনা করতেন না। তাঁর রচনাপদ্ধতি ছিল অভিনব। তিনি একটি গান প্রথম মনে মনে রচনা করতেন। গানটির রচনা কাজ শেষ হতে চার-পাঁচ দিন সময় লাগত। গানটি যেমন তিনি মনে মনে রচনা করতেন তেমনি মনে মনে কথার ওপর সুরের প্রলেপ দিতেন। জীবনের শেষদিকে বিজয়ের চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে এলে ভালো লিখতে পারতেন না। তখন অন্য লোকের সাহায্য নিতে হত তাঁকে। বিজয় নতুন গান রচনা করে উৎসাহীদের সানন্দে ডেকে বলতেন, 'নতুন গান হয়েছে, লিখে নাও। কয়েক দিন ধরে শব্দেরা চোখের সামনে খেলা করছিল।' নতুন কোনো গান রচনা করতে পারলে বিজয় অসম্ভব আনন্দ অনুভব করতেন। নতুন গান নিয়ে তিনি উপস্থিত প্রিয়ভাজনদের সাথে আলাপ করতেন। কেউ যদি তাঁর রচনার উৎকর্ষের জন্য কোনো শব্দ পাল্টিয়ে ভিন্ন কোনো শব্দ প্রয়োগের প্রস্তাব দিতেন তা বিজয় সরকার সহজ মনে গ্রহণ করতেন। তিনি কোনো অহমিকার বশীভূত ছিলেন না।

প্রতিপক্ষের রূঢ় আচরণে বিজয় সরকার কখনো বিচলিত হতেন না। বরঞ্চ কোনো বিবাদে না গিয়ে তিনি প্রতিপক্ষের মূঢ়তাকে কৌশলে নিজের কাজে লাগাতেন– এটা ছিল বিজয় সরকারের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কোমল মনের অধিকারী ছিলেন বিজয়। সাধারণ মানুষের দুঃখে তিনি সহজে কাতর হতেন। মিথ্যা জাত্যাভিমানকে বিজয় সরকার ঘৃণা করতেন। তিনি 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। মানুষকেই তিনি সবচেয়ে বড় জেনেছেন। সারাজীবন এই চিন্তা-চেতনা নিয়ে তিনি নীরবে সংগ্রাম করেছেন। এটা ছিল বিজয় সরকারের একটি বড় বৈশিষ্ট্য।[২৪]

২৪. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ৫২

শেষজীবন ও মৃত্যু

১৯৮১ সনে কবিয়াল বিজয় সরকার একটি দুঃখজনক ঘটনার মধ্য দিয়ে কবিগানের পেশাত্যাগ করেন। এরপর তাঁর জীবনে আসে অখণ্ড অবসর জীবন। শেষজীবনে বিজয় সরকার চোখের দৃষ্টি হারাতে থাকেন। বিজয় সরকার নমঃশূদ্র সমাজে ও জেলে সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গুরু হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। জলাচারণীয় 'নবশাখ' সম্প্রদায় থেকেও কিছু কিছু লোক বিজয় সরকারের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। বিজয় সরকারের বেশ কিছু শিষ্য ছিল। ঐ শিষ্যগণ বাংলাদেশ, পশ্চিমবাংলা ছাড়িয়েও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে অবস্থান করছেন। দীক্ষিত শিষ্যরা শেষজীবনে অতি সম্মানের সাথে বিজয়কে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে যেতেন এবং ধর্মীয় উপদেশ গ্রহণ করতেন। শেষজীবনে বিজয় সরকারের দীক্ষিত শিষ্যের সংখ্যা বেড়ে যায়। তাই দৃষ্টিহীনতা থাকলেও ভক্ত শিষ্যদের টানে তাঁকে ভারতে যেতে হত। আবার বাংলাদেশের শিষ্যদের আকর্ষণে তাঁকে এই দেশে এসে থাকতে হত। বিজয় সরকার যেহেতু স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারতেন না তাই তাঁর বিশাল গণযোগাযোগ বেশ ক্ষীণ হয়ে আসে। শেষজীবনে কবিগানের আসর ত্যাগ করে বিজয় কিছুটা নিভৃতচারী হয়ে উঠেছিলেন। বাংলাদেশে অবস্থানকালে বর্তমান নড়াইল জেলার কয়েকটি গ্রামে বেশি বেশি অবস্থান করতেন। নড়াইল জেলার মাইগ্রাম, মাউলি দিঘলিয়া, টাবরা, নন্দকোল প্রভৃতি গ্রামে বিজয় সরকার শিষ্যদের গভীর সান্নিধ্যে থাকতেন। ১৯৮২ সনে বিজয় তাঁর জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করার জন্য গভীর ইচ্ছে প্রকাশ করেন। তিনি মাইগ্রামের অধিবাসী তাঁর দীক্ষিত শিষ্য খগেন ডাক্তারের বাড়িতে থেকে আত্মজীবনী লেখার তথ্য দিতে থাকেন। খগেন ডাক্তার এইগুলো নোট করে মাউলি'র মানিক বিশ্বাসের কাছে ক্রমান্বয়ে দিতে থাকেন। এরপর মানিক বিশ্বাস বিজয় সরকারের 'আত্মজীবনী' অনুলেখনের কাজ শুরু করেন। মানিক বিশ্বাস বিজয়ের আত্মজীবনী লেখন-কাজ অনেকখানি শেষ করেন। কিন্তু বিজয় সরকারের নোট দেওয়ার কাজ শেষ হতে-না-হতেই তড়িঘড়ি করে তিনি ভারতের উত্তর ২৪ পরগনার কেউটিয়ায় গমন করেন। তখন পর্যন্ত ভারতে কবিয়াল বিজয়ের রচিত কোনো গানের সংকলন প্রকাশ হয়নি। কিংবা তাঁকে নিয়ে কেউ কোনো আলোচনা-সমালোচনা পত্রপত্রিকায়ও লেখেননি। বাংলাদেশে তাঁর মানসপুত্র জনাব মহসিন হোসাইন বিজয়ের ওপরে একখানি পুস্তক ও এগারোটি মৌলিক প্রবন্ধ বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করেন। যাহোক, ১৯৮৩ সনে পশ্চিম বাংলার রাজধানী কোলকাতায় ১৫ জানুয়ারি বিজয় সরকারের একটি গানের সংকলন 'বাঙলার লোক-কবি সরকার বিজয় অধিকারীর গীতিমালা' প্রকাশ পায়। এই উপলক্ষে ঐ দিন ভারতের কোলকাতায় ৩৬ সেকস্‌পিয়ার সরণি'র ভাষা পরিষদ হলে ঐ গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব ও বিজয় সরকারকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।[২৫] এ অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য। বক্তৃতা করেন ড. দেবীপদ ভট্টাচার্য, ড. তুষার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। সম্বর্ধনার জবাবে বিজয় সরকার বক্তৃতা করেছিলেন। তিনি তাঁর কয়েকটি গানও পরিবেশন করেছিলেন। বিজয় সরকারের প্রধান শিষ্য কবিয়াল রসিক সরকার ও তাঁর দল বিজয় সরকারের কয়েকটি গান পরিবেশন করেছিলেন।

বিজয় সরকার শেষজীবনে অন্ধ হয়ে যান। তাঁকে বাংলাদেশের যশোর সরকারি হাসপাতাল, কোলকাতার পিজি হাসপাতাল ও ভারতের কয়েকটি চক্ষু ক্লিনিকে চিকিৎসা করানো হয়। কিন্তু বিজয় তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাননি।

দৃষ্টিহীনতা ছাড়াও বিজয় সরকার জীবনের শেষদিকে গ্যাসটিকে ভুগছিলেন। অসুস্থতার এক পর্যায়ে বিজয় সরকারকে তাঁর নিজ বাড়ি কেউটিয়া থেকে তাঁর কন্যা কানন বিশ্বাসের বেলুড়স্থ বিধান পল্লির বাসায় স্থানান্তর করা হয়। ১৯৮৫ সনের ৪ ডিসেম্বর রাত ১০টা ৫৫ মিনিটে বিজয় সরকারের দেহান্তর ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর ২ মাস ১৯ দিন।[২৬]

---

২৫. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ৬১

২৬. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ৬১

সাহিত্যকর্ম

কবিয়াল বিজয় সরকারের প্রথমজীবনের কোনো রচনা পাওয়া যায়নি। তিনি যখন নড়াইলের সিঙ্গা-শোলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতেন তখন প্রথম কবিতা রচনা করেছিলেন। প্রথম রচনা হিসেবে রচনাটি শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

বিজয় সরকার প্রধানত এবং বিশেষত গান রচনায়ই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। তবে মাঝে মধ্যে তিনি যেমন স্বরবৃত্ত ছন্দের কবিতা রচনার চেষ্টা করেছিলেন তেমনি তাঁর রচিত কিছু কিছু আশীর্বাদমূলক রচনাও দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া বিজয় সরকার যতদিন চোখে দেখতে পারতেন তত দিনে একান্ত অনুরাগী ও প্রিয়জনদের কাছে কিছু কিছু চিঠি লিখেছিলেন। কবিয়াল বিজয় সরকারের চিঠিতেও রয়েছে সাহিত্য ও দর্শনের ছাপ। কোন তারিখে বিজয় সরকার প্রথম গান রচনা করেন তা তিনিও স্মরণে আনতে পারেননি। তবে সাক্ষাৎকারে বিজয় সরকার জানিয়েছেন, তিনি নতুন কবির দল গঠনের পরে গান রচনায় হাত দিয়েছিলেন। বিজয় সরকারের প্রাপ্ত রচনাবলিকে মোট ৫ ভাগে ভাগ করা যায়। যথাক্রমে : (১) গান (২) কবিতা (৩) আশীর্বাদ কবিতা (৪) মিশ্র কবিতা ও (৫) চিঠিপত্র।

গান রচনার মধ্যে কবিয়াল বিজয় সরকার তাঁর চিন্তাকে বেশি নিয়োজিত করেছিলেন। বিজয়ের রচিত গানকে প্রধানত ২ ভাগে ভাগ করা যায়, (১) কবিগান ও (২) কবিগান নিরপেক্ষ গান। যে গানগুলো কবির আসরের প্রয়োজনে রচনা করেছিলেন সে গানগুলো কবিগান বিষয়ক গান বা 'কবিগান'। এই কবিগানের মোট সংখ্যা হল ১৭টি। এই ১৭টি রচনার মধ্যে ২টি বন্দনা গান, ৬টি ডাকগান, ১টি আগমনী গান, ১টি ভবানী বিষয়ক, ২টি মালসি, ৩টি কবি ও ২টি সখি সংবাদ।

কবিয়াল বিজয় সরকারের প্রচণ্ড খ্যাতি ও পরিচিতি লাভ হয়েছে তাঁর কবিগানগুলোর মধ্য দিয়ে। আগের দিনের কবিয়ালেরা গড়ে কীর্তনাঙ্গের গান দিয়ে কবিগানের আসরে মুখ পাঁচালি দিয়ে টপ্পা বলতেন, ছড়া কাটতেন। বিজয় সরকার প্রথমজীবনেই মুখপাঁচালিতে রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলসংগীত ও জসীমউদ্‌দীনের গান দিতেন। এবং উল্লিখিত গীতিকারদের গানের দ্বারা 'ধুয়া' দিতেন। পরবর্তীকালে বিজয় নিজেই ঐ পর্যায়ের গান রচনায় উৎসাহী হন। কবিগানের আসরে আধুনিক শ্রোতারা বিজয় সরকারে ধুয়াগান শোনার জন্য বারবার অনুরোধ করছেন। আসরে 'ধুয়া' দেওয়ার জন্য বিজয় সরকার যে গানগুলো রচনা করেছিলেন পরবর্তীকালে সেই রচনাসমূহই বিজয় সরকারকে বাংলা গানের অঙ্গনে বিপুল মর্যাদা দিয়েছে।

আধ্যাত্মিক গান : বিজয় সরকারের শিল্পীমানসে আধ্যাত্মভাব আগাগোড়া কাজ করেছে। তিনি ছিলেন ভাববাদী দার্শনিক চিন্তার অধিকারী। তাই তাঁর রচনায় কোনো-না-কোনোভাবে আধ্যাত্মিকতাই প্রসারিত হয়েছে। বিজয় বিভিন্ন সময়ে বিচিত্র সব ধর্মীয় বিশ্বাসীদের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করেছেন। তিনি তাদের বিশ্বাস ও ভক্তিতে মুগ্ধ হয়ে বেশ কিছু ধর্মীয় আধ্যাত্মিক গান রচনা করেন। বিজয়ের আধ্যাত্মিক গানের মধ্যে আছে হরিভক্তি বিষয়ক গান, মতুয়াপন্থীদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত গান, কৃষ্ণ বিষয়ক গান ইত্যাদি। বিজয় সরকারের বিখ্যাত আধ্যাত্মিক গানের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল,

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে রাম',
'ধর্ম লয়ে মাতামাতি করে অনেক জন',
'নিজে খুঁজে দয়াল হরি পাইনা নিজের পথ',
'দয়ালগুরু গো চির কাঙ্গাল করে আমায় রাখিয়ো ধরায়',
'তুমি বিবিধ বিধি ন্যায়ের নিধি ওহে বিশ্বের বিচার স্বামী',
'অপূব এক মানুষরে ভাই সর্ব দেশে তার বসতি',
'কৃষ্ণ প্রেমের প্রেমিক যে জন নয়ন যায় চেনা রে,

'কবে শ্রীধাম ওড়াকান্দি যাবো রে',
'গীতা শাস্ত্র ব্রহ্ম অস্ত্র একমাত্র সংসার সংগ্রামে' ইত্যাদি[২৭]।

বিচ্ছেদী গান : বিজয় সরকারের অতুলনীয় বিচ্ছেদীগান ও তাঁর সুরের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। বিজয় সরকারের বিচ্ছেদী গানের সাথে আর কারো বিচ্ছেদী গানের তুলনা হয় না। বিজয় সরকার গান রচনায় তিনি রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, নজরুলকে সামনে রেখে গান রচনা করছেন। বিজয় সরকারের সহজ স্বীকারোক্তি তাঁর বিচ্ছেদী গান প্রসঙ্গেই বেশি প্রযোজ্য। বিজয় নর-নারীর প্রেমবিচ্ছেদজনিত গান ছাড়াও রাধাকৃষ্ণকে লক্ষ্য করে অনেকগুলো বিচ্ছেদী গান রচনা করেছিলেন। বিজয় সরকারের কয়েকটি জনপ্রিয় বিচ্ছেদ গানের প্রথম ছত্র উদ্ধৃত করা হল :

(১) আমার জাত গিয়াছে সখিরে সেই কালার পিরীতে
(২) আমি যারে বাসি ভাল সে কি রে তা জানে
(৩) ওপারে মোর বন্ধু থাকে ওপারে মোর কুঁড়েখানি
(৪) তোমায় একদিন দেখিয়া রে পরান কান্দে পরান বঁধূয়ারে
(৫) ভরা ভাদরের নদী জানো নি তার কথা
(৬) তোরে কত ভালো লাগে– ওরে আমার চিকন কালো শ্যাম
(৭) বৃন্দাবন অন্ধকার আজি শ্যাম বনে নাই
(৮) আমার মনে মেনেছে আমার জানে জেনেছে তমি আসবে না
(৯) তুমি জানো না, তুমি জানো না রে প্রিয় তুমি মোর জীবনের সাধনা ইত্যাদি।[২৮]

শোক গান : বিজয় সরকারের বিচিত্র গানের ভাণ্ডারের মধ্যে বেশ কিছু শোক-সংগীত বা শোকগান রয়েছে। বিজয় সরকারের প্রিয় ব্যক্তিদের মৃত্যুতে তিনি এ শোকগানগুলো রচনা করেছিলেন। কয়েকটি শোক গানের প্রথম ছত্র উদ্ধৃত করছি :

(১) আগের খেয়ায় চলে গেছেন প্রফুল্ল গোঁসাই
(২) এবার ছেড়েছে মায়ার সংসার কবিগুরু রাজেন্দ্র সরকার
(৩) রাই রসরাজ নাই বুঝি আজ
(৪) জনপ্রিয় নরেন মোদের এবার ছাড়িল সংসার ইত্যাদি।
আলোচিত গানগুলো ছাড়াও বিজয় সরকার রচিত আরো কিছু শোকগান রয়েছে।[২৯]

প্রকৃতিবিষয়ক গান : প্রকৃতির প্রতি বিমুগ্ধ বিজয় সরকার সারাজীবন প্রকৃতির একান্ত অনুরাগী হিসেবে বিচরণ করেছেন। প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্য তাঁর শিল্পীমনকে বিপুলভাবে আলোড়িত করে। তাই তাঁর অনেকগুলো গানেই প্রকৃতির বর্ণনা ও প্রকৃতির বিশ্বস্ত ছবি ধরা পড়েছে। এই রচনাগুলোর মধ্যে বিজয় সরকার প্রকৃতির প্রেমে আত্মহারা হয়ে উঠেছিলেন। বিজয়ের প্রকৃতি বিষয়ক কয়েকটি গানের প্রথমছত্র উদ্ধৃত করা গেল :

(১) সুন্দর বনে দেখে এলাম রে সুন্দরী এক মেয়ে
(২) আকাশ আঙ্গিনায় রঙিন মেঘের দোলনায়
(৩) কে তোরে সাজালো রে কুমুদিনী এমন করিয়া
(৪) ভাটির নদী বয়ে যায় কয়ে যায় তার শূন্য বুকের ব্যথা ইত্যাদি।[৩০]

---

২৭. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ৬৬
২৮. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ২৮
২৯. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ৬৪
৩০. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ৬৫

আত্মকথনের গান : বিজয় সরকার তাঁর দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে রচনা করেছেন বেশ কিছু গানের কথা। যে কোনো রচনাই অভিজ্ঞতার ফসল। তবু ঐ গানগুলোর মধ্যে রয়েছে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও নিজস্ব দর্শনেরই একান্ত স্পর্শ। এই আত্মকথনের গানগুলোকে তাঁর নিজের উক্তিও বলা যায়। কয়েকটি জনপ্রিয় আত্মকথন গানের প্রথমছত্র উদ্ধৃত করা হল :

(১) এই পৃথিবী যেমন আছে তেমনি ঠিক রবে, সুন্দর এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে
(২) আমার গানের মালা গাঁথিয়া রাখিলাম হরষে
(৩) আমায় গানের পদ ভেসে বেড়ায় লোকের মুখে অসম্পূর্ণ
(৪) আমার গানের পদ ধরে আমার কেউ বিচার করো না
(৫) আমার উচিত বিচার করলে আমি খালাস পাই না কোনো মতে ইত্যাদি।[৩১]

দেশের গান :বিজয় সরকার দেশকে ভালোবেসে কিছু বন্দনা গান করেছেন। বিজয় তাঁর দেশের গানের মধ্যে দেশরক্ষার্থে জাতীয় পতাকা হাতে করে 'নও জোয়ানকে' সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। আবার দেশমাতৃকার ফুল, ফসল, ফলমূলের প্রশংসাও করেছেন। বিজয়ের দেশে গানের সংখ্যা খুব বেশি না হলেও রচনাগুলো ব্যতিক্রমধর্মী। বিজয়ের দুটো দেশের গানের প্রথম ছত্র উদ্ধৃত করছি :

(১) আমার পূরবের বাংলারে গরবের জন্মস্থান
(২) বাংলাদেশ কি জিন্দাবাদ বল রে চলো রে নওজোয়ান।[৩২]

একুশের গান : বিজয় সরকার **১৯৭৯** সনের ২০ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমির চত্বরে কবিগান পরিবেশন করেছিলেন। এই কবিগানের জন্য বিজয়কে দীর্ঘ প্রস্তুতি নিতে হয়েছিল। তখন বিজয় সরকারকে ৪টি গান রচনা করতে হয়েছিল। এই ৪টি গানের একটি ছিল একুশের গান। অন্যদুটো গান ছিল যথাক্রমে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে। বিজয় সরকার একুশের গান বা ভাষার গান একটিই লিখেছিলেন। বিজয়ের এই ভাষার গানটির মূল্যায়ন হয়নি। গানটির কিছু অংশ উদ্ধৃত করা গেল :

"বাংলাদেশের মানুষে ফেব্রুয়ারি একুশে
ভুলিতে পারবে না জীবনে
ভাষা আন্দোলনের জন্য সমাজ হলো বিপন্ন
কুখ্যাত সরকারের শাসনে ॥"[৩৩]

জাত্যাভিমানের বিরুদ্ধের গান : কবিয়াল বিজয় সরকার তথাকথিত শূদ্র সমাজে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে অভিজাত হিন্দু সমাজের নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন। এই নির্যাতনের মূলে ছিল মিথ্যা জাত্যাভিমান। বিজয় সরকার তাঁর রচনার মধ্যে জাত্যাভিমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। ছুৎদোষ বা স্পর্শদোষের বিরুদ্ধে বিজয় সরকার বেশ কয়েকটি গান রচনা করেছিলেন। জাত্যাভিমানের বিরুদ্ধে জনপ্রিয় ৩টি গানের প্রথম ছত্র উদ্ধৃত করা গেল :

(১) ছুঁয়ে দিলে যে গুরুর যায় জাতি কুল
(২) জাতির বললে কি বুঝলে পণ্ডিত মশাই
(৩) হিন্দু সমাজ বুঝলি কই হয়েছে কি বিরাট ক্ষতি।[৩৪]

---

৩১. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ৬৪
৩২. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ৬৫
৩৩. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ৬৪
৩৪. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ৬৬

ইসলামি গান : বিজয় সরকার সর্বধর্মের সার গ্রহণ করে তাঁর জীবনদর্শন স্থির করেছিলেন। কোনো প্রকার ভেদবুদ্ধি তাঁকে দ্বিধান্বিত করেনি। তিনি ইসলাম ধর্মীয় গ্রন্থাদি সাধ্য মতো পাঠ করেছিলেন। মুসলিম আউলিয়া-সাধক ও দার্শনিকদের জীবনী ও সাহিত্য তিনি পাঠ করেছিলেন। অসংখ্য মুসলমান সংগীতপিপাসু ছিলেন তাঁর ভক্ত-অনুরাগী। বিজয় সরকার পেড়লির পীরসাহেব কেবলা মাওলানা ফয়েজ আহমদ ফায়েজির বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। পীরসাহেবের প্রভাব, মুসলমান শ্রোতাদের চাহিদা এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিক অনুরাগে বিজয় সরকার বেশ কয়েকটি ইসলামি গান রচনা করেন। বিজয়ের রচিত ইসলামি গানের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ বিষয়ক, রসুল (সাঃ) বিষয়ক ও ইসলামধর্ম বিষয়ক গান। বিজয় সরকারের রচিত ৩টি ইসলামি গানের প্রথমাংশ উদ্ধৃত করা গেল :

(১) আল্লাহ রসুল বল, বল মোমিন আল্লাহ রসুল বল
(২) কি যেন কি দিলে রে আল্লাহ রসুলের মাঝারে
(৩) শোন মোমিন মুসলমান ফোরকানের ফরমান[৩৫]

আধুনিক গান : বিজয় সরকার পঞ্চাশ দশকের আধুনিক বাংলা গানের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছিলেন। তিনি কমল দাশগুপ্ত, সুধীর চক্রবর্তী, সুবল দাসগুপ্ত প্রমুখ আধুনিক গানের সুরকারের গান গ্রামোফোনে শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কবিগানের ফাঁকে ফাঁকে বিজয় সেই পঞ্চাশ দশকেই আধুনিক গান রচনায় এগিয়ে আসেন।

বিজয় সরকার প্রথম দুটিগান রচনা করেছিলেন শিল্পী জগন্ময় মিত্র-এর গাওয়া এবং সুবল দাশগুপ্তের সুর করা 'সাতটি বছর আগে' ও 'সাতটি বছর পরে' গানেরই অনুকৃতিতে তা সহজে অনুমান করা যায়। তবে ঐ গান দুটোয় বিজয় সরকার তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও আবেদন রক্ষা করার প্রয়াস পেয়েছেন। কালের কষ্টিতে ঘর্ষণ খেয়ে খেয়ে বিজয়ের আধুনিক গানগুলো ভালো অবস্থান না পেলেও আধুনিক বাংলা গান রচনার ইতিহাসে বিজয় সরকারের প্রয়াস উল্লেখের দাবি রাখবে।[৩৬]

ব্যক্তিকে নিবেদিত গান : দেশ-জাতি, কৃষ্টি সাহিত্যে যাঁরা বিশেষ অবদান রেখেছিলেন বিশেষত দেশগঠনে কৃতিব্যক্তিদের প্রতি বিজয় সরকার বেশকিছু গান রচনা করেছিলেন। বিজয় সরকার যাঁদের নিয়ে গান রচনা করেছিলেন তাঁরা হলেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ। বিজয় সরকারের ব্যক্তিকে নিবেদিত গানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

(১) কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কে বলে আজ নেই
(২) উজ্জ্বলিত কবিকুল করিলে কবি নজরুল
(৩) ঊনিশ শত সত্তর সালে হিমেল বাতাসে সাতই ডিসেম্বর মাসে
(৪) বাংলাদেশ দরদি দয়া করে যদি আসিয়াছো আজি দেশের মমতায় ইত্যাদি।[৩৭]

শ্রাবণী গান : বিজয় সরকারের প্রথম স্ত্রী বীণাপাণি অধিকারী ১৩৫২ সনের ২৪ শ্রাবণ ডুমদিতে দেহত্যাগ করেন। বীণাপাণির স্মরণে বিজয় সরকার প্রতি বছর একটি করে বিচ্ছেদী গান রচনা করতেন।[৩৮] এই গানগুলোতে কোনো-না-কোনোভাবে শ্রাবণ প্রসঙ্গ এসেছে। প্রকৃতির প্রতি নিমগ্ন কবি শ্রাবণকে বারবার 'নিঠুর' বা নিষ্ঠুর হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বিজয় ঐ গানগুলোকে 'শ্রাবণীগান' বা 'শ্রাবণীসংগীত' বলতেন। বিজয় সরকার ১৩৫২ সনের পর থেকে একটি করে গান লিখলে শ্রাবণী

---

৩৫. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ৬৬
৩৬. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ৬৭
৩৭. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ৬৭
৩৮. মহসিন হোসাইন, *কবিয়াল বিজয় সরকারের জীবন ও সঙ্গীত* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪), পৃষ্ঠা ৪২

গানের সংখ্যা কম নয়। এই গানগুলোকে বিজয়ের স্ত্রীবিয়োগজনিত গান হিসেবে গণ্য করা যায়। এখানে কয়েকটি 'শ্রাবণী গানের' প্রথমাংশের উদ্ধৃতি দেওয়া হল :

(১) আজি শ্রাবণ-বাদল ঝুরে রে আমার মনে পড়ে ভুলে যাওয়া গান
(২) আষাঢ়ের কোন ভেজা পথে এলো এলো রে আবার দুরন্ত শ্রাবণ
(৩) তুই তো আবার এলি রে শ্রাবণ বাদল ভেজা পথে
(৪) ও নিঠুর শ্রাবণের ও তুই আবার কেন এলি রে এই দেশে ইত্যাদি।[৩৯]

বিস্ময়করবস্তু সম্পর্কিত গান : বিজয় সরকার বিখ্যাত ও ঐতিহাসিক বহু স্থান ভ্রমণ করেছিলেন। কোনো কোনো স্থান কিংবা কোনো কোনো বিস্ময়কর বস্তু দর্শনেও বিজয়ের কবিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। আর সেইসব নিয়েও তিনি গান রচনা করেছেন। একবার বৃন্দাবন দর্শন করতে গিয়ে বিজয় মুগ্ধ হয়েছিলেন, মুগ্ধ হয়েছিলেন বৃন্দাবনের বিভিন্ন স্মৃতিচিহ্ন দেখে। তিনি রচনা করেছিলেন একটি অনন্য গান। গানটির প্রথম দুই ছত্র হল :

"বৃন্দাবন অন্ধকার আজি শ্যাম ব্রজে নাই,
ঘোরে পথে পথে উদাসিনী গো কৃষ্ণ হারা রাই ॥"

বিজয় সরকার গিয়েছিলেন পুরনো দিল্লিতে পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম তাজমহল দেখতে। তাজমহল বাদশাহ শাহজাহানের নির্মিত। বাদশাহ তাঁর প্রিয়তমা পত্নী মমতাজ মহলের স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছিলেন বহু অর্থব্যয়ে। আজো সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে 'তাজমহল' এক বিস্ময়কর বস্তু। কবিয়াল বিজয় সরকারও 'তাজমহল' নিয়ে একটি অনন্য গান রচনা করেছেন। রচনাটিতে রয়েছে তাঁর নতুন দর্শন ও চিন্তার প্রতিফলন। বিজয় সরকারের 'তাজমহল' সম্পর্কিত গানটির দুই ছত্র উদ্ধৃত করা গেল :

"শুধু পাষাণ নয় ঐ তাজমহলের পাথর,
ও সে প্রেমিকের পরানের ছন্দ আনন্দের এক মিলনবাসর ॥"[৪০]

জননী সম্পর্কিত গান : মানুষ মাত্রই জন্মদাত্রী মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। প্রত্যেক কবি-গীতিকারই মা-কে নিয়ে কম-বেশি দুই একটি স্মৃতিতাড়িত সুমিত শব্দের সুন্দর গান রচনা করেছেন। বিজয় সরকার রচিত এ ধরনের একটি গানের প্রথম দুইছত্র নিম্নরূপ :

"আমার মায়ের মতো দরদি ভাইরে কোথাও পাব না,
এ জীবনে মায়ের ঋণ কেউ শোধ করিতে পারে না ॥"[৪১]

নিজ মৃত্যুবিষয়ক গান : একবার বিজয় সরকার বিশেষ প্রয়োজনে ভারতে গমন করেন। বিজয়ের দেশত্যাগের কালে নড়াইলের অদূরে বিজয় নামের অন্য কোনো এক ব্যক্তি মৃত্যু হয় ডাকাতের অত্যাচারে। কিন্তু লোকমুখে প্রচারিত হয় যে, বিজয় সরকার ডাকাতের আক্রমণে মারা গিয়েছেন। তখন বিজয় সরকারের অসংখ্য ভক্ত-অনুরাগী হাহাকার করতে থাকেন। এই মৃত্যুসংবাদ ভারতে বিজয় সরকারের কাছেও পৌঁছে যায়। এই মিথ্যা মৃত্যুসংবাদে জনমনে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তা বিজয়মানসেও আলোড়নের সৃষ্টি করে। তিনি তাঁর জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করতে পারেন। তখন তিনি স্বীয় মৃত্যুবিষয়ক একটি গান রচনা করেন। গানটির কিছু অংশ উদ্ধৃত করা গেল :

"সন তেরেশো ছিয়াত্তর সাল আশ্বিন মাসেতে
খবরে প্রকাশ দেশেতে

---

৩৯. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ৬৭
৪০. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ৬৮
৪১. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ৬৯

ক্রমে প্রচারিত হলো সংবাদ সারা বাংলাতে ॥"[৪২]

বিবিধ গান : কবিয়াল বিজয় সরকারের বন্ধু ছিলেন নড়াইল জেলার কালিয়া থানার মির্জাপুর গ্রামের প্রফুল্লকুমার বিশ্বাস বা প্রফুল্ল গোঁসাই। প্রফুল্ল'র মৃত্যুতে বিজয় সরকার একটি শোকগানও রচনা করেছিলেন। প্রফুল্ল গোঁসাই কয়েক শত গান রচনা করেছিলেন। প্রফুল্ল গোঁসাইয়ের অধিকাশ গান ছিল আঞ্চলিক ভাষায় রচিত 'কমিক গান'। প্রফুল্ল সরকারের কমিক গানের মতো বিজয়ের কমিক গান তেমন রসোত্তীর্ণ হয়নি। তবু বিবিধ গানের মধ্যে বিজয়ের দুটো কমিক গানের প্রথমাংশ উদ্ধৃত করা হল :

(১) ক্যারোলিনের জামারে ভাই এলো পাড়াগায়ে
(২) সে দিন যাচ্ছিলাম ভাই পটোল তুলে। [৪৩]

গান রচনা ছাড়াও কবিয়াল বিজয় সরকার মাঝে মধ্যে লৌকিক স্বরবৃত্ত ছন্দে কবিতা লেখার চেষ্টা করেছেন। বিজয় সরকারের এরূপ ৭টি ছোট-বড় কবিতা রয়েছে। কবিতাগুলোর শিরোনাম হল, (১) প্রণতি (২) স্বভাব (৩) সান্ত্বনা (৪) প্রদীপের সলতা (৫) খেলার ডাক (৬) চন্দ্র বিজয় ও (৭) সলোমন। এছাড়া 'ত্রিধারা' নামের একটি মিশ্র কবিতা রয়েছে।[৪৪]

জীবনদর্শন

কবিয়াল বিজয় সরকার ছিলেন ভাববাদী দার্শনিক চিন্তার অধিকারী এক ব্যক্তিত্ব। ভারতীয় ধর্মগ্রন্থাদি বিশেষত গীতা, বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত, গ্রন্থসাহেব, বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ প্রভৃতি পাঠ করেছিলেন। এছাড়া আল কুরআন, বাইবেল ও হাদিস গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। ইসলামের সুফিদর্শন, সুফিদের জীবনবৃত্তান্ত, ভারতীয় পুরাণ-ইতিহাস ও মুসলিম ধর্মের ক্রমবিকাশের ধারা বিজয় সরকার দীর্ঘকাল ধরে অনুশীলন করেছিলেন। তাই দেখা যায়, বিজয়ের শিল্পীমানসে ছিল সর্বধর্মসমন্বয়ের এক দর্শনগত প্রচেষ্টা। বিজয়ের জীবনদর্শন তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাস বা দর্শনের বিকাশের সাথে সাথে বৃদ্ধি লাভ করেছিল।

বিজয় সরকার ভাববাদী সাধক বা মিষ্টিক। তিনি তাঁর অন্তরদেশে যে সত্যকে অনুভব করেছেন তা বিচারজ্ঞান কিংবা যুক্তি দিয়ে অনুভব করা চলে না। তা শুধু অনুভব করা যায় বোধি দিয়ে। তাঁর জীবনদর্শন ও সংগীতদর্শন হল, সীমার মধ্যে অসীমের অপরূপ মহিমা প্রচার।[৪৫]

কবিয়াল বিজয় সরকারের শিল্পীমানসে বস্তু ও ভাবের সমন্বিত রূপ হল তাঁর অবিস্মরণীয় গীতিকবিতাসমূহ। মাটির পৃথিবীতে তিনি আছেন তবে তা খুব বেশিকালের জন্য নয়। এখানকার পুত্র-পরিজন, সংসার– সবই তাঁর কাছে মায়াচ্ছন্ন। তাই তিনি তাঁর রচিত গানে আক্ষেপ করছেন আর কত কাল 'পৃথিবীবিদেশে' ঘুরবেন!' এই 'সংসার মায়াদর্শন' পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাব-দার্শনিকের দর্শন।[৪৬]

বিজয় সরকার তাঁর শিল্পকর্মে ছিলেন মরমি ভাবের অনুসারী। গোপন মনের ব্যথার প্রকাশ ছিল তাঁর মরমি গানসমূহ। তিনি মনে করতেন বাহ্যিক ভালোর চেয়ে আত্মিক সাধুতাই প্রকৃত মানুষের কাম্য। পার্থিব জ্ঞানবৃদ্ধি দ্বারা অন্যকে সাময়িকভাবে ঠকানো যায়। তাতে অন্তর-মানুষের কাছে পার পাওয়া যায় না। কারণ সেই অন্তর-মানুষ 'শ্রীগুরু স্বরূপ' সমস্ত দুষ্কর্মের সংবাদ রাখেন গোপনে। তাই মরমি সাধকের একমাত্র কাম্য হওয়া দরকার শ্রীগুরুর কৃপা। এই কৃপাপ্রার্থনা ছিল বিজয় সরকারের মরমি ভাবের দ্যোতক :

---

৪২. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ৬৯
৪৩. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ৬৯
৪৪. মহসিন হোসাইন, কবিয়াল বিজয় সরকারের জীবন ও সঙ্গীত (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪), পৃষ্ঠা ১৬
৪৫. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ৬৯
৪৬. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ৭৭

"পরকে ফাঁকি দেওয়া যায় সহজে সাধু ভাই
ঘরকে ফাঁকি দেওয়া বড় দায়।
তোমার কর্মের মর্ম তুমি জানো ন্যায় কিংবা অন্যায় ॥"[৪৭]

বিজয় সরকারের কর্ম ও চিন্তায় ছিল 'তৃণের মতো সহিষ্ণুতা'। তাঁর ব্যক্তিজীবন ও সাধনজীবনে বিনয় ছিল কিংবদন্তিতুল্য। তিনি বিনয়ের সাথে ব্যক্ত করেছেন, তাঁর রচনার মধ্যে যা ব্যক্ত হয়েছে তার সবটুকু সত্য নয়। 'যশের নেশায়' শুধু কল্পনার ফুল ফোটানো হয়েছে। গানে বিজয় যা ব্যক্ত করেছেন তা-ই যদি তাঁর মনের কথা হত তা হলে তিনি পরম সাধক বা 'পরমহংস' হয়ে যেতেন। বিজয় তাঁর ইহলোক ও পরলোকের মঙ্গলের জন্য শুধু সাধু-গুরুরই করুণা কামনা করেছেন। বিজয় সরকারের এই বিনয় হল, গুরুবাদী নিষ্ঠাবান সাধকের চিত্তের ভাষা। এই প্রসঙ্গে বিজয় সরকারের একটি গান উদ্ধৃত করা হল :

"আমার গানের পদ ধরে আমার কেউ বিচার করো না
আমার গানে যা আছে তা প্রাণে খুঁজলে পাবে না ॥"[৪৮]

বিজয় সরকারকে গীতিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে তাঁর একটি বিচ্ছেদী গান। এই গানটি নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতে নানা ধরনের কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। টানা সুরের ভাটিয়ালি ভাবরস মিশ্রণের এই গানটি বিজয় সরকারকে দেশে ও দেশের বাইরে পরিচিতি দান করেছে। একসময় কালিয়া (নড়াইল) থানার মির্জাপুর গ্রামের প্রফুল্ল গোঁসাই পাখিকে প্রতীক করে একটি গান লিখেছিলেন। এই গান থেকে প্রভাবিত হয়ে বিজয় সরকারও পাখির প্রতীকে একটি বিচ্ছেদী গান লিখেন। সেই গানটি হল 'আমার পোষা পাখি উড়ে যাবে সজনি'। গানটিতে আছে চিরন্তন মৃত্যুশোক ও ব্যথাজাগানিয়া স্মৃতিগুলোর কাব্যিক প্রকাশ। এখানে বিজয় সরকারের ঐ বিখ্যাত গানটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল :

"আমার পোষা পাখি উড়ে যাবে সজনি
এক দিন ভাবি নাই মনে
সে কি আমায় ভুলবে কখনো ॥"[৪৯]

কবিয়াল বিজয় সরকারের রাধাবিচ্ছেদ এক অনন্য সৃষ্টি। যুগ যুগ ধরে কবিও গীতিকারেরা কৃষ্ণবিরহে রাধার যে আক্ষেপ উক্তি নির্মাণ করেছেন বিজয় সরকার তাঁদের সবাইকে ছাড়িয়ে গভীর ব্যঞ্জনাময় উক্তিসমূহ রচনা করেছেন। কৃষ্ণের প্রতি রাধারানির আত্মনিবেদনের এমন কবিকল্পনা সত্যিই বিরল। বিজয় সরকারের রচিত রাধাবিচ্ছেদ গান এক যুগান্তর সৃষ্টি। এমন বিরহের গান, এমন বিরহের সুর বিজয় সরকারের দ্বারাই শুধু রচিত হতে পারে বোধ হয়, এমন বিরহের পদ প্রাচীন বৈষ্ণব কবিরাও রচনা করতে সমর্থ হননি। বিজয়ের একটি রাধাবিচ্ছেদীর অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল :

"ললিতা গো বন্ধু বিনা নাহি সদুপায়
পরান বন্ধু বিনা নাহি সদুপায়,
আমি কি করিতে কি যে করি বাঁচি না পরানে মরি
নিরুপায় যে হেরিনু পায় পায় ॥"[৫০]

কবিয়াল বিজয় সরকারের মূলক্ষেত্র ছিল 'কবির লড়াই'। কবিলড়াইতে কবিগানই ছিল প্রাণস্বরূপ। এই কবিগান রচনায়ও বিজয় সরকার বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৭. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ৭৯
৪৮. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ৮১
৪৯. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ৮৫
৫০. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ৮৮

কবিয়ালদের রচনায় অহেতু অনুপ্রাস ও বাহুল্য কথকতার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। কবিয়ালেরা শব্দ প্রয়োগ করতে এমন দিশেহারা হয়ে ওঠেন যে, বাক্য প্রয়োগের উদ্দেশ্যও যেন তাঁরা নির্বিচারে ভুলে যান। কবিয়াল বিজয় সরকার সেখানে ব্যতিক্রমধর্মী সার্থক কবিসংগীত রচনা করে সুধী শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর একটি ভববাণী বিষয়ক গানের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল :

"ওমা ব্রহ্মময়ী তোর ব্রহ্মাণ্ডে ধর্ম ফলে কর্মকাণ্ডে
প্রতি ভাণ্ডে অতি বিস্ময়ের
মানুষ স্বকর্মে করে কসুর স্বভাবের অসুর।
কর্মে মধুর সাজে নারী-নর।"[৫১]

কবিয়াল বিজয় সরকার লৌকিক ধারায় গান রচনা করেছেন। তাঁর রচনায় যেমন গ্রামীণ অতি পরিচিত শব্দ স্থান পেয়েছে– তেমনি স্থান পেয়েছে সংস্কৃত ও সাধু শব্দ। তত্ত্বীয় গান রচনায় তিনি বহু শাস্ত্রীয় শব্দ ও দার্শনিক শব্দ ব্যবহার করে শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিজয় সরকার লোকজ চিন্তা ও ভাব নিয়ে গান রচনা করলেও তাঁর ছিল অধীত জ্ঞান ও শব্দের ভাণ্ডার। বিজয় সেই শব্দসমূহ ব্যবহারে কবি মোহিতলাল মজুমদার ও কবি কাজী নজরুল ইসলামকে অনুসরণ করেছিলেন। মোহিতলাল ও নজরুলের মতোই বিজয় সরকার তাঁর রচনায় আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করে তাঁর রচনায় তাৎপর্যবহ ইমেজ তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

কবিয়াল বিজয় সরকার বিচিত্র সুরের গান রচনা করেছেন। বাউল, কীর্তন, ভজন, গজল, বারাসিয়া, রাখালি সুরেও বিজয় তাঁর গানগুলো রচনা করেছেন। মিশ্র ও অবিমিশ্র রাগেও তাঁর অনেকগুলো গান রচিত। দাদরা, কাহার, ত্রিতাল, একতাল, ঝাঁপতাল, ঝুমুর কাওয়ালি প্রভৃতি তালে গান পরিবেশন করে বিজয় সরকার সংগীতরসিকদের কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন।[৫২]

৫১. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ৮৯
৫২. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার* (ঢাকা : হাতেখড়ি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ৯১

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা কবিগানের ধারায় স্বরূপেন্দু সরকারের ভূমিকা

যাঁরা কবিগান করেন, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে তাঁরা কখনো লোককবি, কখনো চারণকবি, কখনো কবির সরকার, কখনো কবিয়াল, আবার কখনো শুধু 'সরকার' নামেও পরিচিত। বিশ শতকের শেষার্ধ নাগাদ বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে, বিশেষভাবে বৃহত্তর খুলনা, যশোর, ফরিদপুর ও বরিশাল অঞ্চলে কবিগানের যে ধারা সৃষ্টি হয়, অন্যান্য অঞ্চল থেকে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যে তা আলাদা হয়ে ওঠে। কবিগানের অনেক অংশ, যা ষাটের দশকে জনপ্রিয় ছিল, নব্বইয়ের দশক নাগাদ তা জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে এবং কবিগানের অঙ্গ হিসেবে সেগুলোর অনেকটাই ক্রমে পরিত্যক্ত হতে শুরু করে। অন্যান্য কবিয়ালদের মতো স্বরূপেন্দু সরকারও তাই ষাটের দশকে যে ধরনের কবিগান পরিবেশন করেছেন, নব্বইয়ের দশকে পরিবেশিত কবিগান তার থেকে অনেক দিক দিয়ে আলাদা হয়ে ওঠে। সামগ্রিকভাবে স্বরূপেন্দু সরকার-এর পরিবেশনের মধ্য দিয়ে কবিগানের একটি বিশাল পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

কবি পরিচিতি

বিশ শতকের কবিগান যে অভিনব বৈশিষ্ট্য অর্জন করে, তার সর্বশেষ সার্থক প্রতিনিধি স্বরূপেন্দু সরকার ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারি শনিবার বাগেরহাট জেলার চিতলমারী থানার চরবানিয়ারি গ্রামে ঠেটারচর পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কৃষ্ণকান্ত সরকার ওরফে কেষ্ট গোঁসাই এবং মাতার নাম বিনোদিনী দেবী। ছয় ভাই-বোনের মধ্যে স্বরূপেন্দু সরকার সর্বকনিষ্ঠ। এঁদের অনুক্রম যথাক্রমে শরৎচন্দ্র সরকার, হেমন্ত সরকার, সুমন্ত সরকার, যশোদা মণ্ডল, মানদা বিশ্বাস ও স্বরূপেন্দু সরকার। জ্যেষ্ঠভ্রাতা শরৎচন্দ্র যৌবনে অষ্টক দলে গান করতেন এবং মধ্যম ভ্রাতা হেমন্ত সরকার যাত্রাদলে অভিনয় করতেন। মধ্যম ভ্রাতা হেমন্ত সরকার পঞ্চাশের দশকে পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণুপুর পুনর্বাসন কলোনিতে অভিবাসন গ্রহণ করার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মারা যান। স্বরূপেন্দু সরকারের পিতা কৃষ্ণকান্ত সরকার চরবানিয়ারিতে এসে জমি ক্রয় করেন এবং বাড়ি তৈরি করেন। তাঁর পিতা কৃষ্ণকান্ত সরকার ওরফে কেষ্ট গোঁসাই গান গাইতে ও গান রচনা করতে পারতেন। স্বরূপেন্দুর পিতা কৃষ্ণকান্তের আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন বিখ্যাত মতুয়া-সংগীত রচয়িতা এবং কবিয়াল অশ্বিনী গোঁসাই। অশ্বিনী গোঁসাই নিরক্ষর ছিলেন বলে, তাঁর অন্য অনেক শিষ্যের মতো কৃষ্ণকান্তকেও অশ্বিনী গোঁসাইয়ের অনেক গান লিখে রাখতে হয়েছে।[১]

শিক্ষাজীবন

ঠেটারচর পাড়ার স্থানীয় পাঠশালায় স্বরূপেন্দু সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। এখানে দ্বিতীয় শ্রেণি পাস করে এক কিলোমিটার দূরবর্তী উমাজুড়ি নিম্ন প্রাইমারি স্কুলে তিনি ভর্তি হন এবং সেখান থেকে চতুর্থ শ্রেণি উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি ভর্তি হন চরবানিয়ারি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। ১৯৪৬ সালে চরবানিয়ারি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি পাস করে চিতলমারী হাইস্কুলে ভর্তি

১. স্বরোচিষ সরকার, "বাগেরহাটের লোককবি স্বরূপেন্দু সরকারের কবিয়াল-জীবন ও তাঁর গান", *স্থানীয় ইতিহাস পত্রিকা* (রাজশাহী : জুন ২০০৯), পৃষ্ঠা ১৫৩

হয়েছিলেন। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণিতে চিতলমারী হাইস্কুলে পড়াশুনা করেন। ১৯৫০ সালে চিতলমারীর নিকটস্থ কালশিরা নামক গ্রামকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান সরকারের উস্কানিতে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। এই দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে চিতলমারী হাইস্কুলের সহকারী প্রধানশিক্ষক দেবদাস বিশ্বাস নাজিরপুর থানার দীঘিরজান হাইস্কুলে যোগদান করেন। যে কয়জন প্রিয় ছাত্র তখন তাঁর অনুসারী হয়েছিলেন স্বরূপেন্দু সরকার তাঁদের একজন। পরীক্ষার ফর্মফিল-আপ যেহেতু চিতলমারী হাইস্কুল থেকে করা হয়েছিল, তাই ১৯৫১ সালে বাগেরহাট পরীক্ষাকেন্দ্রেই স্বরূপেন্দু সরকারকে এসএসসি পরীক্ষা দিতে হয়। বাড়ি থেকে বাগেরহাট শহরের দূরত্ব বিশ কিলোমিটারের মতো এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা একমাত্র নৌকা। এমনকি পরীক্ষার কয়দিন স্বরূপেন্দু সরকার তাঁর মামা উপেন্দ্রনাথ সরকারকে নিয়ে বাগেরহাট দাড়াটানা নদীতে নৌকায় বসবাস করেছেন। শুধু ভূগোল পরীক্ষাটা বাকি ছিল, মার্চ মাসের (৩রা চৈত্র) এমন একদিন স্বরূপেন্দু সরকারের মাতৃবিয়োগ ঘটে; পরীক্ষা আর দেওয়া হয় না। পরের বছর ১৯৫২ সালে দীঘিরজান স্কুল থেকে পরীক্ষা দেবেন বলে টেস্ট পরীক্ষায় অংশ নেন এবং টেস্ট পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তখনো ভারত-পাকিস্তানে পাসপোর্টের মাধ্যমে যাতায়াত শুরু হয়নি। পাসপোর্ট প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেলে প্রয়োজন হলেও দেশত্যাগ করা সম্ভব হবে না বিবেচনায় কৃষ্ণকান্ত সরকার সপরিবারে দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। এর ফলে এসএসসি পরীক্ষা না দিয়েই স্বরূপেন্দু সরকারকে দেশত্যাগ করে ভারত গমন করতে হয়। ভারত গমনের পূর্বেই পিতা কৃষ্ণকান্তের নির্দেশে বিখ্যাত মতুয়া শশী বানিয়া'র নিকট থেকে স্বরূপেন্দু সরকার মতুয়া ধর্মাদর্শে দীক্ষা গ্রহণ করেন।[২]

কর্মজীবন

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শরৎচন্দ্র সরকার এবং তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের সঙ্গে স্বরূপেন্দু সরকার ১৯৫২ সালে বেনাপোল বর্ডার দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। বনগাঁ মহকুমা অফিসে উদ্বাস্তুদের নাম-ঠিকানা-জাতি-পেশা-শিক্ষা প্রভৃতি বিস্তারিত বিবরণ লিখে রাখা হত এবং পর্যায়ক্রমে ভারতের বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরে পাঠানো হত। এ সময়ে কাটোয়া মহকুমার রামচন্দ্রপুর গ্রামের একটি পরিত্যক্ত সেনানিবাসে কিছু পুরনো দালানকোঠায় এবং কিছু তাঁবুর ব্যবস্থা করে একটি উদ্বাস্তু শিবির স্থাপন করা হয়। কাটোয়া-বর্ধমান রেললাইনের মাঝামাঝি, কাটোয়া থেকে আট-দশ মাইল দূরের কোনো একটি স্টেশনের পাশেই ছিল এই রামচন্দ্রপুর উদ্বাস্তু শিবির। শরৎচন্দ্র সরকারের পরিবার এই রামচন্দ্রপুর উদ্বাস্তু শিবিরে স্থান পায়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শরৎচন্দ্রের পরিবারের সঙ্গে স্বরূপেন্দু সরকারও এখানে অবস্থান করতে থাকেন।

রামচন্দ্রপুর উদ্বাস্তু শিবিরে থাকার সময়ে স্বরূপেন্দু সরকার সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য বর্ধমানের আসানসোল মহকুমার রিক্রুটিং ক্যাম্পে গিয়ে লাইনে দাঁড়ান। সব ধরনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরে স্বরূপেন্দু সরকারকে মহীশূর প্রদেশের বাঙ্গালোর ট্রেনিং ক্যাম্পে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। স্বরূপেন্দু সরকার অতঃপর রামচন্দ্রপুর থেকে হাওড়া স্টেশন হয়ে বাঙ্গালোরের উদ্দেশে যাত্রা করেন। ট্রেনে বসে দীপক নামের একজন সেনাসদস্যের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় স্বরূপেন্দু সরকার অনেকটা নিশ্চিন্তভাবে বাঙ্গালোরে পৌঁছতে পেরেছিলেন। স্বরূপেন্দু সরকারকে মাদ্রাজে একদিন অবস্থান করতে হয়, কেননা ট্রেন ছিল পরের দিন দুপুরের দিকে। বাঙ্গালোরের ট্রেনে ওঠার আগে সকালে মাদ্রাজ-সাগরে স্নান করতে গিয়ে স্বরূপেন্দু সরকার জীবনে প্রথমবার সমুদ্রদর্শন করেন এবং সমুদ্রের সৌন্দর্যে তিনি বিমোহিত হন।

বাঙ্গালোরে ট্রেনিংকাল ছিল মোট ছয় মাস। পদের নাম ছিল এমটি ড্রাইভার। কিন্তু এই ছয় মাসে সকল কোরেরই ট্রেনিং ছিল প্রায় একরকম। এই ট্রেনিংকালের মধ্যে ফুটবল খেলায় স্বরূপেন্দু সরকারের বিশেষ ক্ষমতা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এক পর্যায়ে বাঙ্গালোর থেকে

২. বর্তমান গবেষক কর্তৃক গৃহীত স্বরূপেন্দু সরকারের পুত্র ড. স্বরোচিষ সরকারের সাক্ষাৎকার।

স্বরূপেন্দু সরকারকে বোলারুম সেনানিবাসে পাঠানো হয় পরবর্তী ট্রেনিংয়ের জন্য। এখানে বাস করতে হত তাঁবুতে এবং একসঙ্গে দু-তিনজন করে রাত জেগে সশস্ত্র ডিউটি করতে হত। নতুন এই পরিবেশ স্বরূপেন্দু সরকারের নিকট অসহ্য মনে হয়। কিভাবে এই চাকরি থেকে নিজেকে বের করে নিয়ে আসবেন, সে কথাই তিনি সবসময়ে ভাবতে থাকেন। একজন সহৃদয় ও ঘনিষ্ঠ সেনা-কর্মকর্তার নিকটে তিনি তাঁর চাকরি থেকে অব্যাহতি পাওয়ার ব্যাপারে সহায়তা প্রার্থনা করেন। উক্ত সেনা-কর্মকর্তার পরামর্শমতো স্বরূপেন্দু সরকার নিয়মিতভাবে পাগলামি করতে শুরু করেন এবং এক পর্যায়ে ডাক্তারের নিকট থেকে মানসিক প্রতিবন্ধীর সনদ অর্জন করতে সক্ষম হন। এভাবেই স্বরূপেন্দু সরকারের সেনাজীবনের অবসান ঘটে।

চাকরি থেকে অব্যাহতি নিয়ে স্বরূপেন্দু সরকার তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শরৎচন্দ্র সরকারের নিকটে ফিরে আসেন। স্বরূপেন্দু সরকারের চাকরি গ্রহণ এবং অব্যাহতি-লাভ– এই সময়ের মধ্যে শরৎচন্দ্র সরকারের আবাসিকতারও পরিবর্তন ঘটে। রামচন্দ্রপুর ক্যাম্প থেকে তাঁকে চলে আসতে হয় কাটোয়ার উপকণ্ঠে ফরিদপুর কলোনি নামক স্থানে। এ সময় শরৎচন্দ্রের সংসারে বিভিন্ন অভাব-অনটন দেখা দেয়। এমন সময় জ্যেষ্ঠের নিকটে কনিষ্ঠের আশ্রয় প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত হয় এবং স্বরূপেন্দু সরকার মনের দুঃখে পূর্ববঙ্গে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৩]

১৯৫৪ সালের জানুয়ারি মাসে স্বরূপেন্দু সরকার পূর্ববঙ্গে ফিরে আসেন। বাড়িতে তখন বাস করছিলেন মধ্যম ভ্রাতা হেমন্তকুমার এবং তৃতীয় ভ্রাতা সুমন্তকুমার। এ সময়ে সতীশ মণ্ডল নামে কবিগানের একজন বিখ্যাত দোহার, যিনি নিশিকান্ত সরকারের দলে গান করতেন, তাঁর সঙ্গে এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হরষিত মণ্ডলের সঙ্গে স্বরূপেন্দু সরকার বেশ ঘনিষ্ঠ হন। পূর্ব থেকেই, বিশেষভাবে মতুয়া ধর্মাদর্শে বিশ্বাসের সূত্রে সতীশ মণ্ডলের পরিবারের সঙ্গে স্বরূপেন্দু সরকারের পরিবারের যথেষ্ট আন্তরিক সম্পর্ক ও যাতায়াত ছিল। তাছাড়া সতীশচন্দ্র মণ্ডলের জ্যেঠাতো ভাই আদুরাম মণ্ডল ছিলেন স্বরূপেন্দু সরকারের পিতা কৃষ্ণকান্ত সরকারের একজন নিকটতম বন্ধু। স্বরূপেন্দু সরকার সেই সূত্রে সতীশ মণ্ডলকে কাকা বলে ডাকতেন। সতীশচন্দ্র মণ্ডলের পিতা রাধাকান্ত মণ্ডলও একজন খ্যাতিমান দোহার ছিলেন, যিনি কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারের কবিগানের দলে কাজ করতেন। সতীশ মণ্ডল, হরষিত মণ্ডল ব্যতীত মনীন্দ্রনাথ করাতির সঙ্গেও এ সময়ে স্বরূপেন্দু সরকারের ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়। বানিয়ারি গ্রামের রাজেন ঠেঁটার দলে 'নিমাইসন্ন্যাস পালা'য় হরষিত মণ্ডল এবং মনীন্দ্র করাতি চমৎকার অভিনয় ও গান করতেন। এই পালাগানে হরষিত মণ্ডল নিমাইয়ের ভূমিকায় এবং মনীন্দ্র করাতি বিষ্ণুপ্রিয়ার ভূমিকায় গান ও অভিনয় করতেন, যা স্বরূপেন্দু সরকারকে মুগ্ধ করত। ভারত থেকে ফিরে এসে স্বরূপেন্দু সরকার এই দলের সঙ্গে কয়েক দিন ঘোরাঘুরি করেন।

স্বরূপেন্দু সরকারের বিয়ের জন্য মধ্যম ভ্রাতা চেষ্টা করতে থাকেন। ঐ বছর অক্টোবর মাসের কোনো একদিন স্বরূপেন্দু সরকারের পিতা কৃষ্ণকান্ত সরকারের নিকটে সতীশ মণ্ডল তাঁর এক কিশোরী আত্মীয়াকে স্বরূপেন্দু সরকারের জন্য প্রস্তাব করেন। পাত্রীর নাম নীলিমা মণ্ডল। কৃষ্ণকান্ত সরকার তাঁর অন্যতম ভগিনীপতি সতীশ বিশ্বাস এবং সতীশ মণ্ডলকে নিয়ে সিংখালী গ্রামে গিয়ে পিতৃহীন কন্যাটিকে দেখে আসেন এবং আশীর্বাদ করে আসেন। ১৯৫৪ সালের ১৫ নভেম্বর বুধবার স্বরূপেন্দু সরকার ও নীলিমা দেবীর বিয়ে হয়।

১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে নীলিমার মাতা হেমাঙ্গিনী মণ্ডল ও তাঁর দুই কিশোর পুত্রকে নিয়ে চরবানিয়ারি চলে আসেন এবং কয়েকদিন অবস্থান করেন। হেমাঙ্গিনীর উদ্দেশ্য ছিল তিন পুত্রকন্যাকে নিয়ে ভারতে অভিবাসন গ্রহণ। তখনকার নিয়ম অনুযায়ী ভারতে স্থায়ীভাবে যেতে চাইলে সরকারি অফিস থেকে মাইগ্রেশন নামাঙ্কিত একটি কাগজের প্রয়োজন হত। কৃষ্ণকান্ত সরকার, তাঁর দুই পুত্র ও পরিবারের সকল সদস্য এই কাগজ সংগ্রহ করেছিলেন। হেমাঙ্গিনী মণ্ডল এবং তাঁর তিন সন্তানের

৩. বর্তমান গবেষক কর্তৃক গৃহীত স্বরূপেন্দু সরকারের পুত্র ড. স্বরোচিষ সরকারের সাক্ষাৎকার।

জন্যও এই কাগজ ছিল। শুধু স্বরূপেন্দু সরকারেরই এই মাইগ্রেশন কাগজ ছিল না। ফলে বনগাঁ সীমান্তে স্বরূপেন্দু সরকারকে পুলিশের হাতে ধরা পড়তে হয়। শাশুড়ি হেমাঙ্গিনী এ সময়ে পুলিশকে কিছু উৎকোচ দিয়ে স্বরূপেন্দুকে পুলিশের হাত থেকে ছাড়িয়ে আনতে সক্ষম হন।[৪]

সকলের গন্তব্য তখন একমাত্র শিয়ালদহ স্টেশন। সেখান থেকে হেমন্ত এবং সুমন্ত তাঁদের স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে পুনর্বাসনের ডাক পান। কৃষ্ণকান্ত সরকার চলে যান তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শরৎচন্দ্রের নিকটে। বিপদে পড়েন হেমাঙ্গিনী, তাঁর যদি শুধু দুই অনাথ শিশুপুত্র থাকত তাহলে সরকার নির্ধারিত অনাথ-আশ্রমে একটা ব্যবস্থা হয়ে যেত। কিন্তু বিবাহিতা কন্যাকে সেখানে রাখা সম্ভব ছিল না। এমতাবস্থায় এক পর্যায়ে তিনি বহরমপুরে অবস্থিত এক ভাইয়ের নিকটে মেয়েকে পাঠিয়ে দেন এবং স্বরূপেন্দু গিয়ে ওঠেন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শরৎচন্দ্রের কাটোয়ার কলোনিতে। সেখানে শরৎচন্দ্র ছাড়া স্বরূপেন্দু সরকারের আর একজন ভগ্নিপতিও বাস করতেন।

প্রায় দুই মাস বিচ্ছিন্ন থাকার পরে এক পর্যায়ে স্বরূপেন্দু তাঁর স্ত্রী নীলিমাকে কাটোয়ায় তাঁর ভগিনীপতির বাসায় নিয়ে তোলেন। এখানে কিছুদিন থাকার পরে স্বরূপেন্দু সরকারকে সস্ত্রীক চলে যেতে হয় মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার নৃসিংহপুর এলাকায় ঘনশ্যামপুর গ্রামের অদূরে ময়ূরাক্ষী নদীর তীরবর্তী একটি অনুর্বর ও অনাবাদি এলাকায়। স্বল্পমূল্যে জমি কিনতে পাওয়ার জন্য উদ্বাস্তুদের নিজস্ব চেষ্টায় এখানে একটি উদ্বাস্তু শিবির গড়ে ওঠে। স্বরূপেন্দু সরকারের পিতা কৃষ্ণকান্ত সরকার ওরফে কেষ্ট গোঁসাইয়ের অন্যতম শিষ্য গোপালগঞ্জ নিবাসী উপেন্দ্রনাথ মিস্ত্রি সেখানে একটি বাড়ি তৈরি করেছিলেন। স্বরূপেন্দু সরকারের পিতা কৃষ্ণকান্ত সরকারও সেখানে কিছু জমি খরিদ করেন। উপেন্দ্রনাথ মিস্ত্রির সংসার ছিল মোট তিন জনের– তিনি ছাড়া তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর একটি কন্যা। সস্ত্রীক স্বরূপেন্দু সরকার একদিন এইখানে এসে উপস্থিত হন এবং উক্ত পরিবারের সদস্য হয়ে যান। উপেন্দ্রনাথের স্ত্রীর সঙ্গে নীলিমা ঢেঁকিতে চিড়া কুটতেন। সেই চিড়া গ্রামে গ্রামে ফেরি করে চিড়ার বদলে ধান নিয়ে বাড়িতে ফিরতেন স্বরূপেন্দু। এক পর্যায়ে উপেন্দ্রনাথ অন্য এক পুনর্বাসন এলাকায় চলে গেলে পুরো বাড়ির মালিক হন সস্ত্রীক স্বরূপেন্দু সরকার।[৫]

১৯৫৫ সালের জুলাই পর্যন্ত এখানে বেশ ভালোই কাটছিল। বাড়ির সামনে শাক-সবজিও ফলতে শুরু করেছিল। কিন্তু আগস্ট মাসের দিকে হঠাৎ প্রলয়ঙ্করী বন্যা দেখা দেওয়ায় এবং সরকারিভাবে ঐ এলাকার সব মানুষকে সরে যেতে বলার ঘোষণায় কয়েক মাসের সুখের সংসারে ছেদ পড়ে। বন্যা ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেখানে বুক সমান জল হয়ে যায়। অনেক কষ্টে নিকটবর্তী বেলতলার উঁচু জায়গায় গিয়ে উঠলেও অল্প সময়ের ব্যবধানে শ্যামপুর ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে বেহুলা ঘাটের নিকটে একটি স্কুলঘরে বন্যাদুর্গতদের আশ্রয় হয়। এখানে অবস্থানকালে স্বরূপেন্দু সরকারকে একদিন সাপে কাটে। সাপটির বিষ ততো মারাত্মক না হওয়ায় উদ্বাস্তু এক ওঝার চিকিৎসাতেই অল্পকালের মধ্যে স্বরূপেন্দু সরকার সুস্থ হয়ে ওঠেন। এই বন্যা-পুনর্বাসন কেন্দ্রে কয়েক দিন থাকার পরে স্বরূপেন্দু সরকার তাঁর স্ত্রীর মামার নিকটে স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেন এবং নিজে কাটোয়ায় তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকটে গিয়ে কোনো একটা রোজগারের চেষ্টা করতে থাকতেন।

এই সময়ে উদ্বাস্তুদের ছবি তোলার হিড়িক পড়ে যায়। এ সময় কাটোয়া থেকে প্রতিদিন ৮/১০ কিলোমিটার সাইকেলে বনকাপাশি গ্রামে গিয়ে স্বরূপেন্দু সরকার ছবি তুলতেন, রাতে বাসায় ফিরে নিজেই ফিল্ম ওয়াশ করা ও ছবি প্রিন্ট করার কাজ করতেন। এভাবে যেদিন তিনি যাদের ছবি তুলতেন পরের দিনই বনকাপাশি গিয়ে তাদের ছবি সরবরাহ করতে পারতেন। কাটোয়ায় বেকার থাকা অবস্থায় শখের বশে তিনি এসব কাজ শিখেছিলেন। এই কাজের মাধ্যমে অল্প দিনের মধ্যেই স্বরূপেন্দু সরকারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়। ১৯৫৬ সালের প্রথমদিকে বহরমপুর গিয়ে স্ত্রীকে কাটোয়ায়

৪. বর্তমান গবেষক কর্তৃক গৃহীত স্বরূপেন্দু সরকারের পুত্র ড. স্বরোচিষ সরকারের সাক্ষাৎকার।

৫. বর্তমান গবেষক কর্তৃক গৃহীত স্বরূপেন্দু সরকারের পুত্র ড. স্বরোচিষ সরকারের সাক্ষাৎকার।

নিয়ে আসেন এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতার টিনশেড বিল্ডিংয়ের এক পাশে একটি বারান্দা তৈরি করে, সেখানে বসবাস করতে শুরু করেন। এই সচ্ছলতার দিনগুলোতে অবসর সময়ে গান শোনার জন্য স্বরূপেন্দু সরকার একটি গ্রামোফোন রেকর্ডার কেনেন।[৬]

স্বরূপেন্দু সরকারের চার সন্তান। প্রথম সন্তান ভবানী পোদ্দার ভক্তিমুকুল, ভক্তি অধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী এবং কাব্যতীর্থ। ভাগবতপাঠক হিসেবে বাংলাদেশে তিনি সুপরিচিত। অপর পুত্র ডক্টর স্বরোচিষ সরকার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজের প্রফেসর। মধ্যম পুত্র সব্যসাচী সরকার বাহির দশবহল বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক। অকালপ্রয়াত (মৃত্যু ৩১ জানুয়ারি ২০১৩) কনিষ্ঠ পুত্র ডক্টর স্বয়ম্ভু সরকার বরিশাল অমৃতলাল দে মহাবিদ্যালয়ে সমাজকর্ম বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। মারা যাওয়ার আগে বাংলাদেশের গণসংগীতের ওপরে গবেষণার জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। স্বরূপেন্দু সরকার ও নীলিমা সরকার দম্পতির পৌত্র চার জন, পৌত্রী দুই জন, দৌহিত্র এক জন এবং দৌহিত্রী দুই জন।[৭]

কবিগান শিক্ষা

ছবি তোলার ব্যবসা চলতে থাকার এক পর্যায়ে কবিগান শেখার উদ্দেশ্যে বর্ধমান শহরে বসবাসরত চারণকবি নকুলেশ্বর দত্তের নিকটে যান। বর্ধমান শহরে নকুলেশ্বর দত্তের একটি ভাড়া বাসা ছিল, সেখানে তিনি স্ত্রী ও পুত্র নিয়ে বসবাস করতেন। স্বরূপেন্দু সরকার বর্ধমানে তাঁর সঙ্গে দেখা করে কবিগান শেখার আগ্রহের কথা জানালে নকুলেশ্বর দত্ত স্বরূপেন্দু সরকারকে নিয়ে কোলকাতার বিডন স্ট্রিট পতিতালয়ে কিরণবালার বাসায় গিয়ে ওঠেন। এখানে অবস্থান করার সময়ে নকুলেশ্বর দত্ত দুর্গাপূজার বায়না অনুসন্ধানের কাজ করতে থাকেন। কিরণবালার বাসাটি বেশ প্রশস্ত ছিল, সেখানে নকুলেশ্বর দত্ত এবং স্বরূপেন্দু সরকারের থাকতে বিশেষ কোনো অসুবিধা হচ্ছিল না। কিরণবালার বাসায় দশ-বারো দিন অবস্থান করেও কোনো বায়না না পাওয়ায় স্বরূপেন্দু সরকার কাটোয়ায় ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। যাত্রা করার পূর্বে স্বরূপেন্দু সরকার যখন নকুলেশ্বর দত্তকে প্রণাম করছিলেন, তখন তিনি মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। সেই অবস্থায় তিনি স্বরূপেন্দু সরকারের মাথায় হাত দিয়ে অত্যন্ত গম্ভীর ও সংস্কৃতবহুল বাক্যে অনেক আশীর্বাদ করেন। আশীর্বাদছলে তিনি বলেন, তুমি একজন শ্রেষ্ঠ চারণকবি হতে পারবে, তোমার সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই দশ-বারো দিন অবস্থানকালে নকুল দত্ত তাঁর বিভিন্ন কবিগানের আসরের গল্প এবং কিভাবে গাইতে হয়, সে ব্যাপারে অনেক আলোচনা স্বরূপেন্দু সরকারের সঙ্গে করেছেন। কিন্তু ঐ বছর লক্ষ্মীপূজা পর্যন্ত কোনো গানের বায়না না হওয়ায় স্বরূপেন্দু সরকারকে সরাসরি হাতে ধরে কবিগান শেখানো নকুল দত্তের পক্ষে সম্ভব হয় না। স্বরূপেন্দু সরকারও কবিগান শেখার ব্যাপারে অনেকটা হতাশ হয়ে পড়েন।[৮]

এ সময়ে পূর্ববঙ্গ থেকে অভিবাসিত বেশ কয়েকজন কবিয়াল কাটোয়া অঞ্চলে বসবাস করতেন এবং মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে দু-একটি কবিগানের আসর বসত। এইসব আসরে যাঁরা কবিগান গাইতেন, তাঁদের মধ্যে যজ্ঞেশ্বর সরকার, মনীন্দ্র চক্রবর্তী (গোস্বামী) প্রমুখ ছিলেন প্রধান। স্বরূপেন্দু সরকার অনেকটা অযাচিতভাবে ঐসব আসরে গিয়ে উপস্থিত হতেন এবং অনেক আসরে পাঁচালি করার সুযোগ পেতেন। কাটোয়ার নিকটবর্তী অগ্রদ্বীপ, দাইহাট, একাইহাট, বিকাইহাট প্রভৃতি তেরো-চৌদ্দটি গ্রামে তখন পূর্ববঙ্গ থেকে আগত লোকের সংখ্যা বেশি ছিল এবং এরাই ছিল এইসব কবিগানের প্রধান শ্রোতা।

---

৬. বর্তমান গবেষক কর্তৃক গৃহীত স্বরূপেন্দু সরকারের পুত্র ড. স্বরোচিষ সরকারের সাক্ষাৎকার।

৭. বর্তমান গবেষক কর্তৃক গৃহীত স্বরূপেন্দু সরকারের পুত্র ড. স্বরোচিষ সরকারের সাক্ষাৎকার।

৮. স্বরোচিষ সরকার "বাগেরহাটের লোককবি স্বরূপেন্দু সরকারের কবিয়াল-জীবন ও তাঁর গান", *স্থানীয় ইতিহাস পত্রিকা* (রাজশাহী : জুন ২০০৯), পৃষ্ঠা ১৫৪

যজ্ঞেশ্বর বা মনীন্দ্রনাথের বিপক্ষে স্বরূপেন্দু সরকার তখন যে দু-এক পালাগান করার সুযোগ পেয়েছেন, তা ছিল প্রধানত ধুয়া এবং পাঁচালি। এঁদের সঙ্গে গান গাইতে গিয়ে স্বরূপেন্দু সরকারের মনে ভালোভাবে গান শেখার বাসনা জাগে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫৭ সালে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের দিকে বনগাঁয় গিয়ে রাজেন্দ্রনাথ সরকারের অনুসন্ধান করতে থাকেন। উদ্দেশ্য রাজেন্দ্রনাথ সরকারের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ভালোভাবে কবিগান শেখা। শুনতে পেয়েছিলেন, রাজেন্দ্রনাথ সরকার তখন বনগাঁয় বসবাস করছেন। বনগাঁর একটি পুনর্বাসন কেন্দ্রে তখন স্বরূপেন্দু সরকারের তৃতীয় ভ্রাতা সুমন্ত সরকার সপরিবারে বসবাস করতেন। এক দিন বনগাঁ রেলস্টেশনে রাজেন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে স্বরূপেন্দু সরকারের দেখা হয়। স্বরূপেন্দু সরকার দেখতে পান বিশালদেহী এক পুরুষ, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা অবস্থায় স্টেশনে হাঁটাহাঁটি করছেন। স্বরূপেন্দু সরকার প্রথমে তাঁর কাছে যান, ভক্তিভরে প্রণাম করেন এবং অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বিশালদেহী পুরুষটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। জবাবে রাজেন্দ্রনাথ সরকার বলেন, "আমরে কি চেনবা? আমার নাম রাজিন্দির সরকার"।

স্বরূপেন্দু সরকার রাজেন্দ্রনাথ সরকারকে তাঁর সেজ ভ্রাতার বাসায় নিয়ে আতিথেয়তার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তিনি সেদিন যেতে পারবেন না বলেন, কারণ সেদিন তাঁর এবং তাঁর সঙ্গিনী প্রিয়বালার অন্যত্র নিমন্ত্রণ ছিল। পরের দিন রাজেন্দ্রনাথ সরকার তাঁর সঙ্গিনী প্রিয়বালাকে নিয়ে সুমন্ত সরকারের বাড়িতে আসেন। রাজেন্দ্রনাথ সরকার সেখানে বেশ কয়েকদিন অবস্থান করেন। এ সময়ে স্বরূপেন্দু সরকার রাজেন্দ্রনাথ সরকারের নিকট তাঁর আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করেন। জবাবে রাজেন্দ্রনাথ সরকার প্রথমে স্বরূপেন্দু সরকারকে খানিকটা হতাশ করে বলেন, এখন তিনি কোনো ছাত্র করতে চান না; তবে আগ্রহ অব্যাহত থাকলে পরে তিনি বিবেচনা করতে পারেন বলে কিছুটা আশার বাণীও শোনান।[৯]

১৯৫৮ সালে দুর্গাপূজার সময়ে স্বরূপেন্দু সরকার শুনতে পান যে, সামনের কালীপূজায় নাজিরপুর থানার দীর্ঘা গ্রামে বীরেশ্বর হালদারের বাড়িতে কবিগান। তখন বীরেশ্বর হালদার প্রয়াত। কবিগান করবেন রাজেন্দ্রনাথ সরকার এবং নন্দলাল সরকার। স্বরূপেন্দু সরকার যথাসময়ে দীর্ঘা গিয়ে উপস্থিত হন। বীরেশ্বর হালদারের বাড়িতে রাজেন্দ্রনাথ সরকার যখন বিশ্রাম করছিলেন, তখন এক সুযোগে স্বরূপেন্দু সরকার তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণের প্রস্তাব করেন। রাজেন্দ্রনাথ সরকার তখন জিজ্ঞাসা করেন, স্বরূপেন্দু সরকার বিয়ে করেছেন কিনা এবং সন্তানাদির জনক হয়েছেন কিনা। স্বরূপেন্দু যখন জানান যে তাঁর স্ত্রী এবং এক কন্যাসন্তান রয়েছে, তখন রাজেন্দ্রনাথ বলেন, 'বিয়ের আগে পুরুষের থাকে ১৬ আনা শক্তি, বিয়ে করলে থাকে ৮ আনা শক্তি, আর সন্তানাদি হলে থাকে মাত্র ২ আনা শক্তি; এই শক্তি নিয়ে কবিগান শেখা যায় না।' এভাবে হতাশ করার এক পর্যায়ে রাজেন্দ্রনাথ সরকারের বিশ্বস্ত সহযোগী অক্ষয় ঢুলি অনেকটা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে স্বরূপেন্দু সরকারের পক্ষে রাজেন্দ্রনাথ সরকারকে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে রাজেন্দ্রনাথ সরকার স্বরূপেন্দু সরকারকে এক শর্তে শিষ্য করতে রাজি হন, তা হল তিন বছর স্ত্রী-সহবাস থেকে বিরত থাকতে হবে এবং তিন মাসের মধ্যে গীতা মুখস্থ করতে হবে। এই সময়ে দলের অন্যতম সংগীত সহযোগী এবং হারমোনিয়াম বাদক শশধর মাস্টার স্বয়ং রাজেন্দ্রনাথ সরকারের চরিত্র নিয়ে কটাক্ষ করে কথা বলেন। এতে রাজেন্দ্রনাথ সরকার এবং শশধর মাস্টারের মধ্যে কিছুক্ষণ কথা-কাটাকাটি হয়। এই কথা-কাটাকাটির পরে রাজেন্দ্রনাথ সরকার তাঁর প্রথম শর্ত শিথিল করেন এবং স্বরূপেন্দু সরকারকে আপাতত শিষ্য করে নেওয়ার বিষয়টি স্থির হয়ে যায়।

রাত রারোটায় গান শুরু হয়। পাঁচালি শুরু হতে হতে সকাল হয়ে যায়। রাজেন্দ্রনাথ সরকার এবং নন্দ সরকারের দুই আসর শেষ হতে না হতেই রাজেন্দ্রনাথ সরকার স্বরূপেন্দু সরকারকে নির্দেশ দেন, 'ওঠ, পাঁচালি ক'। পাঁচালির শুরুতে ধুয়া গাইতে তাল বিষয়ক সংকোচের কথা জানিয়ে অপারগতার প্রশ্ন তুলতে, অক্ষয় ঢুলি মেজাজের সঙ্গে বললেন, 'তুই এতো বড়ো কী ওস্তাদ হইছিস যে আমি

৯. স্বরোচিষ সরকার "বাগেরহাটের লোককবি স্বরূপেন্দু সরকারের কবিয়াল-জীবন ও তাঁর গান", *স্থানীয় ইতিহাস পত্রিকা* (রাজশাহী : জুন ২০০৯), পৃষ্ঠা ১৫৫

অক্ষয় ঢুলি জীবিত থাকতে তুই বেতালে গাবি?' ঢুলি সাহস দেওয়ায় 'পার ঘাটাতে তুমি পারের নাইয়া, আমার দিন কি এমনি যাবে বইয়া' ধুয়া দিয়ে স্বরূপেন্দু সরকার নন্দ সরকারের বিপক্ষে অনেকক্ষণ পাঁচালি করার সুযোগ পান।

পরের দিন গান ছিল সিংগাতি লঞ্চঘাট থেকে তিন-চার কিলোমিটার দূরে কুশলিরচর গ্রামে রামবাবুর বাড়ি। যেতে হবে দীর্ঘা স্টেশন থেকে লঞ্চে প্রথমে সিংগাতি স্টেশন, পরে সেখান থেকে পায়ে হেঁটে কুশলিরচর। সেখানে রাজেন্দ্রনাথ সরকারের বিপক্ষে গান গাওয়ার কথা অনাদিজ্ঞান সরকারের। দীর্ঘা বাজারের নিকটে নিকুঞ্জ হালদারের বাড়ির সামনে এসে রাজেন্দ্রনাথ সরকার তাঁর সঙ্গিনী প্রিয়বালার মোট কাঁধে নেওয়ার জন্য স্বরূপেন্দু সরকারকে নির্দেশ দেন। এই ধরনের নির্দেশে স্বরূপেন্দু সরকার নিজেকে অপমানিত বোধ করেন এবং মোট বইতে অস্বীকৃতি জানান। স্বরূপেন্দু সরকারের বক্তব্যের সারমর্ম ছিল, তিনি তাঁর গুরুর এমনকি গুরুপত্নীর সব ধরনের নির্দেশ মানতে বাধ্য, কিন্তু প্রিয়বালা দেবী যেহেতু সামাজিকভাবে গুরুপত্নী নন, তাই তার মোট বইতে তিনি বাধ্য নন। স্বরূপেন্দু সরকারের এই ধরনের কথায় রাজেন্দ্রনাথ সরকার স্বরূপেন্দু সরকারকে মারতে আসেন, স্বরূপেন্দু সরকারও তাঁর দিকে তেড়ে আসতে শুরু করেন। শশধর মাস্টার এবং অক্ষয় ঢুলির মধ্যস্থতায় দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। অতঃপর স্বরূপেন্দু সরকার সিদ্ধান্ত নেন যে, তিনি আর রাজেন্দ্রনাথের কাছে কবিগান শিখবেন না। এই ভেবে দীর্ঘা খেয়ায় উঠে বাড়ির দিকে রওনা হচ্ছিলেন। ঠিক এই সময়ে লঞ্চ এসে গিয়েছিল। লঞ্চ থেমে আছে, খেয়াও ছাড়ছে না, এমন এক মুহূর্তে লঞ্চের উপরে উঠে রাজেন্দ্রনাথ সরকার স্বরূপেন্দু সরকারকে ডাকতে শুরু করলেন, 'স্বরূপ বাবা, আয়, চলে যাস না'। দ্বন্দ্ব ভুলে গিয়ে স্বরূপেন্দু সরকার লঞ্চে গিয়ে ওঠেন। লঞ্চে ওঠামাত্র রাজেন্দ্রনাথ সরকার একটা গানের খাতা বের করে স্বরূপেন্দু সরকারকে দেন, যাতে তিনটি ডাক গান, তিনটি মালশি গান, তিনটি সখীসংবাদ এবং তিনটি কবিগান ছিল। রাজেন্দ্রনাথ সরকার বলেন, 'সিংগাতি স্টেশনে নামার আগে এই গানগুলো তুই মুখস্থ করে দিবি, তা না হলে তোর উপায় নাই।' অলৌকিকভাবে মাত্র দুই ঘণ্টার মধ্যে স্বরূপেন্দু সরকার সেদিন গানগুলো মুখস্থ করে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন।[১০]

কুশলিরচর গানের আসরে বসে রাজেন্দ্রনাথ সরকার যখন টপ্পার জবাব রচনা করে দোহারদের দিয়ে পরিবেশন করছিলেন, স্বরূপেন্দু সরকার তখন সেই টপ্পাগুলো লিখে রাখার চেষ্টা করছিলেন। এতে প্রচণ্ড রেগে গিয়ে রাজেন্দ্রনাথ সরকার তাঁর হাতে থাকা কাঁসির লাঠি দিয়ে স্বরূপেন্দু সরকারের মাথায় জোরে আঘাত করেন এবং বলেন, 'লেইখে শিখতি আইছো? শুনে শুনে মনে রাখতে পারো না?' পরের দিন রাজেন্দ্রনাথ সরকারের অন্যত্র গান ছিল। কিন্তু স্বরূপেন্দু সরকার আর রাজেন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে থাকতে চাইলেন না। সঙ্গী পেলেন অন্যতম খ্যাতিমান দোহার সতীশ শীল। দুজনে কুশলিরচর থেকে পায়ে হেঁটে যাঁর যাঁর বাড়ি চলে যান।

১৯৫৯ সালের প্রথম দিকে পিরোজপুর থানার জুজখোলা গ্রামে একটি কবির আসর বসে। স্থানীয় চেয়ারম্যান সুলতান মিয়া ছিলেন ঐ গানের উদ্যোক্তা। নাজিরপুর থানার কাঁঠালিয়া গ্রামের দ্বিজবর সরকার গানের বায়না আনতে গেলে স্থানীয় লোকজন নতুন কোনো সরকারের সঙ্গে রাজেন্দ্রনাথ সরকারের কবিগান শুনতে তাঁদের আগ্রহ প্রকাশ করেন। এমন পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিজবর সরকার নতুন সরকার হিসেবে স্বরূপেন্দু সরকারের নাম করেন। পূর্বেই স্বরূপেন্দু সরকারের সঙ্গে দ্বিজবর সরকারের এমন একটি চুক্তি হয়েছিল, যাতে শর্ত ছিল রাজেন্দ্রনাথ সরকারের বিপক্ষের সরকার হিসেবে স্বরূপেন্দু সরকারের নাম করা হবে, কিন্তু গানের বায়না থেকে পাওয়া কোনো টাকা স্বরূপেন্দু সরকার পাবেন না। নিয়ম অনুযায়ী রাত বারোটার পরে গান শুরু হল। এক পক্ষে রাজেন্দ্রনাথ সরকার এবং অন্যপক্ষে দ্বিজবর সরকার ও স্বরূপেন্দু সরকারের কবিগানের প্রতিযোগিতা চলল। ঠিক হল, দ্বিজবর সরকার ডাক, মালশি ও সখীসংবাদ পরিবেশন করবেন, অন্যদিকে স্বরূপেন্দু সরকার গাইবেন কবি, টপ্পা, ধুয়া-পাঁচালি ইত্যাদি। ভোররাতের দিকে শুরু হল কবি। স্বরূপেন্দু সরকার রাজেন্দ্রনাথ

১০. বর্তমান গবেষক কর্তৃক গৃহীত স্বরূপেন্দু সরকারের পুত্র ড. স্বরোচিষ সরকারের সাক্ষাৎকার।

সরকারের নিকটে এ বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে তিনি বললেন 'মহতের কোনো কবি গা, আমারই কোনো একটা গাইতে পারিস।' স্বরূপেন্দু সরকার বললেন, "আমি নিজে একটা কবি রচনা করেছি, নাম দিয়েছি 'শিক্ষিত ঘরজামাইয়ের কবি'–এটা গাইতে চাই।" শেষ পর্যন্ত রাজেন্দ্রনাথ সরকারের মতের বিপক্ষে এমনকি দোহারদের অনেকেরই অনিচ্ছার মধ্যে স্বরূপেন্দু সরকার তাঁর 'কবি' পরিবেশন করলেন। এই 'কবি'-র প্রথম দুই লাইন ছিল এ রকম :

"হয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মা বাবা প্রায় উপেক্ষিত,
শিক্ষার আর মূল্য রইলো কই
কেউ বা মূর্খ পিতার চায় না দিতে সত্য পরিচয়,
দেখে মনে হয় বাবা ঠিক তালই।"[১১]

গানটি তিনি আগেই রচনা করে রেখেছিলেন। এই সুযোগে তিনি প্রথম তা পরিবেশনের সুযোগ পান। দোহারগণ গানটি বেশ সুন্দরভাবে পরিবেশন করেন, ফলে তা উপভোগ্য হয়ে ওঠে। এই ধরনের কবির জবাব দেওয়ার ব্যাপারে রাজেন্দ্রনাথ সরকারও ঠিক প্রস্তুত ছিলেন না। সঙ্গত কারণে রাজেন্দ্রনাথের করা সেদিনের জবাব তাই শ্রোতাদের ততোটা মনোরঞ্জন করেনি। এরপর শুরু হয় টপ্পা। টপ্পার বিষয় ছিল মাইকেল ও রামকৃষ্ণ। রাজেন্দ্রনাথ সরকার মাইকেল হয়ে রামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেছিলেন, স্বরূপেন্দু সরকার রামকৃষ্ণের ভূমিকায় জবাব দিয়ে যাচ্ছিলেন। পাঁচালির দ্বিতীয় আসরে রাজেন্দ্রনাথ সরকার প্রসঙ্গত মসজিদে গিয়ে পুরুষদের সঙ্গে একত্রে মুসলমান নারীর নামাজ পরতে না পারার কথা তোলেন এবং এর জন্য মুসলমান পুরুষদের কামুকতা নিয়ে কটাক্ষ করেন। এতে মুসলমান শ্রোতারা ক্ষেপে যান। বিশেষভাবে চেয়ারম্যান সুলতান মিয়া আসরে উঠে এসে রাজেন্দ্রনাথ সরকারকে শারীরিকভাবে প্রহার করতে উদ্যত হন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অনেকে এগিয়ে আসেন। এমন পরিস্থিতিতে গান চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। সেদিনের গান যথাযথভাবে শেষ না হলেও, রাজেন্দ্রনাথ সরকারের বিপক্ষে কবিগান করার সুযোগ পেয়ে স্বরূপেন্দু সরকার যে আত্মবিশ্বাস অর্জন করেন, তাই নিয়ে তাঁর কবিয়াল জীবনের শুভসূচনা হয়। তবে রাজেন্দ্রনাথ সরকারের কথা-বার্তা এবং আচরণ অনেক সময়ে এভাবে সীমা অতিক্রম করতে দেখে অতঃপর স্বরূপেন্দু সরকার মনে মনে ঠিক করেন, গুরু হিসেবে আর রাজেন্দ্রনাথ নয়, অন্য কোনো একজনকে বেছে নেবেন।[১২]

১৯৫৮ সালে দেশে ফিরে আসার পরে শরৎচন্দ্র সরকার এবং স্বরূপেন্দু সরকার একত্রে থাকতেন। কৃষ্ণকান্ত ছিলেন জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে। কাটোয়ায় থাকতেই ১৯৫৭ সালের দিকে শরৎচন্দ্রের স্ত্রীবিয়োগ হয়। তাঁর স্ত্রী দুইটি পুত্র এবং তিনটি কন্যা রেখে মারা গিয়েছিলেন। কনিষ্ঠ কন্যাটির বয়স ছিল তখন মাত্র দেড় বছর। শরৎচন্দ্রের স্ত্রী মারা যাওয়ার দিন থেকেই স্বরূপেন্দু সরকারের স্ত্রী নীলিমা সরকার এই বড় পরিবারের গৃহিণী হিসেবে সংসারের হাল ধরেন। এ সময়ে কৃষিজমি থেকে যে ফসল আসত, তাতে এই বড় পরিবারের ব্যয় সংকুলান হত না। তার ওপরে আত্মীয়স্বজনেরও বেশ চাপ ছিল। এমন পরিস্থিতিতে শরৎচন্দ্র বাড়িতে একটি তেল ভাঙানোর কল স্থাপন করেন এবং মাঝে-মধ্যে মিস্ত্রিগিরিও করতে থাকেন। অন্যদিকে স্বরূপেন্দু সরকার শেখেন ঘড়ি-কলমে নাম লেখার কাজ। কাজটি তিনি কাটোয়ায় থাকতেই মধ্যম ভ্রাতা হেমন্তের বন্ধু মহানন্দের নিকট থেকে শিখেছিলেন। এই পথে রোজগার করা সম্ভব ভেবে তিনি প্রাসঙ্গিক কিছু যন্ত্রপাতি তৈরি করেন এবং প্রথমে বরিশাল শহরে গিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে ঘড়ি-কলম ও অন্যান্য ধাতব পাত্রে নাম লিখে অর্থ উপার্জন করতে থাকেন। ১৯৫৮ ও ১৯৫৯ সাল এই দুই বছর তিনি প্রায় সারাটা বছরই এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঘড়ি-কলমে নাম লেখার জন্য তিনি তখন বরিশাল, ঢাকা, খুলনা, বাগেরহাট, গোপালগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি শহরে গিয়ে কাজ করেছেন। তাঁর হাতের লেখা খুব সুন্দর ছিল বলে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সুন্দর সুন্দর নকশা তৈরি করতে পারতেন বলে অনেকে তাঁকে বেশ সমীহ করতেন এবং

১১. বর্তমান গবেষক কর্তৃক গৃহীত স্বরূপেন্দু সরকারের পুত্র ড. স্বরোচিষ সরকারের সাক্ষাৎকার।
১২. বর্তমান গবেষক কর্তৃক গৃহীত স্বরূপেন্দু সরকারের পুত্র ড. স্বরোচিষ সরকারের সাক্ষাৎকার।

অন্যদের থেকে অধিক হারে পারিশ্রমিক দিতেন। কাজটি যদিও মোটেই সম্মানজনক ছিল না। তবে এই কাজে স্বরূপেন্দু সরকারেরর আর্থিক সচ্ছলতা ঘটে। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত তিনি কবিগানের ফাঁকে ফাঁকে এই কাজ অব্যাহত রাখেন। ১৯৬৫ সালে তিনি যে বরিশাল থেকে একত্রে দুটি বই ছেপেছিলেন এবং ১৯৬৬ সালে তিনি যে দোতলা একটি কাঠের ঘর তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তা তাঁর এই কাজের পারিশ্রমিকেরই পরিণতি।[১৩]

কবিয়াল-জীবন

আর্থিক সচ্ছলতার থেকেও সামাজিক সম্মানের প্রতি স্বরূপেন্দু সরকারের আকর্ষণ তাঁকে কবিগানের প্রতি আকৃষ্ট করতে থাকে। কিভাবে কবিগানকে সার্বক্ষণিক পেশা হিসেবে গ্রহণ করা যায়, সে ব্যাপারে পিতা কৃষ্ণকান্ত সরকারের সঙ্গে স্বরূপেন্দু সরকারের নিয়মিত আলোচনা হয়। কৃষ্ণকান্ত সরকারও মনেপ্রাণে চাইতেন তাঁর ছেলে সম্মানজনক কোনো কাজের সঙ্গে যুক্ত হোক। স্বরূপেন্দুর কবিপ্রতিভা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন এবং একই সঙ্গে আশাবাদীও ছিলেন। তাই একদিন তিনি পুত্র স্বরূপেন্দুকে ডেকে বলেন, সে যেন বিজয় সরকারকে গুরু করে ভালোভাবে কবিগান শেখার চেষ্টা করে।

১৯৬০ সালের জানুয়ারি মাসের দিকে ফকিরহাট থানার ঝালোডাঙা গ্রামে বিজয় সরকার এবং নিশি সরকারের কবিগান ছিল। কবিগান শুরু হওয়ার পূর্বেই স্বরূপেন্দু সরকার সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। বিজয় সরকার এবং নিশি সরকার তখন একটি খাটের উপর বসে ছিলেন। স্বরূপেন্দু সরকার একত্রে দুজনকে প্রণাম করে দুজনের হাতে দুটি টাকা প্রণামী হিসেবে অর্পণ করেন এবং তিনি যে বিজয় সরকারের শিষ্য হওয়ার বাসনা নিয়ে এখানে এসেছেন অত্যন্ত বিনীতভাবে তিনি তা জানান। বিজয় সরকারের সঙ্গে তখন কোল-সরকার হিসেবে সন্তোষপুরের আশু মধু কবিগান শিখছিলেন। সেই কথা উল্লেখ করে বিজয় সরকার স্বরূপেন্দু সরকারকে বলেন, 'আমার সঙ্গে তো একজন রয়েছে, তুমি বরং নিশির কোল-সরকার হয়ে থাকো এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করো।' নিশিকান্ত সরকারও এ প্রস্তাবে রাজি হওয়ায় স্বরূপেন্দু সরকার নিশি সরকারের কোল-সরকার হিসেবে কাজ করতে শুরু করেন। তখন কবিগান মরশুমের শেষদিক, অর্থাৎ এপ্রিল-মে (চৈত্র-বৈশাখ) মাস। নিশি সরকার এবং বিজয় সরকার সে বছর জোট করে গান গাইছিলেন। এই জোটকে যাঁরা বায়না দিতেন বিজয়-নিশি শুধু সেইসব বায়নাই গ্রহণ করতেন। স্বরূপেন্দু সরকারের এই শিক্ষাজীবন ছিল মাত্র ২১ দিন। এই একুশ দিনে মোট দশ-বারো পালা কবিগানে তিনি নিশিকান্ত সরকারের সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁর পক্ষে প্রায় সব কটি আসরেই পাঁচালি বলার সুযোগ পেয়েছিলেন।

১৯৬০ সালে নিশিকান্ত সরকার স্থায়ীভাবে দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যান। ভারতে চলে যাওয়ার পূর্বে স্বরূপেন্দু সরকার তাঁর করণীয় সম্পর্কে জানতে চাইলে নিশিকান্ত বলেন, 'অসুবিধা কী, তুই নিজেই দল গঠন কর।' নিশিকান্ত সরকারের সঙ্গে যেসব দোহার ও ঢুলি কাজ করতেন, তাঁদেরও তিনি বলে যান তাঁরা যেন স্বরূপেন্দু সরকারের সঙ্গে কাজ করে। এ সময়ে নিশিকান্ত সরকারের দোহারদের মধ্যে ছিলেন ওস্তাদ সতীশ শীল, দীঘিরজানের সতীশ মণ্ডল, হরিপাগলার ক্ষীরোদ মজুমদার, হরিপাগলার মনোহর বৈরাগী, বাবলার মহেন্দ্র মিস্ত্রি, বাবলার নিতাই মিস্ত্রি, শাঁখারিকাঠির মনোহর ভুঁইমালী প্রমুখ। এঁদের সকলকে নিয়ে স্বরূপেন্দু সরকার নতুনভাবে গানের দল গঠন করেন।[১৪]

১৯৬০ সালের নভেম্বর মাসে (২৫শে কার্তিক) স্বরূপেন্দু সরকারের পিতৃবিয়োগ হয়। তিনি অন্তত দেখে যেতে পেরেছিলেন যে, তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র একজন কবিয়াল হতে যাচ্ছেন। কিন্তু পুত্র স্বরূপেন্দু কতটা ভালো কবিগান গাইতেন, তা তিনি নিজের কানে শুনে যেতে পারেননি। স্বরূপেন্দু সরকার তাঁর

১৩. বর্তমান গবেষক কর্তৃক গৃহীত স্বরূপেন্দু সরকারের পুত্র ড. স্বরোচিষ সরকারের সাক্ষাৎকার।
১৪. বর্তমান গবেষক কর্তৃক গৃহীত স্বরূপেন্দু সরকারের পুত্র ড. স্বরোচিষ সরকারের সাক্ষাৎকার।

নিজের দল নিয়ে প্রথম কবিগান করেন ১৯৬১ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসের কোনো একদিনে দড়ি উমাজুড়ি গ্রামের কবিখোলায়। বিপক্ষের কবিয়াল ছিলেন দ্বিজবর সরকার। এরপর এই বছরেই তিনি একাদিক্রমে ছোট রাজেন্দ্রনাথ সরকার, কালিদাস সরকার, বিনয় সরকার প্রমুখের বিপক্ষে কবিগান করার সুযোগ পান। ঐ বছর মে মাসের ৯ তারিখ মঙ্গলবার (২৬শে বৈশাখ ১৩৬৮) খুলনা-বরিশাল অঞ্চলে প্রলয়ঙ্করী এক ঘূর্ণিঝড় হয়। এতে অনেক মানুষ হতাহত হয়। এই ঘটনার পরে ঐ বছরে আর কোনো গান অনুষ্ঠিত হতে পারেনি।

১৯৬১ সালের শেষদিকে বাগেরহাট থানার কাঠিগোমতী গ্রামে রাজেন্দ্রনাথ সরকার এবং বিজয় সরকারের মধ্যে কবিগানের একটি বিখ্যাত পাল্লা হয়। স্বরূপেন্দু সরকার সেখানে গান শুনতে গিয়েছিলেন। ঘূর্ণিঝড় নিয়ে স্বরূপেন্দু সরকার একটি মালশি গান রচনা করেছেন এ কথা বিজয় সরকারকে জানালে তিনি স্বরূপেন্দুকে তা পরিবেশনের নির্দেশ দেন। রাজেন্দ্রনাথ সরকার এবং বিজয় সরকার সহ উপস্থিত শ্রোতারা সকলেই এই মালশি'র প্রশংসা করেছিলেন। গানটির প্রথম কয়েকটি কলি ছিল এ রকম :

"মহামায়া তোর খেলা বুঝিতে মোর পুঁজিতে নাহি কিঞ্চিৎ জ্ঞান
খেলো খেয়ালের বশে খেলা জীবগণের ঘটে জ্বালা যায় না ভোলা থাকিতে পরাণ
মাগো ১৩৬৮ সালে দেখালি মা তুই যে লীলে মঙ্গলবার ছাব্বিশে বৈশাখ
টঙ্কারি অমঙ্গলের ঢাক
মা-মাগো সূর্যদেব না উঠিতে,
তোর কুটিল ভ্রূকুটিতে,
যেন ভোলা প্রলয় প্রকটিতে ফুকিল প্রলয়ের বিষাণ।"[১৫]

১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত স্বরূপেন্দু সরকারের পেশা ছিল অত্যন্ত দ্বিধাবিভক্ত। মে মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে গিয়ে ঘড়ি-কলম ও অন্যান্য ধাতব পাত্রে নাম লিখতেন ও নানা ধরনের শৈল্পিক নকশা করতেন। অন্যদিকে সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া কবিগানের মরশুমে বিভিন্ন কবিয়ালদের বিপক্ষে কবিগান করতেন। স্বরূপেন্দু সরকার এ সময়ে বৃহত্তর খুলনা, বরিশাল, ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর প্রভৃতি জেলার প্রায় সকল বিখ্যাত সরকারের বিপক্ষে কবিগান করেছেন। এই কবিয়ালদের মধ্যে বিজয় সরকার, ছোট রাজেন্দ্রনাথ সরকার, বিনয় সরকার, দ্বিজবর সরকার, নন্দলাল সরকার, প্রিয়নাথ সরকার, সরোজ সরকার, সিদ্ধেশ্বর সরকার প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯৬৪ সালে বিজয় সরকারের বিপক্ষে অনেকটা জোটের মতো করে বেশ কয়েক পালা কবিগান পরিবেশন করেছেন। সেবার তাঁরা একবার গোপালগঞ্জ কলেজ প্রাঙ্গণে সরস্বতী পূজায় গান করেন এবং পরের দিন গান করেন সাচিয়া গ্রামে। সাচিয়া গ্রামের গান আয়োজন করেছিলেন মাধব বাগচী নামে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। এর দুদিন পরে গান ছিল চরবানিয়ারি পশ্চিমপাড়া গ্রামে। মাঝের এই দুই দিন বিজয় সরকারের দলসহ স্বরূপেন্দু সরকার তাঁর দল নিয়ে চরবানিয়ারি নিজ বাড়িতে অবস্থান করেন।

১৯৬৪ সালের দিকে স্বরূপেন্দু সরকারের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন রসিক সরকার এবং ছোট রাজেন্দ্রনাথ সরকার। এই বাড়িতে একদিন তাঁরা অবস্থান করেছিলেন। স্বরূপেন্দু সরকারের আর্থিক অবস্থা তখন খুব একটা ভালো ছিল না। তা সত্ত্বেও স্বরূপেন্দু সরকার তাঁদের যথাসাধ্য আপ্যায়ন করেছিলেন এবং রাতে বেশ ভালো মানের একটি গানের আসর বসিয়েছিলেন। এই আসরে রসিক সরকার তাঁর অনেকগুলো বিখ্যাত গান পরিবেশন করেন।

---

১৫. বর্তমান গবেষক কর্তৃক গৃহীত স্বরূপেন্দু সরকারের পুত্র ড. স্বরোচিষ সরকারের সাক্ষাৎকার।

১৯৬৫ সালের পূর্বে কোনো এক সময়ে বাগেরহাট ডাকবাংলায় পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীনের সঙ্গে স্বরূপেন্দু সরকারের দেখা হয় এবং আলাপ-আলোচনা হয়। আলোচনার এক পর্যায়ে উভয়ে ছড়ায় ছড়ায় কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন। স্বরূপেন্দু সরকার তখন তাঁর লেখা অনেকগুলো ধুয়াগান জসীমউদ্‌দীনকে দেখতে দিয়েছিলেন। জসীমউদ্‌দীন তখন গানগুলো দেখে প্রশংসা করেছিলেন এবং ঢাকার কোনো পত্রিকায় এগুলো প্রকাশ করার চেষ্টা করবেন বলে জানিয়েছিলেন। এই কালপর্বে স্বরূপেন্দু সরকার এবং জসীমউদ্‌দীন-এর মধ্যে বেশ কয়েকবার পত্রালাপ হয়। এই পত্রগুলোর একটি ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত স্বরূপেন্দু সরকার বিরচিত 'ভাটির নাইয়া' বইয়ের প্রারম্ভিক অংশে মুদ্রিত হয়েছে।[১৬]

১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৫ এবং ১৯৬৬ সালে কবিগান প্রায় বন্ধ হয়ে ছিল বলা যায়। হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাও তখন চরম আকার ধারণ করে। এই পরিস্থিতিতে হিন্দু আয়োজকগণও কবিগানের মতো অনুষ্ঠান আয়োজন করতে ভয় পান। তা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ হিন্দুপ্রধান এলাকাগুলোতে দু-এক পালা করে কবিগানের আয়োজন হতে থাকে। স্বরূপেন্দু সরকারের গানের বায়নাও তখন বিশেষভাবে কমে আসে। ১৯৬৫ সালের এই সময়ে তিনি বই রচনায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেছিলেন।

১৯৬৭ সালের দিকে বরিশাল প্রদর্শনী উপলক্ষে কবিগানের আয়োজন করা হয়েছিল। স্বরূপেন্দু সরকার সে আয়োজনে অন্যতম কবিয়াল হিসেবে আমন্ত্রণ পান। বিপক্ষের কবি ছিলেন নন্দলাল সরকার। এই আসরে স্বরূপেন্দু সরকার 'বলদের কবি' নামে একটি কবি (গান) পরিবেশন করেন। কবি (গান) টির প্রথম কয়েকটি কলি ছিল এ রকম :

"এবার দুশত বৎসরের পরে পুনঃ প্রাণ পেলাম ধরে, এবারে পূর্ণ স্বাধীন হলাম।
এখন সুখী দুঃখী ধনী মানীর সমান অধিকার, কেহ আর নয় কারো কেনা গোলাম
এইসব দেখে শুনে ধীরু বাবুর গোয়ালের বলদ ও তার ঝেড়ে ফেলে মনের গলদ,
বাবুকে বলতেছে হাম্বা রবে
তোমরা তো হলে স্বাধীন,
আমরা পরাধীন আর রবো কদিন, বলো না তবে।"[১৭]

এই কবি (গান) পরিবেশন করার সময়ে জেলাপ্রশাসক সাহেব শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। গানের পরে জেলাপ্রশাসক সাহেব স্বরূপেন্দু সরকারকে ডাকান এবং গানটির তাৎপর্য জানতে চান। স্বরূপেন্দু সরকার জবাবে বলেন, সাধারণ মানুষ আনন্দ পাবে বলেই একটি বলদের মাথায় স্বাধীনতার চিন্তা ঢোকানো হয়েছে। এর জবাবে জেলাপ্রশাসক বেশ উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন,

> 'এটি আপত্তিকর গান, ভবিষ্যতে আপনি আর কোথাও এটি পরিবেশন করবেন না। তাহলে আপনাকে ক্ষমা করা হবে না। কারণ আপনি যা বলতে চান, তা আমরা বুঝি।'

বরিশালের প্রদর্শনীতে একটি ডাক গান, একটি কবি (গান) এবং টপ্পা-ধুয়া-পাঁচালি পরিবেশিত হয়েছিল।

১৯৬৮ সালের দিকে বাগেরহাট প্রদর্শনীতে কবিগানের আমন্ত্রণ পান স্বরূপেন্দু সরকার। বিপক্ষের কবিয়াল ছিলেন বিনয় সরকার। এই আসরে স্বরূপেন্দু সরকার 'বর্ষা ও বসন্তের কবি' নামে একটি নতুন কবি (গান) রচনা করে পরিবেশন করেছিলেন, সমঝদারেরা গানটির ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

১৯৬৯, ১৯৭০ এবং ১৯৭১ সালে প্রচুর গানের বায়না হয়। এর মধ্যে এক বছর তিনি অনাদি সরকারের বিপক্ষে অনেক পালা গান করেন। এই তিন বছর সবচেয়ে বেশি গান করেন বিনয় সরকারের বিপক্ষে। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ সরকারের বিপক্ষেও তখন অনেক গান করেন।

---

১৬. বর্তমান গবেষক কর্তৃক গৃহীত স্বরূপেন্দু সরকারের পুত্র ড. স্বরোচিষ সরকারের সাক্ষাৎকার।
১৭. বর্তমান গবেষক কর্তৃক গৃহীত স্বরূপেন্দু সরকারের পুত্র ড. স্বরোচিষ সরকারের সাক্ষাৎকার।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ শ্রীধাম ওড়াকান্দিতে স্বরূপেন্দু সরকারকে গান গাইতে হয় রাজেন্দ্রনাথ সরকারের বিপক্ষে। রাজেন্দ্রনাথ সরকার তখন গান গাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও শ্রীঅংশুপতি ঠাকুরের অনুরোধে তিনি গাইতে রাজি হন। বস্তুত এটাই ছিল রাজেন্দ্রনাথ সরকারের শেষ কবিগান গাওয়া। এদিন গান শুরু হয়েছিল সন্ধ্যার দিকে। গানের টপ্পায় রাজেন্দ্রনাথ সরকার নিজেকে ইন্দিরা গান্ধী এবং স্বরূপেন্দু সরকারকে শেখ মুজিবের ভূমিকায় অবতীর্ণ করিয়ে পাঁচালি শুরু করেন। পাঁচালির ছন্দে ছন্দে রাজেন্দ্রনাথ সরকার এবং স্বরূপেন্দু সরকার যখন ভারত ও পাকিস্তানের পক্ষে-বিপক্ষে অবতীর্ণ হয়ে নানা ধরনের সম্ভাব্য ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করে যাচ্ছিলেন, তখন মাঝে মাঝে গোলাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল।[১৮]

১৯৭১ সালের জুলাই মাসে স্বরূপেন্দু সরকার সপরিবারে দেশত্যাগ করে ১৫ দিন ধরে পায়ে হেঁটে হেলেঞ্চা সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। অন্য শরণার্থীদের সঙ্গে স্বরূপেন্দু সরকারের স্থান হয় লবণহ্রদ ৫ নং ক্যাম্পের ১/৪০ নম্বর ঘরের একটি কক্ষে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে এই ক্যাম্পে স্বরূপেন্দু সরকারকে অন্তত সাত পালা কবিগান করতে হয়, যার পাঁচটিতে বিপক্ষের কবিয়াল ছিলেন ছোট রাজেন্দ্রনাথ সরকার এবং দুটিতে বিপক্ষের কবিয়াল ছিলেন বিনয় সরকার। কিছুদিনের মধ্যে ছোট রাজেন্দ্রনাথ সরকারকে নিয়ে রসিক সরকার উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় গান গাইতে চলে যান। দ্বিজবর সরকার চলে যান গয়ার কোনো একটি ক্যাম্পে। ঐ বছর কালীপূজার সময়ে কোলকাতার বাটানগরে নকুল দত্তের বিপক্ষে স্বরূপেন্দু সরকারের বায়না হয়। ডাক, মালশি, সখীসংবাদ প্রভৃতি শ্রেণির গানও তখন সেখানে পরিবেশন করতে হয়। একই আসরে পরপর দুই দিন কবিগান হয়। গানের পরের দিন নকুল দত্তের সঙ্গে স্বরূপেন্দু সরকারের আন্তরিক কথাবার্তা হয়। স্বরূপেন্দু সরকার নকুল দত্তকে দাদু হিসেবে সম্বোধন করেন। প্রধান কারণ নকুল দত্তকে বিজয় সরকার বাবা নামে ডাকতেন। স্বরূপেন্দু সরকার তাঁর অনেকগুলো মালশি, সখীসংবাদ ও কবি শোনান। নকুল দত্ত সেগুলোর বেশ প্রশংসা করেন।[১৯]

শরণার্থী জীবনে বিশেষভাবে ১৯৭১ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত স্বরূপেন্দু সরকার সুরেন্দ্রনাথ সরকার এবং মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের বিপক্ষে বেশ কয়েক পালা কবিগান পরিবেশন করেছেন। এই গানগুলো ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সরকারি কার্যক্রমের অংশ। সুরেন্দ্রনাথ সরকারের 'লোকরঞ্জন কবিপার্টি' এই কাজের জন্য নিবন্ধিত ছিল। এই গানে ডাক, মালশি, সখীসংবাদ, কবি কিছুই গাওয়ার দরকার হত না। শুধু ধুয়া আর পাঁচালি দিয়ে এইসব কবিগান পরিবেশিত হত। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের বিপক্ষেও স্বরূপেন্দু সরকারকে ঠিক একই ধরনের সরকারি গান গাইতে হয়েছিল। ফেব্রুয়ারি মাসের দিকে স্বরূপেন্দু সরকার যখন বাংলাদেশে চলে আসেন, তখনো তাঁর বেশ কয়েক পালা গানের বায়না ছিল, যা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছিল।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশের কোথাও কবিগান হয়নি। কবিগান হওয়ার মতো পরিস্থিতিও তখন ছিল না। ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে স্থানীয় ইডিএ পোস্ট অফিসে স্বরূপেন্দু সরকারের পোস্টমাস্টারের চাকরি হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া এই পরিবারটি এর ফলে কিছুটা সচ্ছলতার মুখ দেখে। সচ্ছলতার মূল কারণ বেতন বেশি ছিল না, বরং ছিল রেশন হিসেবে নির্দিষ্ট হারে আটা, চিনি ও লবণ কিনতে পারার সুযোগ। এগুলো স্বরূপেন্দু সরকারকে প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরের বাগেরহাট শহর থেকে সংগ্রহ করতে হত।

১৯৭৩ সাল থেকে পুনরায় কবিগান শুরু হয়। কবিগানের মরশুম মোটামুটি সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত ছয় মাস। স্বরূপেন্দু সরকার যখন কবিগানের বায়না পেতেন তখন তাঁর পুত্র স্বরোচিষ সরকার তাঁর হয়ে পোস্টঅফিসের নির্ধারিত কাজকর্ম করতেন।

---

১৮. বর্তমান গবেষক কর্তৃক গৃহীত স্বরূপেন্দু সরকারের পুত্র ড. স্বরোচিষ সরকারের সাক্ষাৎকার।

১৯. বর্তমান গবেষক কর্তৃক গৃহীত স্বরূপেন্দু সরকারের পুত্র ড. স্বরোচিষ সরকারের সাক্ষাৎকার।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ১৯৭৪ সালে দেখা দেয় মারাত্মক দুর্ভিক্ষ। তাই ১৯৭৪-১৯৭৫ মরশুমে কবিগান তেমন হয় না। ১৯৭৫ সাল থেকে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। এ সময় থেকে প্রতি বছর কার্তিক থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত স্বরূপেন্দু সরকার সাতক্ষীরা থেকে শুরু করে নোয়াখালী পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে কবিগান পরিবেশন করতে থাকেন।[২০]

১৯৮০ সালে ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশনের কবিগানে বিপক্ষের কবিয়াল ছিলেন কুমিল্লার কালোশশী চক্রবর্তী। স্বরূপেন্দু সরকারের দলে দোহার ছিলেন সতীশ মণ্ডল, খগেন বিশ্বাস, ব্রজবাসী মণ্ডল, হরিদাস রায়, ঢুলি ছিল শান্তিরঞ্জন বিশ্বাস। দিগেন্দ্রনাথ সরকারও তখন স্বরূপেন্দু সরকারের দলের সঙ্গে ঢাকায় এসেছিলেন। কালোশশী চক্রবর্তীর দলে অসাধারণ কণ্ঠের অধিকারী কয়েকজন দোহার ছিলেন। তাঁরা ১২ স্কেলে গান গাইতে পারতেন। মোট দুই পালা গান হয়েছিল। প্রথম দিন ডাক ও মালশি দুই পক্ষের হওয়ার পর কালোশশী চক্রবর্তীর দল একটি সখীসংবাদ গাওয়ান। গানটির পরিবেশন মহারাজের ততোটা পছন্দ না হওয়ায় সরকারদ্বয়কে ডেকে মহারাজ টপ্পা শুরু করতে বলেন। কালোশশী চক্রবর্তী অনুরোধ করেন স্বরূপেন্দু সরকারকে টপ্পা দিতে। স্বরূপেন্দু সরকার নিজেকে কালীর প্রেরিত পারলৌকিক আত্মা অর্থাৎ বিবেকানন্দ এবং কালোশশীকে রামকৃষ্ণের ভূমিকায় বর্ণনা করে প্রশ্ন শুরু করেন। স্বরূপেন্দু সরকারের প্রশ্নগুলো কালোশশী চক্রবর্তীর নিকট খানিকটা কঠিন মনে হয় এবং তার ফলে তিনি অনেকটা অপ্রস্তুত হয়ে যান। টপ্পার পরে পাঁচালীর সময়ে তিনি প্রশ্নগুলোর যে জবাব দেন, তা মিশনের মহারাজ ও শ্রোতাদের মনঃপূত হয় না। কালোশশী চক্রবর্তী ধুয়াও দিতে পারছিলেন না। তবে তাঁর সাজসজ্জায় কিছু বৈচিত্র্য ছিল, কপালে ছিল সিঁদুর এবং পায়ে ছিল ঘুঙুর। কালোশশী চক্রবর্তীর এই সাজসজ্জা স্বরূপেন্দু সরকারের নিকটে অভিনব মনে হয়েছিল।

প্রশ্নের সরাসরি জবাবে না গিয়ে কালোশশী চক্রবর্তী স্বরূপেন্দু সরকারকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে ছড়া কাটতে থাকেন, তার আংশিক তুলে ধরা হল :

> "খুলনার সরকার,
> করে দেবো খেয়া পার,
> অথবা কেউটা দিয়ে কান চুলকাবা না।"

স্বরূপেন্দু সরকারকেও বাধ্য হয়ে মূল প্রসঙ্গের পাশাপাশি এসব ব্যক্তিগত বিষয়ের জবাব দিতে হয়। স্বরূপেন্দু সরকার বলেন

> "খুলনা এবং ঢাকা শুধু খেয়াপারাপারের দূরত্বে নয়,
> অথবা কেউটা হলো জন্তু,
> অন্যদিকে কেউটে দিয়ে কান চুলকানোর সাহস করতে পারে শুধু ওঝারাই,
> এবং ওঝারা মানুষ।"[২১]

এভাবে শেষ পর্যন্ত আক্রমণ-প্রতি-আক্রমণ এমন পর্যায়ে চলে যায় যে, কালোশশী চক্রবর্তী গানের শেষ অংশ জোটের পাল্লা করতে অসম্মত হন। অগত্যা কোল-সরকার হরিদাসকে নিয়ে স্বরূপেন্দু সরকার প্রথম পালার জোটের পাল্লা দিয়ে গান শেষ করেন।

দ্বিতীয় দিন কবিগানের দ্বিতীয় পালাও কালোশশী চক্রবর্তী সঙ্গে হওয়ার কথা থাকলেও কালোশশী চক্রবর্তী স্বরূপেন্দু সরকারের সঙ্গে গান গাইতে অস্বীকার করে রামকৃষ্ণ মিশন ছেড়ে চলে যান। এ ব্যাপারে প্রধান মহারাজ মহোদয়ের ভর্ৎসনাও বিশেষ কার্যকর থাকতে পারে। স্বরূপেন্দু সরকারের সঙ্গী হিসেবে কবিয়াল দিগেন্দ্রনাথ সরকার ঢাকায় এসেছিলেন। বস্তত খুলনার রূপরামপুর কবির আসরে

---

২০. বর্তমান গবেষক কর্তৃক গৃহীত স্বরূপেন্দু সরকারের পুত্র ড. স্বরোচিষ সরকারের সাক্ষাৎকার।
২১. বর্তমান গবেষক কর্তৃক গৃহীত স্বরূপেন্দু সরকারের পুত্র ড. স্বরোচিষ সরকারের সাক্ষাৎকার।

যখন স্বরূপেন্দু সরকারকে বায়না করা হয় তখন দিগেন্দ্রনাথ সরকার ছিলেন বিপক্ষের সরকার। তাঁরা তখন পরপর বেশ কয়েকটি গান জোটের মতো করে গাচ্ছিলেন। কবিয়ালের এমন শূন্যাবস্থায় দ্বিতীয় দিনের পালায় খুব সহজেই দিগেন্দ্রনাথকে বিপক্ষের সরকার হিসেবে মনোনীত করা হয়। দ্বিতীয় দিনের কবিগানে শ্রোতারা এবং মহারাজগণ বেশ খুশি হন। এর পরে পর পর কয়েক বছর স্বরূপেন্দু সরকার কখনো দিগেন্দ্রনাথ সরকারকে নিয়ে, কখনো রবীন্দ্রনাথ সরকারকে নিয়ে, কখনো বিনয় সরকারকে নিয়ে, কখনো ছাত্র শিয়ালীর নিখিল সরকারকে নিয়ে ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনে গান করেছেন। এইসব গানের ব্যবস্থাপনায় বিশেষভাবে যুক্ত থাকতেন দয়াল মহারাজ। দয়াল মহারাজের সঙ্গে স্বরূপেন্দু সরকারের ব্যক্তিপর্যায়েও খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিখ্যাত সুরকার আজাদ রহমান এবং বিখ্যাত চিত্রপরিচালক সুভাষ দত্ত প্রমুখের সঙ্গে স্বরূপেন্দু সরকারের পরিচয় ও যোগাযোগ ঘটে ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনে এই কবিগান গাওয়ার সূত্রে।[২২]

১৯৯৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকার বাংলা একাডেমির একুশের মঞ্চে কবিগান পরিবেশন স্বরূপেন্দু সরকারের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিপক্ষের সরকার ছিলেন ছোট রবীন্দ্রনাথ সরকার। এই গানের আসরটি ছিল খানিকটা ব্যতিক্রমধর্মী। এখানে ডাক-মালশি জাতীয় গান বাদ দিয়ে শুধু ধুয়া-পাঁচালি দিয়েই গান সম্পন্ন হয়। সেদিন গানের বিষয় ছিল স্বৈরতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র। স্বরূপেন্দু সরকার স্বৈরাচারী রাষ্ট্রপ্রধানের ভূমিকায় এবং ছোট রবীন্দ্রনাথ সরকার গণতন্ত্রী সরকারপ্রধানের ভূমিকায় চমৎকারভাবে গান পরিবেশন করেছিলেন। একুশের মঞ্চের সবগুলো চেয়ার পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং পেছনেও অনেকে দাঁড়িয়ে থেকে এই গান উপভোগ করেন। স্বরূপেন্দু সরকার যখন স্বৈরাচারী সরকারের পক্ষে চমৎকার চমৎকার যুক্তি তুলে ধরছিলেন, শ্রোতারা তখন মুহুর্মুহু করতালি দিয়ে স্বরূপেন্দু সরকারকে উৎসাহিত করেছিলেন।

১৯৯৪ সালে স্বরূপেন্দু সরকার ঢাকার সোনারগাঁ লোকশিল্প জাদুঘরে কবিগান পরিবেশন করেন। সেই গানে বিপক্ষের কবিয়াল ছিলেন যশোরের সঞ্জয় মল্লিক। এখানে টপ্পা গাইতে চেষ্টা করলে শ্রোতারা বিশেষ অসহযোগিতা করে। এমনকি ধুয়া-পাঁচালিও এখানে খুব সংক্ষেপে সমাপ্ত করতে হয়। বিশেষ কারণ ছিল, ঐদিনের কবিগানের পরেই বিশেষ আকর্ষণ ছিলেন বিখ্যাত লোকগানের শিল্পী আবদুর রহমান রয়াতি। এখানকার শ্রোতারা কবিগান শোনার ব্যাপারে এমন অনাগ্রহ দেখানোয় স্বরূপেন্দু সরকার বিশেষ মনঃকষ্ট পেয়েছিলেন। গান শুরু করার পূর্বে স্বরূপেন্দু সরকার সম্পর্কে আবদুর রহমান বয়াতির প্রশংসামূলক বাক্যেও সে কষ্ট দূর হয়েছিল এমন মনে হয় না।[২৩]

১৯৭৫ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত এই পঁচিশ বছর স্বরূপেন্দু সরকার সক্রিয়ভাবে কবিগান পরিবেশন করেছেন। তবে এর পরেও অনেক শিষ্য-প্রশিষ্যদের অনুরোধে কোনো কোনো আসরে এক-আধটু পাঁচালিতে অংশগ্রহণ করে থাকেন। ২০০৮ সালে তিনি একেবারেই অবসর জীবন যাপন করছেন।

এই দীর্ঘ পঁচিশ বছরের মধ্যে যেসব কবিয়ালের বিপক্ষে তিনি কবিগান করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ সরকার, অনাদি সরকার, ছোট রাজেন্দ্রনাথ সরকার, কালীপদ সরকার, বিনয় সরকার, রবীন্দ্রনাথ সরকার, গৌর সরকার, নারায়ণচন্দ্র সরকার, কালোশশী চক্রবর্তী, নন্দলাল সরকার, দ্বিজবর সরকার, দিগেন্দ্রনাথ সরকার, মহাদেব সরকার, অমর সরকার, নিতাই সরকার, সন্ধ্যা সরকার, মণিলাল সরকার, ভেকটমারীর কৃষ্ণকান্ত সরকার, সঞ্জিত পাল, সঞ্জয় মল্লিক, ছোট রবি সরকার, হরিদাস সরকার প্রমুখ সরকারের নাম প্রধান।[২৪]

এই সময়ের মধ্যে স্বরূপেন্দু সরকারের নিকট দীক্ষিত হয়ে যাঁরা কবিগান শুরু করেছেন, তাঁদের মধ্যে ভূজনীয়ার কৃষ্ণকান্ত সরকার, বাজুয়ার কৃষ্ণকান্ত সরকার, শিয়ালীর নিখিল সরকার, রূপরামপুরের

২২. বর্তমান গবেষক কর্তৃক গৃহীত স্বরূপেন্দু সরকারের পুত্র ড. স্বরোচিষ সরকারের সাক্ষাৎকার।
২৩. বর্তমান গবেষক কর্তৃক গৃহীত স্বরূপেন্দু সরকারের পুত্র ড. স্বরোচিষ সরকারের সাক্ষাৎকার।
২৪. বর্তমান গবেষক কর্তৃক গৃহীত স্বরূপেন্দু সরকারের পুত্র ড. স্বরোচিষ সরকারের সাক্ষাৎকার।

অন্নদা সরকার, বয়ারশিঙ্গার অমূল্য সরকার, মেশারডাঙ্গার হরিবর সরকার, শাঁখারিকাঠির সরোজিৎ সরকার, বাজুয়ার সুরঞ্জন সরকার, কচুরিয়ার তিমির সরকার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এই শিষ্যদের বিপক্ষেও স্বরূপেন্দু সরকার কবিগান করেছেন।[২৫]

শেষজীবনে স্বরূপেন্দু সরকার তাঁর নিজ বাড়িতে অবস্থান করতে পারতেন না। অনেকটা বয়সের কারণে তাঁকে পুত্রদের নিকটে থাকতে হয়। ফলে তাঁর নিজ জন্মভূমি এবং নিজের তৈরি করা বাড়ি বসবাসের অনুপযোগী ওঠে। তাঁর মধ্যম পুত্র সব্যসাচী সরকার পিঁপড়ারডাঙ্গা নামক গ্রামে একটি বাড়ি করেছেন, যা তাঁর কর্মক্ষেত্রের নিকটে। বছরের বেশির ভাগ সময় তিনি সেখানে থাকতেন। এছাড়া অধিকাংশ সময় কাটান পুত্র স্বরোচিষ সরকারের রাজশাহীস্থ ভাড়া বাসায়। বরিশালে কনিষ্ঠ পুত্রের ভাড়াবাড়িতেও মাঝে মাঝে থাকতেন।

২০০৯ সালের ১০ মে স্বরূপেন্দু সরকার সস্ত্রীক বাগেরহাট থেকে রাজশাহী যান। সেখানে দুপুরের আহার এবং রাতের আহার গ্রহণ করেন। তারপর রাতে ঘুমিয়ে পড়েন। সেই ঘুম আর ভাঙেনি। ১৯ মে দুপুর পর্যন্ত অচেতন অবস্থায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ছিলেন। দুপুর দুটার দিকে সেখানেই তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। পরের দিন অর্থাৎ ২০ মে ২০১৩ তারিখে তাঁর নিজ বাড়িতে তাঁর নিজস্ব ঘরের পোতায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। পরে সেখানে একটি সমাধিমন্দির করা হয়েছে।[২৬]

সাহিত্যকর্ম

কিশোরবয়স থেকেই স্বরূপেন্দু সরকারের কবিতা ও ছড়া লেখার অভ্যাস গড়ে উঠেছিল। বিশেষভাবে ১৯৫২ সালে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পরিবারের সঙ্গে কাটোয়ার নিকটবর্তী রামচন্দ্রপুর উদ্বাস্তু শিবিরে অবস্থানকালে তাঁর কবিপ্রতিভার বিশেষ স্ফুরণ ঘটে। এ সময়ে তিনি অনেকগুলো কবিতা এবং জসীমউদ্‌দীনের কাহিনিকাব্যের আদলে একাধিক কাব্য লিখতে শুরু করেছিলেন। এগুলোর মধ্যে 'ভ্রান্তপথের শেষে', 'মাতাল ঢেউ' এবং 'বিষের বাটি' নামে তিনটি পাণ্ডুলিপির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হঠাৎ সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হওয়ায় কিছুকালের জন্য তাতে ছেদ পড়ে। তবে বছরখানেকের মধ্যে সেনাবাহিনীর কাজ থেকে ইস্তফা দিয়ে ১৯৫৩ সালের দিকে কাটোয়ায় থাকাতে সেই কবিপ্রতিভার বিশেষ বিকাশ ঘটার সুযোগ পায়। কাটোয়া থেকে তখন অখিল নিয়োগী বা স্বপন বুড়ো সম্পাদিত একটি সাহিত্য-পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হত। পত্রিকাটির নাম ছিল 'সব পেয়েছির আসর'। স্বরূপেন্দু সরকার এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখতে শুরু করেন। এখানে তাঁর 'মঙ্গল গ্রহের যাত্রী', 'কালের স্রোত' প্রভৃতি নামে বেশ কয়েকটি কবিতা ও ছড়া প্রকাশিত হয়। এইসব প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কবিতা ও ছড়ার একটি পাণ্ডুলিপিও তিনি এ সময়ে তৈরি করেন, যার নাম দেওয়া হয় 'হাসির খোরাক'।[২৭]

স্বরূপেন্দু সরকারের প্রথম বইয়ের নাম 'শ্রীশ্রীহরিঠাকুরের পাঁচালী'। ১৯৬৫ সালে বরিশাল থেকে বইটি ছাপানো হয়। বইয়ের প্রকাশক ছিলেন তাঁর স্ত্রী নীলিমা সরকার, স্বত্বাধিকারী হিসেবে বড় পুত্র স্বরোচিষ সরকার এবং মধ্যম পুত্র সব্যসাচী সরকারের নাম ছাপা হয়। বইটিতে হরিচাঁদ ঠাকুরের কীর্তিগাথার মোট তিনটি উপাখ্যানকে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে উপস্থাপন করা হয়। কাহিনি তিনটির একটি ছিল 'হরিলীলামৃত' গ্রন্থের রচয়িতা তারকচন্দ্র সরকারের ভ্রান্তিমোচন প্রসঙ্গ, একটি কাহিনিতে

---

২৫. স্বরোচিষ সরকার "বাগেরহাটের লোককবি স্বরূপেন্দু সরকারের কবিয়াল-জীবন ও তাঁর গান", *স্থানীয় ইতিহাস পত্রিকা*, (রাজশাহী : জুন ২০০৯), পৃষ্ঠা ১৫২

২৬. বর্তমান গবেষক কর্তৃক গৃহীত স্বরূপেন্দু সরকারের পুত্র ড. স্বরোচিষ সরকারের সাক্ষাৎকার।

২৭. স্বরোচিষ সরকার, "বাগেরহাটের লোককবি স্বরূপেন্দু সরকারের কবিয়াল-জীবন ও তাঁর গান", *স্থানীয় ইতিহাস পত্রিকা* (রাজশাহী : জুন ২০০৯), পৃষ্ঠা ১৬৫

ছিল মুসলমান তিনকড়ি মিয়ার মতুয়া ধর্ম গ্রহণের বিষয়, এবং একটি কাহিনিতে ছিল হরিচাঁদের আশীর্বাদে গোপাল সাধু কর্তৃক অলকারে জীবনলাভের প্রসঙ্গ। এছাড়া প্রথমদিকে একটি বন্দনা এবং শেষদিকে পাঁচালী পাঠের মাহাত্ম্যও বইটিতে যুক্ত ছিল।

বইটির উৎসর্গপত্রে লেখা হয় :

"হে পরম দয়াল হরিচাঁদ
তুমি দেহ সুর ও ছন্দ বাজাই আমি বাঁশি
তোমার সৃষ্টি তুমি নিলে বড়ই ভালোবাসি– দাসানুদাস স্বরূপেন্দু।"

উৎসর্গ পৃষ্ঠার নিচের দিকে শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ মিশনের পক্ষ থেকে শ্রীশ্রীশচীপতি ঠাকুরের একটি আজ্ঞাপত্র মুদ্রিত হয়েছিল। পঞ্চম সংস্করণটিকে বলা যেতে পারে পরিমার্জিত সংস্করণ। এই সংস্করণে 'মতুয়ার ত্রয়োস্ত্রিংশৎ স্তোত্র' নামে একটি বন্দনা যুক্ত হয়। নামকরণেও খানিকটা পরিবর্তন আসে, লেখা হয় 'পূর্ণব্রহ্ম শ্রীশ্রীহরিঠাকুরের পাঁচালী'। স্বরূপেন্দু সরকারের কনিষ্ঠ পুত্রের প্রতিষ্ঠিত নীলিমা প্রকাশনার নামে এটি বরিশাল থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে হরিচাঁদের পূর্ণব্রহ্মত্বের প্রমাণ সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করেন :

"হরিচাঁদ যে পূর্ণব্রহ্ম জেনে লহ মর্ম।
চারি শক্তি নিয়োজিত তাহে পূর্ণব্রহ্ম ॥
গোলকে বৈকুণ্ঠে ক্ষীরোদ আর বাসুদেব।
এই চারি শক্তি পূর্ণ ব্রহ্মের হিসেব ॥
অন্য অবতারে ভবে ইহা কেহ নয়।
হরিচাঁদ আসল হরি এ কারণে কয় ॥"[২৮]

স্বরূপেন্দু সরকারের দ্বিতীয় বইয়ের নাম 'ভাটির নাইয়া'। ১৯৬৫ সালে বরিশাল থেকে বইটি ছাপানো হয়। বইয়ের প্রকাশক ছিলেন তাঁর স্ত্রী নীলিমা সরকার, স্বত্বাধিকারী হিসেবে বড় পুত্র স্বরোচিষ সরকার এবং মধ্যম পুত্র সব্যসাচী সরকারের নাম ছাপা হয়। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে স্বরূপেন্দু সরকারের স্ত্রী নীলিমা সরকারকে। বইয়ের মুখবন্ধের পরপরই মুদ্রিত হয় পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীনের একটি পত্র। পত্রটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু তাতে স্বরূপেন্দু সরকারের গানকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে মূল্যায়ন করা হয়েছে। চিঠির এক অংশে জসীমউদ্‌দীন লিখেছেন :

> "তোমার বিচ্ছেদ গান আমার এত ভাল লেগেছে যা অন্য কারো গানে আজ পর্যন্ত পাই নাই, তাই তোমার প্রেরিত কবিতা বাদ দিয়ে বিচ্ছেদ গানই ছাপতে দিয়েছিলাম।"

তাছাড়া 'হরিভক্তরে তোমরা আমায় যেয়ো না ভুলে' শিরোনামে অনন্ত মজুমদারের একটি গানও প্রথম সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ২০০৪ সালে রাজশাহী থেকে 'কঙ্কাপ্রকাশ' নামের প্রকাশনা সংস্থার নামে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মুদ্রণশিল্পের সুবিধার কারণে গানের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় আরও বেশি। দ্বিতীয় সংস্করণে সংকলিত হয় মোট ১৫৫টি গান। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় স্বরূপেন্দু সরকার নিজেই দাবি করেন যে, এই সংকলনে 'দেহতত্ত্ব, বিচ্ছেদ, মনঃশিক্ষা, পল্লীগীতি, ইসলামি গজল, নারীশিক্ষা, লোকশিক্ষা, মতুয়াগীতি' প্রভৃতি ধরনের গান স্থান পেয়েছে। এই গানগুলো প্রধানত ধুয়া গান, যা কবিগানের পাঁচালি বলা তথা ছড়া-কাটার ফাঁকে ফাঁকে পরিবেশিত হয়ে থাকে। তিনি আরো জানান যে, তাঁর এইসব গান মতুয়া, সৎসঙ্গী, বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, আর্যধর্মী, মুরশিদি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে পরিবেশিত হয়ে থাকে। এই বইয়ে মুদ্রিতএকটি গানের আংশিক উল্লেখ করা হল :

"ভবের হাটে দোকান পেতে সার হলো বেচাকেনা
জীবনে কি লোকসান হলো বুঝলি না মোনা।
দিলি জিরার দরে হীরা মনি, কাঁচের বিনিময় সোনা ॥"

---

২৮. বর্তমান গবেষক কর্তৃক গৃহীত স্বরূপেন্দু সরকারের পুত্র ড. স্বরোচিষ সরকারের সাক্ষাৎকার।

এই গানটি ঢাকার বিখ্যাত গায়কদল ফিডব্যাক (মাকসুদুর রহমানের নেতৃত্বে) তাঁদের একটি অ্যালবামে প্রকাশ করেছে এবং একাধিকবার তা বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত হয়েছে। স্বরূপেন্দু সরকারের কনিষ্ঠ পুত্র স্বয়ম্ভু সরকার বরিশাল বেতারে এই বইয়ের অনেকগুলো গান বিভিন্ন সময়ে পরিবেশন করে থাকেন। স্বয়ম্ভু সরকার বরিশাল গণশিল্পীর একজন সংগঠক এবং সংগীতশিক্ষক। তাঁর প্রযোজনায় অনেক সংগীতানুষ্ঠানেও স্বরূপেন্দু সরকারের রচিত গান পরিবেশিত হয়।[২৯]এই গ্রন্থের আরো একটি বিচ্ছেদী গানের কথা আংশিক তুলে ধরা হল :

"আমি আর কত কাঁদিব তোমার আশায় পথ চেয়ে গো।
এলো মোর জীবনের দিগন্ত রেখা কালো মেঘে ছেয়ে গো ॥

আসার আশে কেঁদে কেঁদে ঘোর হলো দু আঁখি
আরো মোরে কাঁদাইতে আছে নাকি বাকি।
আমারে কাঁদায়ে যদি, সুখে থাক নিরবধি
আমি সারাজীবন যেন কাদি, তোমাকে না পেয়ে গো ॥"

স্বরূপেন্দু সরকারের তৃতীয় বইয়ের নাম 'ঠাকুর এলো মোদের ঘরে'। এটি ১৯৬৬ সালে ওড়াকান্দির মতুয়া প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এটিকে পুস্তিকা বলাই ভালো, কারণ এটি মাত্র এক ফর্মার একটি বই। বইটি ছিল পঞ্চাশটি বর্ণের প্রতিটির আদ্যক্ষর দিয়ে লেখা পঞ্চাশটি ছড়ার সংকলন। ছড়াগুলোতে প্রধানত মতুয়া আদর্শের প্রতিফলন ঘটানো হয়েছিল এবং বিশেষভাবে অংশুপতি ঠাকুরের আধ্যাত্মিক শক্তির কথাও ব্যাখ্যা করা হয়েছিল।[৩০]

স্বরূপেন্দু সরকারের চতুর্থ বইয়ের নাম 'মহালক্ষ্মী শ্রীশ্রী শান্তিদেবীর পাঁচালী'। এর প্রকাশকাল ১৯৯৮। এর প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছেন চরবানিয়ারি গ্রামের মাখনলাল মণ্ডল। চার রঙের প্রচ্ছদ বিশিষ্ট বইটি ঢাকা থেকে মুদ্রিত হয়। এই পাঁচালি গ্রন্থেরও কাহিনি মূলত তিনটি: একটি হল গৌর অবতারে শান্তিমাতার বৃত্তান্ত, একটি হল মহালক্ষ্মী হিসেবে শান্তিমাতার আবির্ভাবের কাহিনি, এবং একটি হল কৃষ্ণকান্ত সরকারের উদ্যোগে অশ্বিনী গোঁসাইয়ের মহালক্ষ্মী পূজার কাহিনি। বন্দনা, মাহাত্ম্য প্রভৃতি অংশ ছাড়াও এতে রয়েছে 'স্বর ও ব্যঞ্জনে ভজনের পথ' নামক একটি অংশ। 'মহালক্ষ্মী শ্রীশ্রী শান্তিদেবীর পাঁচালী' বইটির পুরোটা পয়ার ছন্দে রচিত। বইটি শান্তিদেবীকেই উৎসর্গীকৃত। এই গ্রন্থের গৌর অবতারের কাহিনি আংশিক তুলে ধরা হল :

"মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য হইয়া সন্ন্যাসী
দেশ দেশান্তরে ঘুরে হলো ব্রজবাসী ॥
শাস্ত্রমতে সন্ন্যাসের রয়েছে বিধান
সন্ন্যাসান্তে বর্ষ পরে হয়ে আগুয়ান ॥"

স্বরূপেন্দু সরকারের পঞ্চম বইয়ের নাম 'পতিতপাবন গুরুচাঁদ'। এটি ২০০০ সালে ঢাকা থেকে মুদ্রিত হয়। প্রকাশক নীলিমা সরকার। প্রচ্ছদ এঁকেছেন হারাধন চক্রবর্তী। উৎসর্গ করা হয়েছে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের অবিসংবাদিত নেতা ও মতুয়া ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক ওড়াকান্দির গুরুচাঁদ ঠাকুরকে (১৮৪৭–১৯৩৭)। বইটির একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখেছেন শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ মতুয়া মিশনের সভাপতি শ্রীপদ্মনাভ ঠাকুর। পয়ার ছন্দে রচিত বইটিতে মোট ১৬টি পরিচ্ছেদ রয়েছে। এর মধ্যে অন্তত ১০টি পরিচ্ছেদ গুরুচাঁদ ঠাকুরের কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত। একটি পরিচ্ছেদ গুরুচাঁদ বন্দনা। এছাড়া অন্য পরিচ্ছেদগুলো মতুয়া ধর্ম সম্পর্কিত বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচিত। এই বইটিতে লেখক

২৯. বর্তমান গবেষক কর্তৃক গৃহীত স্বরূপেন্দু সরকারের পুত্র ড. স্বরোচিষ সরকারের সাক্ষাৎকার।
৩০. বর্তমান গবেষক কর্তৃক গৃহীত স্বরূপেন্দু সরকারের পুত্র ড. স্বরোচিষ সরকারের সাক্ষাৎকার।

মতুয়া কাহিনি ও মতুয়া দর্শন বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।[৩১] এই গ্রন্থের মতুয়া আদর্শের কথা নিম্নে তুলে ধরা হল :

"জল অচলকে চল করিতে গুরুচাঁদ কয় ডাকি।
নির্যাতিতের দল কতোকাল ঝরাবি দুই আঁখি ॥
মতুয়া আদর্শে তোরা আয় সকলে ছুটে।
বর্ণভেদের বেড়া এবার যাবে সকল টুটে ॥"

স্বরূপেন্দু সরকারের ষষ্ঠ গ্রন্থ 'সমাজ সংস্কারে মতুয়া'। বইটি ২০০১ সালে প্রকাশিত হয়। এটি একটি গদ্যগ্রন্থ। বইটির প্রকাশক রাজশাহীর 'কঙ্কা প্রকাশনী' হলেও এটি মুদ্রিত হয় বরিশাল থেকে। প্রচ্ছদে অঙ্কিত ছবিটি বিদ্রোহব্যঞ্জক। প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অঙ্কন করেছেন স্বয়ম্ভু সরকার ও জগন্নাথ দে। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে বাংলাদেশ ও ভারতের সনাতন ধর্মাবলম্বী সর্বস্তরের জনগণের করকমলে। বইটি মোট দুইটি পর্বে বিভক্ত; যদিও পর্ব বা অংশগুলোর নাম দিয়েছেন লেখক 'আলোক'। বইটিতে মতুয়া ধর্মকে স্বতন্ত্র একটি ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা রয়েছে। বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই বইয়ে উপস্থাপিত কিছু প্রস্তাব হিন্দু সমাজে বিশেষভাবে নমঃশূদ্র সমাজে বিশেষ বিতর্ক সৃষ্টি করে। বইটিতে উপস্থাপিত এই অভিনব মতামতকে সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন ওড়াকান্দির শ্রীহরিগুরুচাঁদ মতুয়া মিশনের সভাপতি শ্রীপদ্মনাভ ঠাকুর। বইটি যেহেতু ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি করে, তাই এর সূচিপত্রের মূল অংশগুলোর উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথম আলোকে রয়েছে: ১. পূজা, ২. দুর্গাপূজার তাত্ত্বিক অর্থ, ৩. যজ্ঞ, ৪. দশবিধ সংস্কার, ৫. মতুয়ার বিবাহ পদ্ধতি, ৬. ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব গুরুর দীক্ষা, ৭. গায়ত্রী তত্ত্বের আলোচনা, ৮. কালীপূজায় পাঁঠাকে দীক্ষা দান, ৯. মতুয়ার দীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি, ১০. শ্রীশ্রীগুরুচাঁদের আদর্শ ও দশম আজ্ঞা, ১১. কলির তারকব্রহ্ম নাম, ১২. মতুয়াদের শুভকর্ম, ১৩. মতুয়ার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, ১৪. পুরোহিতদর্পণ অনুসারে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, ১৫. মতুয়ার শ্রাদ্ধ। দ্বিতীয় আলোকে রয়েছে: ১. মতুয়া আন্দোলনের ইতিহাস, ২. নমঃর সঙ্গে শূদ্র যুক্ত হলো কেন, ৩. ড. সি. এস. মিডের আগমন, ৪. ভক্ত ঈশানের বাসনা পূরণ, ৫. মতুয়া ধর্মে নারীর মর্যাদা, এবং ৬. শ্রীশ্রী হরিচাঁদের অন্তলীলা।[৩২]

স্বরূপেন্দু সরকারের সপ্তম গ্রন্থ 'ছোটদের ধর্মগ্রন্থ'। প্রকাশকাল ২০০২। এটিরও প্রকাশক রাজশাহীর 'কঙ্কা প্রকাশনী' এবং মুদ্রিত হয়েছে বরিশাল থেকে। বইয়ের প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা করেছেন স্বয়ম্ভু সরকার। বাংলাদেশের স্কুলগুলোতে প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত হিন্দু ছাত্রদের সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে এটি পরিকল্পিত ও প্রণীত। সনাতন হিন্দুদের বিভিন্ন সম্প্রদায়-বিশ্বাসের কথা মনে রেখে বইটিতে পয়ার ছন্দে ১২টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। এই কবিতাগুলোর মধ্যে বিশেষ কয়েকটি কবিতা হল হিন্দুদের সর্বজনগ্রাহ্য এবং সর্বজনপূজিত কয়েকটি গ্রন্থের সারাংশ। এর মধ্যে রয়েছে চণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, চৈতন্যচরিতামৃত, হরিলীলামৃত ও গুরুচাঁদচরিত। অবশিষ্ট পাঁচটি কবিতার শিরোনাম দেখে সেগুলোর বিষয়বস্তু সম্পর্কেও আঁচ করা যায়, এগুলো হল : হরেনাম মাহাত্ম্যমিতি শ্লোকাষ্টকম্, শ্রীশ্রীহরিচাঁদ পূর্ণব্রহ্ম কেন, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ তত্ত্ব, দুর্গাপূজার তাত্ত্বিক বিচার, এবং কালীপূজার তাত্ত্বিক বিচার। বইটিতে রাধাকৃষ্ণ, চৈতন্য, হরিচাঁদ, গুরুচাঁদ, দুর্গা ও কালীর ছবি ছাড়াও আরো বেশ কয়েকটি ধর্মীয় ছবি দিয়ে বইটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছে।[৩৩]

স্বরূপেন্দু সরকারের অষ্টম গ্রন্থের নাম 'পাগল হরিভজন'। এটি বরিশাল থেকে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক নীলিমা প্রকাশনী। এর প্রকাশকাল ২০০৩। বইটি পয়ার ছন্দে লেখা। হরিচাঁদ ঠাকুরের অন্যতম বনবাসী ভক্ত হরিভজন, যিনি জীবনের অধিকাংশ সময় সুন্দরবন অঞ্চলে থেকেছেন এবং ঐ

---

৩১. বর্তমান গবেষক কর্তৃক গৃহীত স্বরূপেন্দু সরকারের পুত্র ড. স্বরোচিষ সরকারের সাক্ষাৎকার।
৩২. বর্তমান গবেষক কর্তৃক গৃহীত স্বরূপেন্দু সরকারের পুত্র ড. স্বরোচিষ সরকারের সাক্ষাৎকার।
৩৩. বর্তমান গবেষক কর্তৃক গৃহীত স্বরূপেন্দু সরকারের পুত্র ড. স্বরোচিষ সরকারের সাক্ষাৎকার।

অঞ্চলের মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন, বইটি প্রকৃতপক্ষে তাঁর একটি জীবনী। এই জীবনী পাঠ করে জানা যায় যে, সুন্দরবনের দক্ষিণে দুবলার চরের বিখ্যাত রাসমেলার তিনিই প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৯২৩ সালের রাসপূর্ণিমায় তিনি এর উদ্বোধন করেন। বর্তমানে এটি বাংলাদেশের অন্যতম একটি পর্যটনকেন্দ্র হিসেবেও পরিচিত হয়ে উঠছে।[৩৪]

স্বরূপেন্দু সরকারের নবম গ্রন্থের নাম 'শ্রীশ্রীহরিচাঁদের জীবনকথা'। গদ্যভাষায় রচিত এটি শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ। প্রকাশক নীলিমা সরকার। গ্রন্থটি রাজশাহী থেকে প্রকাশিত ও মুদ্রিত। প্রকাশকাল ২০০৬। মতুয়া সাহিত্য বিষয়ক যতগুলো গ্রন্থ রয়েছে প্রকাশনা-মানের বিচারে সেগুলোর মধ্যে এটি প্রথম সারির বিবেচ্য। বইটির মধ্যে একটি মানচিত্র, বাসুদেব মূর্তির একটি ছবি এবং হরিচাঁদ ঠাকুরের একটি ছবি মূল পাঠের মধ্যে মুদ্রিত। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে স্বরূপেন্দু সরকারের পিতা কৃষ্ণকান্ত সরকার ওরফে কেষ্ট গোঁসাইকে।[৩৫] স্বরূপেন্দু সরকারের এই জীবনীটি প্রকাশ হওয়ায় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণও মতুয়া ধর্ম সম্পর্কে সহজে জানার একটি সুযোগ লাভ করেছেন।

স্বরূপেন্দু সরকারের দশম গ্রন্থ 'পতিতের বান্ধব'। বইটির প্রকাশক নীলিমা সরকার এবং রাজশাহীর 'কঙ্কা প্রকাশনী' থেকে প্রকাশিত হয়। বইটি ২০০৯ সালে প্রকাশিত হয়। প্রকাশিতব্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে সর্বাগ্রে স্মরণীয় 'পতিতের বান্ধব'। গ্রন্থটি কাব্যাকারে রচিত। এটি মূলত বিখ্যাত মতুয়াভক্তদের জীবনী, যাঁরা বিশেষ আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী ছিলেন।[৩৬]এই গ্রন্থে হরিচাঁদ ঠাকুর, গুরুচাঁদ ঠাকুর এবং মতুয়াভক্তবৃন্দের শক্তির প্রকাশ হিসেবে কিছু অলৌকিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। এই বইটির বন্দনার কিছু অংশ তুলে ধরা হল :

"নমঃ ভগবতে বাসুদেবায় রামকান্তায় নমোঃ নমোঃ।
দেহি মে পাদপঙ্কজং কৃপাং কুরু দীনহীনে ॥
নমোঃ যশোবন্তং সুতং হরি অন্নপূর্ণা গর্ভজাতং
কলৌ কল্মষনাশা ক্ষীরোদার্ণব সম্ভূতং॥"

'পতিতের বান্ধব' বইটিতে হরিচাঁদ ঠাকুরের মূল উদ্দেশ্য স্বরূপেন্দু সরকার কাব্যিক ভাষায় উপস্থাপন করেন–

"হরিচাঁদের মূল উদ্দেশ্য পতিত উদ্ধার।
বর্ণভেদের বেড়া ভেঙ্গে মানব ধর্ম সার ॥
গার্হস্থ্য প্রশস্ত ধর্মে হও গৃহী-সন্ন্যাসী।
শিক্ষার আলো জ্বেলে ঘরে ঘুচুক আঁধার রাশি ॥
কারিগরি বিদ্যা শিখে বাণিজ্যে দাও মন।
স্বাস্থ্যহীনে হয় না কভু ঈশ্বর ভজন ॥
বেদাচারের গণ্ডি হতে বাহিরে না এলে।
ছোয়াছুয়ির ঘৃণ্য বৃত্তি দিতে নারে ফেলে ॥"

'মতুয়া আউল' নামে স্বরূপেন্দু সরকারের একটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে, যাতে মতুয়া ধর্ম বিষয়ক অনেকগুলো গান সংকলিত আছে। এর মধ্য থেকে কয়েকটি গান 'ভাটির নাইয়া' দ্বিতীয় সংস্করণে মুদ্রিত হয়েছে, তবে আরো প্রায় পঞ্চাশটি গান পাণ্ডুলিপিতে অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে। গ্রন্থটি মুদ্রিত হলে মতুয়া সাহিত্য হিসেবে তা বেশ সমাদর লাভ করবে এমন আশা করা যায়। বইটি একবার

৩৪. বর্তমান গবেষক কর্তৃক গৃহীত স্বরূপেন্দু সরকারের পুত্র ড. স্বরোচিষ সরকারের সাক্ষাৎকার।
৩৫. বর্তমান গবেষক কর্তৃক গৃহীত স্বরূপেন্দু সরকারের পুত্র ড. স্বরোচিষ সরকারের সাক্ষাৎকার।
৩৬. বর্তমান গবেষক কর্তৃক গৃহীত স্বরূপেন্দু সরকারের পুত্র ড. স্বরোচিষ সরকারের সাক্ষাৎকার।

প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু অর্থাভাবে তা সম্ভব হয়নি। চারণকবি বিজয়কৃষ্ণ সরকার বইটির একটি ভূমিকা লিখেছেন। সেই ভূমিকা লিখতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন,

> "শাস্ত্রে আছে ধ্যানাৎ পরতরং জপং জপাৎ পরতরং জ্ঞানং, জ্ঞানাৎ পরতরং গানং, গানাৎ পরতরং নহিঃ। তাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও সমস্বরে বলেছেন, ধ্যান করে যাঁর চরণ না পাই, গান গেয়ে তাঁর পা ছুঁয়ে যাই। সেই সাধনমার্গের গানই পাবেন এই মতুয়া আউলের প্রতিটি পৃষ্ঠায়।"

স্বরূপেন্দু সরকারের অন্য একটি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির নাম 'যিশু কথামৃত'। মংলার ফাদার রিগান এই পাণ্ডুলিপিটি পাঠ করে বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন এবং এটিকে ইতালীয় ভাষায় অনুবাদ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। এছাড়া স্বরূপেন্দু সরকারের রচিত বিভিন্ন ধরনের কবিগান অপ্রকাশিত অবস্থায় রয়েছে।[৩৭]

পুরস্কার ও সংবর্ধনা লাভ

কবিগানের আসরের প্রশংসা ছাড়াও তিনি অজস্র সম্মান ও স্বীকৃতি লাভ করেছেন।১৯৭৯ সালে বাগেরহাট জেলার মোরেলগঞ্জ থানার রাজপুর গ্রামের একটি মতুয়া সম্মেলনে স্বরূপেন্দু সরকারকে 'কবিসিন্ধু' উপাধি দান করা হয়। ২০০৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বীরেন্দ্র স্মৃতি সংসদের পক্ষ থেকে স্বরূপেন্দু সরকারকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয় এবং সেই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মানপত্রে তাঁকে 'কবিসুরশ্রী' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। মানপত্রের শেষ দুটি বাক্য ছিল এমন :

> "হে কবিসাধক, তোমার সাধনা বিফলে যাওয়ার নয়
> তুমি আমাদের 'কবিসুরশ্রী' এই হোক পরিচয়।"

মানপত্রটি রচনা করেছিলেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ড. তপন বাগচী। ২০০৮ সালের ২৮ জুন ঢাকার ফার্মগেট খ্রিস্টান চার্চ কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ মতুয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত মতুয়া মহাসম্মেলনে স্বরূপেন্দু সরকারকে 'মতুয়ারত্ন' উপাধিতে ভূষিত করা হয় এবং বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মন্ত্রীপদমর্যাদার একজন ব্যক্তির (প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মানিকলাল সমদ্দার) হাত থেকে তিনি প্রাসঙ্গিক মানপত্র ও পদক গ্রহণ করেন।[৩৮]

স্বরূপেন্দু সরকারের গান

প্রকৃতিগত কারণে কবিগানের মধ্যে পরিবেশিত কয়েক ধরনের গান পূর্বরচিত থাকে। বিশেষভাবে চাপান হিসেবে প্রয়োগের জন্য কবিয়ালগণ ডাক, মালশি, সখীসংবাদ, কবি ও টপ্পা শ্রেণির গানগুলো পূর্বেই রচনা করে রাখেন। অনেক কবিয়াল অন্যের রচিত এই শ্রেণির গানও চাপান হিসেবে পরিবেশন করে থাকেন। স্বরূপেন্দু সরকার কখনো অন্যের রচিত গান চাপান হিসেবে পরিবেশন করতেন না। সঙ্গত কারণেই ডাক, মালশি, সখীসংবাদ ও কবি শ্রেণির প্রচুরসংখ্যক গান স্বরূপেন্দু সরকারকে রচনা করতে হয়েছে। তবে বিশ শতকের শেষার্ধে এই জাতীয় গানের জনপ্রিয়তা ক্রমান্বয়ে কমে আসতে শুরু করায় তারকচন্দ্র সরকার (১৮৪৫-১৯১৪), হরিচরণ আচার্য (১৯৬১-১৯১৪), রাজেন্দ্রনাথ সরকার, নকুল দত্ত প্রমুখের রচিত গানের তুলনায় তাঁর গানের সংখ্যা তুলনামূলক কম। তবে এই শ্রেণির গান রচনায় তিনি তাঁর সমকালীন অন্য খ্যাতিমান কবিয়াল বিজয়কৃষ্ণ সরকার, নিশিকান্ত সরকার, রসিককৃষ্ণ সরকার, অনাদিজ্ঞান সরকার প্রমুখের চেয়ে এগিয়ে আছেন।[৩৯] এখানে স্বরূপেন্দু সরকারের ডাক, মালশি, সখীসংবাদ, কবি এবং টপ্পা শ্রেণির গান উদ্ধৃত করা হল। কবিগানের পাঁচালি অংশের ফাঁকে ফাঁকে ধুয়া জাতীয় যেসব গান পরিবেশিত হয়, সেই ধুয়া গানেরও উদ্ধৃত করা হল।

---

৩৭. বর্তমান গবেষক কর্তৃক গৃহীত স্বরূপেন্দু সরকারের পুত্র ড. স্বরোচিষ সরকারের সাক্ষাৎকার।

৩৮. স্বরোচিষ সরকার, "বাগেরহাটের লোককবি স্বরূপেন্দু সরকারের কবিয়াল-জীবন ও তাঁর গান", *স্থানীয় ইতিহাস পত্রিকা* (রাজশাহী : জুন ২০০৯), পৃষ্ঠা ১৫৩

৩৯. স্বরোচিষ সরকার, "বাগেরহাটের লোককবি স্বরূপেন্দু সরকারের কবিয়াল-জীবন ও তাঁর গান", *স্থানীয় ইতিহাস পত্রিকা* (রাজশাহী : জুন ২০০৯), পৃষ্ঠা ১৬৭

উদ্ধৃত গানগুলো পরিবেশনের সময়ে লোককবি স্বরূপেন্দু সরকার যখন নিজে তা পরিবেশন করেন অথবা দোহারদের দিয়ে তা পরিবেশন করান, তখন তার মধ্যে এক ধরনের নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। লোককবি স্বরূপেন্দু সরকারকে মূল্যায়ন করতে তাই গানগুলোর সঙ্গে কবিগানের সামগ্রিক উপস্থাপনের বিষয়টিও বিবেচনাযোগ্য।

ক. ডাক গান

"ও মা উমাপতি জায়া শ্যামা মহামায়া লহো মা প্রণাম মোর।
তব এ দীন পূজারি দিতে কিছু নারি বিনে দুটি আঁখি লোর ॥
অতি হতভাগা সন্তান তোমার ব্যথা বুকে দ্বারে করে হাহাকার
তব কৃপা বিনে শকতি কি আর নাশে তারই তম ঘোর।
প্রতি পদে পদে সম্পদে বিপদে কতো অপরাধ করি তব পদে
সর্বংসহা সবই সহ নির্বিবাদে বুঝে নাকো এ পামর ॥

আমি আর কতো কাঁদিব মা বলো না, সহিতে না পারি এতো ছলনা
কাঁদাবে যদি আমারে শক্তি দিয়ো সহিবারে বারে বারে ঘোর আঁধারে ফেলো না।
এতোটা বেদনা দিলে তবে কেন পুত্র বলে পরিচয় দেহ ভব-ললনা
সন্তান যদি না থাকে মা কবে মা কে তোমাকে আজিকে আমাকে তাহা বলো না?
স্বরূপ কহে ও মা কালী কাঁদালি তো চিরকালই তবু তো মনের কালি গেলো না
সুখ যদি কাঁদায়ে তব কাঁদাও আমি কাঁদিব, তবু ও কামনা মোরে ভুলো না ॥"[৪০]

২

"মা তুই দিসনে কেন সাড়া গো মা তুই দিসনে কেন সাড়া।
শুধু কি তুই মাটির মা-টি, খাঁটি নাই, কিছু খড়কুটা ছাড়া ॥
মা মা বলে ডাকলেম কতো, তবু সাড়া পেলেম না তো
মা ও ছেলের সম্পর্ক তো এ নহে তারা
তোর বরাভয় কি মিছে নাকি, সত্য কি মুণ্ড আর খাঁড়া।
শুনেছি তুই পাষাণীর কন্যে, বুঝি শুনতে পাস না ডাক সেই জন্যে
মা হয়ে ছেলের সৌজন্যে এ কেমন ধারা।
এবার না শুনলে ডাক হবি অবাক, তোরে ডাকবো না রাক্ষসী ছাড়া ॥
মা হতে কে বলেছিল হবে তোর কহিতে
সন্তানের যন্ত্রণা যদি পারবে না সহিতে
শনি কুপুত্র হয় বহুতর কুমাতা নয় মহীতে।
মা ইচ্ছাময়ী তুই ইচ্ছা করে, আনলি এ সংসারের মোরে
ত্রিতাপ জ্বালায় শুধু কি দহিতে
তাতে কে করে ভয় দিলে অভয় শিরে শকতি বহিতে।
মা বাবাকে তো হাবা পেয়ে পাড়াতেছিস ভয় দেখায়ে
লোকলাজে মুখ বুঁজে হয় সহিতে
কিন্তু ভুলিস না মা, মা গুণে ছা, হবে তোর স্বরূপে রহিতে ॥"[৪১]

---

৪০. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ২৭০

৪১. স্বরোচিষ সরকার, "বাগেরহাটের লোককবি স্বরূপেন্দু সরকারের কবিয়াল-জীবন ও তাঁর গান", *স্থানীয় ইতিহাস পত্রিকা* (রাজশাহী : জুন ২০০৯), পৃষ্ঠা ১৬৮

খ. মালশি গান

১

"চিতান মহামায়া কেটে মোহমায়া পদছায়া দেহ মা সন্তানে।
মাগো পেতে নিত্য বৃন্দাবন অকারণ ভজন-সাধন ত্রিভুবনে কে পায় কখন
তোর বিনা প্রেম প্রদানে ॥

ফুকার মা তুই মূলাধারে কুণ্ডলিনী প্রেমভক্তি প্রদায়িনী জানে সর্বলোক
আমার নাই দেখার সে চোখ, মা মাগো
করে ক'রে জ্ঞানের অসি আমার কালের বুকে দাঁড়া আসি
শেষে কেটে দে মোর অমানিশি পসুক আসি প্রেম সূর্যের আলোক ॥

মিশ কেউ তোরে না ডাকিলে কোনো কালে পায় না বিশ্বমাঝ
মা হয়ে কি করে না লাজ, সতাসত বিচার সুতে ॥

মুখ কী তোরে বলবো ও মা মাগো তুই তো মা সৎ নহিস সৎমা ভূর্ভুবঃস্বঃতে ॥

প্যাঁচ সুষুম্নায় বজ্রাখ্যা চিত্রিণী ভেদি আচে ব্রহ্মমুখে ব্রহ্মার বেদি
তৎসহ রয়েছে ডাকিনী
ভক্তে চিরকাল ডাকিছে কভু ভক্তকে ডাকোনি।
তাঁহার ঢাকনি ত্রৈপুর যন্তরের তুমি তার অভ্যন্তরে
পিয়ে সুধাদীপ্তি তোর অন্তরে না কাঁদলে যেতে দিসনে সে পথে ॥

মুখ কী তোরে বলবো ও মা মাগো তুই তো মা সৎ নহিস সৎমা ভূর্ভুবঃস্বঃতে ॥

খোচ বাক্য কাব্য প্রবন্ধ লাভ যদি কেহ সেবতে ॥

ফুকার মা তুই প্রথম দ্বার ছাড়বি যদি উঠে স্বাধিষ্ঠানের গচি হলে অধিষ্ঠান
জীব পেয়ে রাকিণীর সন্ধান, মা মাগো
তথা হতে মণিপুরে পেয়ে বৃদ্ধ ত্রিলোচনাসুরে যাবে অজ্ঞান তামসী দূরে
ক'রে তিকোণে লাকিনী শ্যামার ধ্যান ॥

মিশ ভোলা প্রলয় শিঙ্গা করে অজপার ঘরে
কাকিনীরূপ তুমি ধ'রে জানালম না অনাহতে ॥

মুখ কী তোরে বলবো ও মা মাগো তুই তো মা সৎ নহিস সৎমা ভূভূবঃস্বঃতে ॥

অন্তরা বলো না মা ও মা শ্যামা তোমা পূজে হবে বা কি?
মাগো বাজলে ভোলার প্রলয় বিষাণ স্বরূপে বইতে পারো নাকি?
হংসরূপে দুজনাতে দ্বন্দ্ব করো দিবারাতে
জীবাত্মা পরমাত্মাতে করতে মাখামাখি।
কিন্তু একুশ হাজার ছশো বিংশতিতে ফুরায় শুভঙ্করের ফাঁকি।
তবে যদি খাবি পূজা মাগো পারের তরী সাজা
তোর ছেলে মা হলে রাজা তোর দুঃখ নাকি?
শেষে পার করলে নদী বিরজা রাখবো না পাড়ের কড়ি বাকি ॥

চিতান সবে জেনো খাঁটি এ দেহটি পরিপাটি পনেরো পোয়াতে
যে চোদ্দ পোয়া করলো সার সে কহে সংসার সং সার
যদি চাহো সোহং সার চড়ো সুষুম্নার খেয়াতে ॥

ফুকার মা তুই আদ্যাশক্তি জগদ্ধাত্রী সৃষ্টি স্থিতি সংহারকর্ত্রী ভবানী শিবানী
মূকের মখে ফুটাস বাণী, মা মাগো
মোর উপায় কহো বিচারি, আমি যে ঘোর ব্যভিচারী
থেকে ব্রহ্মে নহি ব্রহ্মচারী, চিনির বলদ চিনির বস্তা টানি ॥

মিশ করি কৃতাঞ্জলি জলাঞ্জলি সব দিলাম তোর পায়
অধম নিরুপায় স্বরূপের উপায় করো মা স্বরূপেতে ॥
মুখ কী তোরে বলবো ও মা মাগো তুই তো মা সৎ নহিস সৎমা ভূর্ভুবঃস্বঃতে ॥"[৪২]

গ. সখীসংবাদ গান

১

"চিতান একদিন শ্রীরাধিকা কুঞ্জবাসে আঁখি মুদি ভাবাবেশে
কভু কাঁদে কিছু হাসে মনপ্রাণ আকুল।
হেনকালে আসি ললিতে লাগিল সে বলিতে
রাধে লো তুই চলিতে পথ করেছিস ভুল ॥
ফুকার রাধে যাহার লাগি আহার ত্যাগী কাঁদিস একাকিনী
ও তুই জানিস না সে তোরে নিয়ে খেলছে ছিনিমিনি, হায় হায় হায়
ব্রজপুরী পরিহরি, মথুরায় গিয়াছে হরি
আবার কুব্জা রেখেছে ধরি ঐশ্বর্যেতে কিনি ॥
মিশ শুনে সুখীর মুখে শ্রীরাধিকা এ হেন সংবাদ
ভেঙে গিয়ে অন্তরের বাঁধ প্রাণে জাগে হা-হুতাশ ॥
মুখ ললিতা ও ললিতা শুনাইলি যে বারতা হয় না তা বিশ্বাস ॥
প্যাঁচ শ্রীমুখ নিঃসৃত বাক্যং বৃন্দাবন পরিত্যজ্যং
ন গচ্ছামি পাদমেকং জানো নাকি ললিতে।
শ্রীকৃষ্ণ মুখনিঃসৃত, মিথ্যা কভু হবার নাতো
যদিও হয় আমি তাতো মুখে নারি বলিতে ॥
মিশ প্রেমের ধর্ম ভক্তি বিশ্বাস জানি বিলক্ষণ
রাধার এ রবে ততোক্ষণ যতোক্ষণে আছে শ্বাস ॥
মুখ ললিতা ও ললিতা শুনাইলি যে বারতা হয় না তা বিশ্বাস ॥
খোচ চিন্তা কি যার চিত্ত বিত্ত পিরিত মূল্যে খাস ॥
ফুকার সখী তবে কেন ভুলাতে চাস আমাকে অযথা
জানি ধেনুবৎস হতে তারে পাবে গুল্মলতা, হায় হায় হায়
চিত্তহারী বংশীধারী যে দেয় তারে ভক্তিবারি
তাহারে সে যায় না ছাড়ি তার সনে কয় কথা ॥
মিশ আমা হতে তোরা যারা গুণশালিনী
পাবি তারা নীলমণি অবিশ্বাসীর হাহুতাশ ॥
মুখ ললিতা ও ললিতা শুনাইলি যে বারতা হয় না তা বিশ্বাস ॥
অন্তরা হারে বলো না ললিতা, কোথা কেমন করে যাবে কালা
আমি নিত্য যারে চিত্তে সাজাই দিয়ে বনফুলের মালা।
হারে ও সখীরে, বন্ধু আমার যাবে যথা আমাকেও নিবে তথা
এ কথা নহে অন্যথা কহে নন্দলালা।
ইহার অন্য হবে, দেখবে যবে বাসী হবে আমার ফুলমালা।
হারে ও সখীরে
যেমন উঠে নাকো পাষাণের দাগ জল কাটিলে হয় না দুভাগ
তেমনি কৃষ্ণ অনুরাগ, নয় ছেলেখেলা
কেমনে শ্যামশুকপাখি দিবে ফাঁকি রাখি নাই তো দুয়ার খোলা ॥

---

৪২. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ২৮১-৯২

চিতান সখী ঐশ্বর্য থাকিতে প্রাণে, বন্ধু বাঁধন নাহি মানে
ললিতা তুই কোন পরাণে বলিলি এমন
জানি যথা পূর্ণ মধুর রস, তথা আমার বধুঁ বশ
রসানাং সমূহ রাস যথা গোপীগণ ॥
ফুকার সখী সাধারণী সামঞ্জসা আর সামর্থা রতি
সখী কোন রতিতে নিত্য বাধা রহে গোকুলপতি, হায় হায় হায়
রাধা ডুবে শ্যামসাগরে ধরতে তায় পারে বীকারে
কিন্তু তোর অবিশ্বাস বধুঁয়ারে তাহে মোর আপত্তি ॥
মিশ তোরা যতো করিস নিন্দে সবই বুঝি ভুল।
বন্ধু কি মোর ছাড়ে গোকুল গলে যাহার প্রীতি ফাঁস ॥
মুখ ললিতা ও ললিতা শুনাইলি যে বারতা হয় না তা বিশ্বাস ॥"[৪৩]

ঘ. কবি গান

১

"চিতান হয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মা-বাবা প্রায় উপেক্ষিত
শিক্ষার আর মূল্য রইলো কই?
কেউ মূর্খ পিতায় চায় না দিতে সত্য পরিচয়
দেখে মনে হয় বাবা ঠিক তালই ॥
ফুকার একজন গরিব লোকের দুটি ছেলে বড়োটি বিএটি পাস
ও তার শ্বশুর মশায় ধনী, জমি বিঘে শ-পঞ্চাশ
হায় লাভ করে শ্বশুরের ভেট পেলো এ সার্টিফিকেট
এখন শ্বশুর বাড়ির কেটে টিকেট, মা-বাবার নেয় না আর তালাশ ॥
মিশ ছেলের পিতা পরের বেগার খেটে দিন আনে দিন খায়
একদিন আষাঢ় মাসের ঘন বর্ষায় কাজ বিনে উপবাসী দিবসভর ॥
মুখ রজনীর অন্ধকারে বুড়ো উপনীত ছেলের ধারে আঁখি ঝরঝর ॥
প্যাঁচ ছেলে সান্ধ্যভোজন অবসানে রয়েছে গিন্নির সনে সুখশয়নে
হতেছে নানা রসের কথা।
দেখে হেনকালে খোলা জানলার ফাঁকে পিতার মাথা।
ছেলে কয় কী হলো লেঠা, বিরক্তিতে জ্বলে গা-টা
বুড়ো তোমাকে এখানে পাঠালো কেটা, আজও কি যম তোমার পায়নি খবর ॥
মুখ রজনীর অন্ধকারে বুড়ো উপনীত ছেলের ধারে আঁখি ঝরঝর ॥
খোচ একটা বাড়ির খোরাক জোগানো এতো কি দুষ্কর ॥
ফুকার তুমি এখনো তো খাটতে পারো, বয়স তো হয়নি বেশি ততো
চুল যা সাদা বায়ুর জোরে নইলে কে বুড়ো কতো।
হায় মাঝে মাঝে টাকা যে চাও বিচারে টাকা কি পাও
পিতার ডিউটি ছাড়া করোনি ফাও, বিএস পাস তুমি করাওনি তো ॥
মিশ আমার শ্বশুর মশায় টাকা দিয়ে পড়ালো আমারে
এখন সাহায্য করবো তোমারে সে বেটার না নিয়ে কি খোঁজখবর ॥
অন্তরা বাবা কী কবো একবার ভাবো, তোমাকে বাবা বলা যায় নাকি।
তোমায় লোকসমাজে বাবা বললে গো কও আমার মানসম্মান থাকে নাকি।
করো অভদ্রের ন্যায় চলাফেরা নাহি কাণ্ডজ্ঞান

---

৪৩. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃষ্ঠা ২৯৭-৯৮

আয়না ধরে দেখো তোমায় দেখায় হনুমান
আমার শ্বশুর সোনার চান।
আমি বাবুর জামাই আরো বিদ্বান গো, মূর্খকে তার বাবা বলা যায় নাকি।
আবার বুড়ির কথা বলবো কোথা, তারও যাহা গুণ
গ্রাজুয়েটের মা লাউকে কয় নাউ লবণকে কয় নুন
ইচ্ছা হয় দুঃখেতে হই খুন।
বুড়ির আবার মাথা-ভরা যেমন উকুন গো
আমার শিক্ষিতা বউ তাই সইতে পারে না কি ॥

চিতান বাবা তোমার চরণ ধরে করি মানা, আমার শ্বশুরবাড়ি আর এসো না
এখনো লোকে জানে নাই।
তোমায় সকালবেলা দেখলে সবে যাবে আমার জাত
শ্বশুরবাড়ির ভাত আমার ভাগ্যে নাই ॥

ফুকার তোমরা লালন-পালন যা করেছো পরকালে শোধ করবো দেনা
কিন্তু বোঝা উচিত বর্তমান তো শ্বশুরের কেনা।
হায় শাস্ত্রের নীতিবাক্যে অস্তি, গতস্য শোচনা নাস্তি
সবই বর্তমানে স্বস্তি স্বস্তি, মূর্খ হয়ে এসব বুঝবে না ॥

মিশ আমার শ্বশুরমশায় টাকা দিয়ে পড়ালো আমারে
এখন সাহায্য করবো তোমারে সে বেটার না নিয়ে কি খোঁজখবর ॥

মুখ রজনীর অন্ধকারে বুড়ো উপনীত ছেলের ধারে আঁখি ঝরঝর ॥"[৪৪]

ঙ. টপ্পা গান

১

"চিতান আমি কল্পনাতে নরেন দত্ত কাব্যগীতিকায়।
তুমি রামকৃষ্ণ পরমহংস বাসনা করেছো ধ্বংস
কালিকার প্রেমের অংশ পেলে রসনায় ॥

অন্তরা তুমি নারী বাড়ি ত্যাগ করিয়া মাটির মূর্তি পূজিছ দক্ষিণেশ্বর।
সাজিলে পর সংসারী কংসারি কি পায় না নারীনর ॥

প্যাঁচ আর কোরান পুরাণ বাইবেল বেদ যাতে বিরাট মতভেদ
কেমনে তাহার করলে একত্তর।
তোমার আজগুবি সব কাণ্ড দেকে আজ আমার ব্যথিত হলো অন্তর ॥

মুখ সাজিলে পর সংসারী কংসারি কি পায় নারীনর ॥"

২

"চিতান অদ্য ধনঞ্জয় টিকাদার আমি কল্পনার ছলে
তুমি ঋত্বিক লুৎফর রহমান, নিজের ধর্মের না দিয়ে সম্মান
কেন সৎসঙ্গের গাও জয়গান মিশে সেই দলে ॥

অন্তরা তোমার অনুকূলচন্দ্রকে কেন সকলে বলো কল্কি অবতার
ব্যাসদেবের কল্কিপুরাণ সৎসঙ্গী কি কর অস্বীকার

প্যাঁচ হিন্দু খ্রিস্টান মুসলমান ধর্মমতে নয় সমান, তোমাদের সব দেখি একাকার
তোমার ধর্মটা খিচুড়ির মতো কিজন্য সৎসঙ্গ নাম দিলে তার।

মুখ ব্যাসদেবের কল্কিপুরাণ সৎসঙ্গী কি করে অস্বীকার ॥"[৪৫]

---

৪৪. স্বরোচিষ সরকার, "বাগেরহাটের লোককবি স্বরূপেন্দু সরকারের কবিয়াল-জীবন ও তাঁর গান", *স্থানীয় ইতিহাস পত্রিকা* (রাজশাহী : জুন ২০০৯), পৃষ্ঠা ১৭৪

চ. ধুয়া গান

"১. ভবের হাটে দোকান পেতে সার হলো বেচাকেনা
জীবনে কী লোকশান হলো বুঝলি না শোনা।
দিলি জিরার দরে হীরামণি কাঁচের বিনিময়ে সোনা ॥

তুই হতে পারিতি মহাজন, নিজের না বুঝে ওজন
অধিক লাভের আশে আসল দিলি রে দাদন।
এর পরিণামে শুধুই কাঁদন, জানিস নারে দিনকানা ॥
আছে জমানো মাল যাহা গুদামে, বেচে দিসনে বেদামে
ফুসলাইবে ছটি দালাল আছে মোকামে।
তারা সর্বক্ষণে ডাইনে বামে করিছে আনাগোনা ॥

পড়িলে দালালের পালাতে কেহ নারে পালাতে
যাদুকরের গুটির মতো পারে চালাতে।
আগে মনলোহা পারলে গালাতে তার দলে ষোলো আনা ॥

স্বরূপ কহে ওহে মোনারাম, আগেসার মনের ব্যারাম
যা আছে সামলায়ে পাবি অন্তিমে আরাম।
হাতে কাজ করিয়া মুখে নে নাম, দেহজমিতে ফলবে সোনা ॥"

২

"জানিতে চাই গোঁসাই তোমার ভগবান কেমন।
তারে কেউ কয় হরি কেউ গড আল্লা চোখে কি দেখে কখন ॥

তোমার সে ঈশ্বরের স্বরূপ কী, সে রূপ আসল না মেকি
শুধু বোকা লোক বুঝাতে কবির কল্পনা নাকি
বুঝি কল্পনার জাল বুনে রাখিয়াছ ঢের নামকরণ ॥

ভাববাদী কি অবতার নবি, যেভাবে আঁকিল ছবি
তাতে বুঝি সবে চাঁদ দেখেছে কেহ দেখেনি রবি।
তাদের এক এক জনের ভাব আজগুবি, ডুবে নাকো জ্ঞানীর মন ॥

কোরান পুরাণ বাইবেল কিংবা বেদ, পড়ে যায় না মনের ক্লেদ
যতো পড়ি ততো গড়ি বিশ্বপ্রেম বিচ্ছেদ।
দেখে সাধু পোপ আর পিরের বিভেদ নাস্তিকতায় ডুবলো মন ॥

স্বরূপ কয় সে রূপ যদি পাবি, জগৎ আপন নে ভাবি
সেবা ধর্মের মাঝে পাবি প্রেমরাজ্যের চাবি।
শেষ মিটবে সকল চাওয়ার দাবি, ঘটবে তোর আত্মদর্শন ॥"[৪৬]

---

৪৫. স্বরোচিষ সরকার, "বাগেরহাটের লোককবি স্বরূপেন্দু সরকারের কবিয়াল-জীবন ও তাঁর গান", *স্থানীয় ইতিহাস পত্রিকা* (রাজশাহী : জুন ২০০৯), পৃষ্ঠা ১৭৬

৪৬. স্বরোচিষ সরকার, "বাগেরহাটের লোককবি স্বরূপেন্দু সরকারের কবিয়াল-জীবন ও তাঁর গান", *স্থানীয় ইতিহাস পত্রিকা* (রাজশাহী : জুন ২০০৯), পৃষ্ঠা ৪৪০-৪১

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলা কবিগানের বর্তমান অবস্থা ও সম্ভাবনা

বর্তমানকালে বাংলাদেশে কবিগানের যে রীতি প্রচলিত তা শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই বিকশিত অবস্থারই অনুরূপ। আঠারো-উনিশ শতকের কবিগানকে বর্তমান শতকে পৌঁছাতে বেশ কিছু আবর্তন-বিবর্তনের পথ অতিক্রম করতে হবে বলে মনে করা যায়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কোলকাতা নগরীর বিত্তশালী নাগরিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় কবিগানের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে উঠলেও, শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে শুরু করে এর জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। কবিগানের পৃষ্ঠপোষণায় অপেক্ষাকৃত সক্ষম বিত্তবান হিন্দুরা দেশত্যাগ করেন, অন্যদিকে কবিগানের বিষয়বস্তু প্রধানত হিন্দু-পুরাণ-ঘেঁষা হওয়ায় পূর্ব-পাকিস্তানে এর প্রসার কমতে শুরু করে। অধিকাংশ প্রতিভাবান কবিয়াল পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেন। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও লক্ষণীয়, পূর্ব-পাকিস্তান থেকে কবিগানের প্রচলন কখনোই একেবারে লোপ পায়নি। বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার পরেও বাংলাদেশের পল্লি-অঞ্চলে, বিশেষত দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে (খুলনা-বরিশাল-যশোর-ফরিদপুর ইত্যাদি জেলায়) প্রচলিত কবিগান গুণগত বা পরিমাণগত উভয় দিক দিয়েই উল্লেখযোগ্য। বর্তমান বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে কবিগান যে অধিক প্রচলিত তার কারণ, এ অঞ্চলে হিন্দু জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি। বস্তুত, আঠারো-উনিশ শতক থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত কবিগানের ইতিহাস বহু আবর্তন-বিবর্তনের ইতিহাস। উক্ত আবর্তন-বিবর্তন ধারার প্রতি লক্ষ্য রেখে অতীতকালের কবিগানের তুলনায় সাম্প্রতিক কালের কবিগান এবং তার বর্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করা দরকার।

আঠারো-উনিশ শতকে কবিগানের যে আঙ্গিক প্রচলিত ছিল, এ সময়ে তার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। তখন কবিগানের যেসব অংশের অধিক গুরুত্ব এবং জনপ্রিয়তা ছিল সময়ের ব্যবধানে তার কিছুটা হ্রাস-বৃদ্ধি হয়তো ঘটেছে। ধনিকশ্রেণির অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়ে এ সময়ে কবিগানের সংগীতসমৃদ্ধ অংশের গুরুত্ব কিছু হ্রাস পায়।

সৃষ্টির পর থেকেই কবিগান অবক্ষয়ের মুখোমুখি। আধুনিক যুগের সূচনায় সৃষ্ট এই গানগুলো স্থূলরুচি বিত্তবান জমিদার শ্রেণির পৃষ্ঠপোষণা লাভে সমর্থ হলেও চল্লিশের দশকের সমাজ সংস্কারকামী ইয়ং বেঙ্গলদের কাছে কবিগান ছিল যাত্রা-পাঁচালী ইত্যাদি মতোই নিকৃষ্ট শ্রেণির বিনোদন-মাধ্যম। পরবর্তীকালে কোলকাতার নগরীর অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে এই মানসিকতা সৃষ্টি হয়। উনিশ শতকের শেষদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো ঐতিহ্যপ্রিয় ব্যক্তিগণ কবিগানের ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার করলেও, এর কোনো স্থায়ী মূল্য স্বীকার করতে রাজি হননি। শিক্ষিতশ্রেণির এই মনোভাব কোলকাতায় কবিগান লালিত হওয়ার পক্ষে নিঃসন্দেহে বাধাস্বরূপ ছিল।

অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত গ্রাম্যরুচির এবং মধ্যযুগীয় চিন্তাপ্রসূত কবিগান যাঁরা উপভোগ করতেন, তাঁরা অধিকাংশই সদ্য গ্রাম থেকে এসেছিলেন। সেইসঙ্গে তাঁরা তাঁদের গ্রাম্য রুচিকেও বহন করে এনে থাকবেন। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংঘাতে পরবর্তী বংশধরদের অধিকতর অনুপ্রাণিত করে বিধায় কবিগান অবহেলিত হয়, কবিয়ালদের পসার কমে এবং ক্রমে কোলকাতা থেকে লুপ্ত হতে শুরু করে।

এরপর কবিগান বাংলাদেশের বিভিন্ন পল্লিতে স্থান করে নেয়। একে বলা যেতে পারে প্রত্যাবর্তন। কিন্তু, যেহেতু যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকের অভাব হয়, স্বাভাবিকভাবে কবিগান ভাবে এবং ভাষায় কিছুটা ঐশ্বর্যহীন হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও এর ধর্মীয় দিক কবিগানের রচনায় সব সময়ে আনুকূল্য করে।

কবিগানের অন্যতম বিষয় শাক্তধর্মীয় হওয়ায় এবং সাধারণত চণ্ডীমণ্ডপের সামনে কবিগান পরিবেশিত হওয়ায় শেষ পর্যন্ত কালীপূজায় কবিগান গাওয়া একটি প্রচলিত প্রথায় পরিণত হয়। ধর্মীয় উৎসবের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটায় কবিগান কখনোই সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতে পারেনি। কবিগানের বিকাশের উপযোগী আর্থ-সামাজিক পটভূমি আপাত দৃষ্টিতে না থাকলেও বিশ শতকের গোড়ার দিকে পুনরায় তার এক অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে। উৎকর্ষের দিক দিয়ে এ সময়ের কবিগানকে অতীতের কবিগানের তুলনায় বরং উন্নততর বলা যায়।

দ্বিজাতিতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে ভারত বিভক্ত হওয়ায় এবং পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে, প্রধানত হিন্দুধর্ম-নির্ভর কবিগানের ওপরে একটি প্রচণ্ড আঘাত আসে। কবিয়ালদের মধ্যে অনেকে নিম্নবর্ণীয় হিন্দু থাকার কারণে সাধারণত উচ্চবর্ণীয় হিন্দুগণ এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অধিকাংশ কবিগানের আসর বসত উচ্চবর্ণীয় হিন্দু-অধ্যুষিত এলাকার চণ্ডীমণ্ডপগুলোতে। দেশ বিভক্ত হওয়ায় উচ্চবিত্ত ও উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের ব্যাপক হারে দেশ-ত্যাগ কবিয়ালদের পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে একটি প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এতে কবিয়ালদের গানের বায়নাই যে শুধু কমে যায়, তাই নয়, পারিশ্রমিকের পরিমাণও মাত্রাতিরিক্ত হ্রাস পায়। পেশা হিসেবে কবিগান রীতিমতো অলাভজনক হয়ে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানের বিপুল জনসংখ্যার ক্ষুদ্র একটি অংশ হিন্দু হওয়ায়, অন্যদিকে পৃষ্ঠপোষক হিন্দুদের অনুপস্থিতিতে কবিগান তখন উভয় বঙ্গেই একই রূপ ধারণ করে। ভাগ্যসন্ধানে কবিয়ালগণ তখন, কখনো পূর্ব-পাকিস্তানে কখনো পশ্চিমবঙ্গে এইভাবে আসা-যাওয়া করতে থাকেন। এমনকি জনপ্রিয় কবিয়াল বিজয় সরকারকে প্রতি বৎসরই এভাবে আসা-যাওয়া করতে হত।

এই সময়ে যাঁরা অপেক্ষাকৃত তরুণ, কিন্তু যথেষ্ট প্রতিভাবান, তাঁদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। অনাদি, রসিক, ছোট রাজেন, স্বরূপ, বিনয়, কবি, কালিদাস সরকারের মতো কবিয়াল, যাঁরা এরকম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও মোটামুটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন, এঁদের ভবিষ্যৎও পুরোপুরি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। নিজস্ব পেশার অপ্রতুলতাহেতু বিজয় সরকার পর্যন্ত কখনো রামায়ণ, কখনো-বা মোসলেম বয়াতী প্রমুখের সঙ্গে জারিগান গাইতেন। বায়না না হওয়ায় এ সময়ে অনেককেই কবিগান গাওয়া ছেড়ে দিতে হয়।

এক সময় কবিয়ালরা সাধারণভাবে জীবন যাপন করতেন। কিন্তু বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় অত্যধিক বেড়ে যাওয়ার ফলে তাঁরা বছরে দু চারটি কবিগানের আসর করে সারা বছর যে টাকা আয় করেন তাতে সংসার চালানো খুবই কঠিন। ফলে গানের মাঝে তাঁদের অন্য পেশায় যেতে হয়, এ কারণে কবিগান অনেকটা বিলুপ্তির পথে। বেশকিছু কবিয়াল কবিগান প্রায় ছেড়ে দিয়ে কৃষিকাজ ইত্যাদি স্ব-স্ব পেশায় পুনরায় ফিরে আসেন। অনেকে আবার অতিরিক্ত পেশা হিসেবে কবিগানকে গ্রহণ করেন। অদ্যাবধি কবিগান কবিয়ালদের অতিরিক্ত পেশা। কবিগান ছাড়া বৎসরের অধিকাংশ সময় তাঁরা কৃষিকাজ, ব্যবসা বা শিক্ষকতা করেন। সবারই পৈতৃক জমি কিছু-না-কিছু থাকায় কৃষিকাজ তাঁদের একটি সাধারণ পেশা। শতাব্দীর গোড়ার দিকে পূর্ববঙ্গের অন্যতম জনপ্রিয় কবিয়াল রাজেন্দ্রনাথ সরকার ফরিদপুরের রাজৈর থানার অন্তর্গত চৌরাশি গ্রামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে ধর্মপ্রচার ও আশ্রম রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং কবিগান একরকম ছেড়েই দেন। বস্তুত, পেশা হিসেবে কবিগানের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করা আর কারো পক্ষেই সম্ভব বলে মনে হয় না।

কবিগানের জনপ্রিয়তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ার পেছনে যুগের এবং মানুষের রুচির পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য। দ্রুত নগরায়ণের ফলে, এমনকি, গ্রামের শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে নাগরিক সংস্কৃতির প্রভাব ব্যাপকভাবে পড়ায় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কবিগান শোনার জন্যে কখনোই তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেন না। অন্যদিকে গ্রাম বা শহরের এই সব শিক্ষিত অর্ধ-শিক্ষিত ব্যক্তিরা একই সঙ্গে অধিকতর ধনী হওয়ায়, কবিয়ালদের প্রতি তাদের অবহেলা কবিগানের দীর্ঘজীবিত্বের অন্তরায় হয়। কবিয়ালগণ যদিও অনেকক্ষেত্রে যুগোপযোগী বিষয়ে গাইতে চেষ্টা করেন, তবু তাঁরা তার শেষরক্ষা করতে পারেন না। এছাড়া বাংলাদেশে ধর্মীয় উন্মাদনার কারণে এ গানের কিছুটা বিলুপ্তি ঘটে।

তাছাড়া আধুনিক বিনোদন মাধ্যম, যেমন, রেডিও, টেলিভিশন, যাত্রা-থিয়েটার ইত্যাদির প্রসারের ফলেও কবিগানের জনপ্রিয়তা পরোক্ষভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ক্রমান্বয়ে কমে আসছে।

এসব কারণেই কবিগানের বর্তমান অবস্থা একটু নাজুক আকার ধারণ করেছে। সংগীতে কবিগান পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবঙ্গে একসময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু বর্তমানে কবিগান শুধু নামেই টিকে আছে। বছরে সারা বাংলাদেশে ৩/৪ টি কবিগানের আসর হয়। পশ্চিমবঙ্গে কবিগানের অবস্থা বাংলাদেশের তুলনায় অনেকটা ভালো।

বাংলাদেশে কবিগানের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করলে বেশকিছু বিষয় আলোচনা উঠে আসে।

বাংলাদেশের সংস্কৃতির তিনটি ধারা রয়েছে, যথা– (১) নগরসংস্কৃতি, (২) গ্রামসংস্কৃতি ও (৩) উপজাতীয় সংস্কৃতি। কিন্তু এসব সংস্কৃতিকে ছাপিয়ে আজ মুখ্য হয়েছে আকাশ-সংস্কৃতি। আকাশ-সংস্কৃতির প্রভাবে আমরা আজ প্রায় ভুলতে বসেছি আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি। এই আকাশ-সংস্কৃতির নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে আমাদের নিজস্ব লোকসংস্কৃতি থেকে আজ আমরা প্রায় বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে। নিজের শেকড়কে না জানালে কোনো জাতির উন্নয়ন সম্ভব হয় না। লোকগান, হস্তশিল্প ও সাহিত্যে আমাদের শেকড় প্রোথিত রয়েছে– তাই লোকসংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে আমাদের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

শহরাঞ্চলের শিশুদের কথা বাদ দিলে গ্রামের শিশুরাও আজ লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান থেকে একপ্রকার বঞ্চিত হতে চলেছে আকাশ-সংস্কৃতির আগ্রাসনে। এই শিশুরা জানে না লোকগান কী, যাত্রা কী, প্রবাদ-প্রবচন কী, পুঁথিপাঠ কী। অথচ এ দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিশাল গ্রামীণ জনগোষ্ঠী নিজস্ব জীবনপ্রণালীর মাধ্যমে শতকের পর শতক ধরে যে বহুমুখী ও বিচিত্রমুখী সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে তা এই জাতির প্রকৃত পরিচয় বহন করে। আমাদের লোকগানের যে বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে সংরক্ষণের অভাবে বর্তমানে তার চর্চা একেবারেই অপ্রতুল।

বাংলা গানের একটি শক্তিশালী এবং ঐতিহ্যবাহী ধারা হচ্ছে লোকসংগীত, যার অন্যতম অঙ্গ কবিগান। কিন্তু আমাদের প্রচলিত মিডিয়াগুলোতে কবিগানের উপস্থিতি আশঙ্কাজনকভাবে কম। আসরের মঞ্চে বা কোনো অনুষ্ঠানে যেসব পেশাদার লোককবি কবিগান পরিবেশন করেন তাঁদেরকে টিভি বা রেডিওতে বর্তমানে প্রায় দেখা যায় না। আমাদের মিডিয়াগুলোতে লোকসংগীতের যতটুকু জায়গা হওয়া প্রয়োজন ছিল বর্তমানে তা হচ্ছে না।

একটি দেশের তথা একটি জাতির আত্মপরিচয় তার লোকসংস্কৃতি। বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতিই এ দেশের মূল সংস্কৃতির ভিত্তি। এখানকার সাহিত্য, জীবনবোধ, মুক্তিযুদ্ধ, জীবনাচরণ লোকসংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে।

সাধারণ মানুষের ভাষা, জীবনবোধ, বিনোদন, সাহিত্য, পেশা– এসব নিয়েই গড়ে ওঠে লোকসংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির মধ্যে থাকে সহজিয়া সুর ও ভাব। কোনো কৃত্রিমতা থাকে না এই লোকসংস্কৃতির অবয়বে। স্বাভাবিক বহতা নদীর মতোই এই লোকসংস্কৃতি সহজাত। এই লোকসংস্কৃতি আধুনিক সাহিত্য ও নাগরিক সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে।

কিন্তু এই লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের নানা বিকৃত রূপ বর্তমানে দেখা যাচ্ছে– কবিগান এই বিকৃতির অন্যতম শিকার। কবিগানের সুরকে বর্তমানে বিভিন্ন পরিবর্তিত রূপ প্রদানের মাধ্যমে আমাদের জীবনসংস্কৃতির ক্ষতি করা হচ্ছে।

কবিগানের অন্যতম প্রধান অবদান হচ্ছে আমাদের মাঝে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ ঘটানো– কিন্তু এই কবিগান আজকাল আমাদের তরুণদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে ভাটা লক্ষ করা যাচ্ছে।

এ দেশের কবিগানের ভাণ্ডার এক ঐশ্বর্যভাণ্ডার। প্রতিটি অঞ্চলভেদে কবিগান রয়েছে আমাদের। কিন্তু আমাদের তরুণ প্রজন্ম এই লোকগান সম্পর্কে খুব অল্পই অবহিত। কবিগানের পরতে পরতে গভীর

তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধান পাওয়া গেলেও আমাদের তরুণ প্রজন্ম ব্যান্ডের গানের মাধ্যমে কবিগানের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। ব্যান্ডশিল্পীগণ এই যে লোকগান গাইছেন, তার গীতিকার বা মূল শিল্পী সম্পর্কে যদি কিছু কথা গানের আগে উপস্থাপন করতেন এবং ব্যান্ডের অন্যান্য প্রচলিত যন্ত্রের সঙ্গে দেশীয় বাদ্যযন্ত্র, যেমন– বাঁশি, খোল, একতারা, দোতারা-র ব্যবহার করতেন তাহলে হয়তো লোকগান বা কবিগান বর্তমান প্রজন্মের তরুণদের প্রাণকে আরও বেশি করে ছুঁয়ে যেত।

বাঙালির গোলাভরা ধান আর গলায় গলায় গান– এমন একটা প্রবাদপ্রতিম কথা আলোচনা প্রসঙ্গে প্রায়ই উচ্চারিত হয়। অতীতে বাংলাদেশে প্রায় হাজার জাতের ধানের ফলন হত– সেসব ধান এখন আর নেই। ধানের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির কতরকম গানও যে হারিয়ে গেছে সেটাও মিথ্যে নয়। গবেষকদের মতে, এ অঞ্চলে প্রায় দু'শো পঞ্চাশ ধরনের লোকগানের নাম খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু এখন মাত্র কয়েক ধরনের গানের প্রচলন রয়েছে, ভাটিয়ালি-ভাওয়াইয়া, কবিগান, জারি-সারি, বাউল-মুর্শিদি, মারফতি, কীর্তন– এ ধরনের প্রধান কয়েকটি লোকসংগীতের নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হলেও এর সবকটি ধারা কিন্তু এখন সমানভাবে বহমান নেই।

একসময় যে ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে যে লোকমনন-ভাবনা-দার্শনিকতায় জারিত হয়ে কবিগানের উদ্ভব, বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছিল কালের পরিক্রমায়, যুগধর্মের প্রভাবে সে পরিবেশ-পরিস্থিতি এখন পালটে গেছে। সেইসঙ্গে কবিগানও তার আবহমানকালের পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। এখন গ্রামীণ মানুষ মোবাইল ফোনে চটুল গান শোনে কবিগানের পরিবর্তে।

আমাদের দেশের এখন সংগীতচর্চার নানা প্রতিষ্ঠান কিংবা একাডেমি গড়ে উঠেছে। বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীত বিভাগও খোলা হয়েছে অনেকদিন আগে থেকেই। তবে সেই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থেকে একজন আব্বাসউদ্দীন, কছিমুদ্দীন কিংবা রমেশ শীল-এর মতো নিবেদিতপ্রাণ জনচিত্তজয়ী শিল্পীর আবির্ভাব ঘটছে না। বরং ভুল সুরে, ভুল উচ্চারণে হরহামেশাই গাওয়া হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের লোকসংগীত। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দ্বারা এক ধরনের সাংগীতিক দক্ষতা অবশ্যই অর্জিত হয়, কিন্তু লোকসংগীতে গায়কীর কথা ছেড়ে দিলেও আঞ্চলিক ভাবানুষঙ্গ বা বিশেষ ঢং ও উচ্চারণ রপ্ত করা বেশ কঠিন। লোকসংগীত কোনো প্রথাগত সংগীতচর্চা নয়– এতে লোকসাধারণের প্রাণের আকুতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হয়। গায়কের মেজাজ, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত ও পরিবেশের ওপর লোকগানের গায়নরীতি অনেকটাই নির্ভর করে। অথচ বাংলাদেশে বর্তমানে লোকগানকে গৃহবন্দি করে যেন বাইরের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটানো হয়েছে। গ্রাম-গ্রামান্তরে যে সকল প্রতিভাবান লোকসংগীত স্রষ্টা ও কবিগানের শিল্পী অবস্থান করছেন– যথাযথ মর্যাদাপ্রাপ্তিসহ তাঁরা যদি পাদপ্রদীপের আলোয় আসতে সক্ষম হতে পারেন তাহলে বাংলাদেশে কবিগানের প্রসার অনেক বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশে কবিগান শুরু থেকেই সমধিক জনপ্রিয়। প্রায় সব বয়সের শ্রোতাই গানের সবটা না বুঝলেও এ গান শুনে আন্দোলিত ও আপ্লুত হয়। অন্যদিকে কবিগানের রচয়িতা ও গায়কের সংখ্যা দিন দিন কমে আসছে। কবিগানের কথা জেনে বুঝে, নিজেদের জীবনাচরণে তা মেনে নিয়ে, পালন করে ইদানীংকার অনেক শিল্পী কবিগান করেন না। সুতরাং এখনকার লোককবিদের কণ্ঠে ভক্তের আকুল আবেদন-নিবেদনের কোথায় যেন খানিকটা খামতি থেকে যায়।

কবিগানের আসরে যে সাংগীতিক আবহ সৃষ্টি হয় সেটি এখনকার দিনের শহরাঞ্চলে পরিবেশিত চোখধাঁধানো, বিচিত্র বর্ণিল, হৈ-হুল্লোড়ে ভরা মঞ্চে নানা ধরনের আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের উচ্চগ্রামের কর্ণপীড়ক শব্দের মধ্যে পাওয়া যায় না। এমন পরিবেশে নিবিড় নিমগ্ন অনুভবে ভক্ত-শ্রোতার হৃদয়ে রসের আস্বাদন সম্ভব হয় না। একে বলা যেতে পারে প্রজন্মগত ব্যবধান বা 'জেনারেশন গ্যাপ'।

দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলা ছাড়া এখন বাংলাদেশে বেশির ভাগ এলাকায় কবিগানের আসর বসে বলে পর্যবেক্ষণে দেখা যায় না। অথচ স্বাধীনতা-উত্তরকালেও এদেশের মানুষ কবির লড়াই উপভোগ করেছে। এখন কবিয়াল বা কবিগানের সরকারের সংখ্যা বেশ কমে গেছে।

তবে এসব নেতিবাচক অবস্থা ও পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্যেও কবিগানের চর্চা চলছে। এ গানের ধারা এখন একরকম স্তিমিতপ্রায়। মানুষের সামাজিক প্রয়োজন বা চাহিদার ওপর নির্ভর করে লোকগানের টিকে থাকা, মানবীয় প্রেমের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা ও আকুতি ভরা কবিগানের আবেদন কখনোই ফুরাবে বলে মনে হয় না। উপযুক্ত শিল্পীর আকর্ষণীয় গায়কির ভেতর দিয়ে কবিগান পরিবেশন করা সম্ভব হলে গানপাগল বাঙালি নিজের সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠার স্বার্থেই বহুবিচিত্র রসে ভরপুর কবিগানের পুনরুজ্জীবন ঘটাবে বলে ধারণা করা যায়।

বাংলা সংস্কৃতির একটি নিজস্ব সত্তা হচ্ছে কবিগান। এই কবিগানকে বাংলার শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতিতে অক্ষুণ্ন রাখতে চাইলে, নিজস্ব সত্তাকে টিকিয়ে রাখতে হলে বা এটাকে প্রসারিত করতে চাইলে কবিগানের আবার পুনর্জাগরণ ঘটাতে হবে। এই পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে আমরা শুধু মুখে বললে হবে না কিংবা গবেষণা করলে হবে না। এ বিষয়ে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা করতে হবে এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে। কবিগান নিয়ে কাজ করলে এর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটানো সম্ভব হবে। এ বিষয়ে গবেষণার কাজটি সঠিক দিকনির্দেশনামূলক হতে হবে। এক্ষেত্রে আমাদের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, বাংলা একাডেমি তথা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে একত্রিত করে সমন্বয় ঘটিয়ে এই গানের প্রচার ও প্রসারের জন্য ব্যাপক কর্মযজ্ঞ হাতে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে ব্যক্তি-উদ্যোগ যেমন দরকার তেমনি শিল্পী-সাহিত্যিক তথা কাব্যিক ও সংস্কৃতিমনা লোকদের এগিয়ে আসতে হবে। এগিয়ে আসতে হবে বাংলাদেশ সরকারকে। এখানে বাংলাদেশ সরকার বলতে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিষ্ঠানগুলো ধরে নিতে হবে। এছাড়া যেসব উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংগীত, বাংলা, সংস্কৃতি বা ফোকলোর ইত্যাদি বিষয়গুলো আছে সেইসমস্ত প্রতিষ্ঠানকে এ বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

সরকারের দিক থেকে এই উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন যে, কবিগানের শিল্পীদের যথাযোগ্য সম্মানীর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং দেশের প্রতিটি অঞ্চলে কবিয়ালগণ যাতে নিজেদের গান সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারেন, সে ব্যবস্থা করার পাশাপাশি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান গঠন করা– যেখানে শুধু কবিগান শেখানো হবে এবং তা নিয়ে গবেষণা করা হবে। বছরে একটি দিন কবি সম্মেলন করা যেতে পারে কিংবা কবিগান দিবস হিসেবে পালন করা যেতে পারে। এ বিষয়কে কেন্দ্র করে কবিয়ালদের একটি মিলনমেলা তৈরি করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাথে পশ্চিম বাংলার সম্মিলন ঘটিয়ে কাজটি করা যেতে পারে। আমাদের তরুণপ্রজন্মের যারা সংগীতমনা রয়েছে এদেরকে স্ব স্ব দায়িত্ব ভাগ করে দিয়ে কাজ করাতে হবে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়, কলেজ পর্যায়, স্কুল পর্যায়ে। আমাদের যে মিডিয়াগুলো রয়েছে বিশেষ করে টিভি চ্যানেলগুলোকে কবিগানকে প্রচার-প্রসার ও পুনর্জাগরণের জন্য কবিগানের অনুষ্ঠান প্রচার করতে হবে। হতে পারে এটি লাইভ, আবার হতে পারে এটি রেকর্ডের মাধ্যমে। তখন মানুষ এগুলো দেখতে দেখতে কবিগানের প্রতি আকৃষ্ট হবে। এটার জন্য আলাদা টিম থাকবে, পৃষ্ঠপোষকতা থাকবে, নিদিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ থাকবে। তখন এই কবিগানের একটি জাগরণ সৃষ্টি হবে। তবে কবিগান এক দিন, এক মাস, একবছর করলে হবে না; এটির পুনর্জাগরণ ঘটতে দীর্ঘদিন সময় লাগবে। অর্থাৎ কবিগান যেমন এক দিনে ধ্বংস হয়নি তেমনি এক দিনে এটির উদ্ধার করা সম্ভব নয়। তবে কবিগানকে যেকোনো মূল্যে হোক– পরিশ্রমের মাধ্যমে, অর্থের মাধ্যমে, সমন্বয়ের মাধ্যমে, এটিকে টিকিয়ে রাখতে হবে। অর্থাৎ নিজস্ব সত্তার আবার পুনর্জাগরণ ঘটাতে হবে। মানুষের মাঝে, বাঙালিদের মনে এই নবরসের সঞ্চার করে নবপ্রাণের আহবান জানাতে হবে। কবিগান আমাদের জিনিস, আমাদের হাত দিয়ে এটির উদ্ভব আবার আমাদের হাত দিয়ে বিকাশ লাভ করবে, যা আমাদের নিজস্বতা। কবিগান আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের কল্পনা। কবিগান আমাদের মধ্যে লালন করতে পারলে আমরা বহির্বিশ্বে গর্ব করতে পারব।

আঠারো শতক থেকে বিশ শতক পর্যন্ত জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় কবিগান হয়েছে। তখন অর্থের কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু বর্তমানে আঙ্গিক পরিবর্তন হলেও মন্ত্রী, এমপি, চেয়ারম্যান, মেম্বরগণ সেইভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করছেন না, কবিগানকে ধারণ করছেন না, লালন করছেন না। তবে সরকার এখনো কবিগানকে চিহ্নিত করে অঞ্চলভেদে পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারে। পাশাপাশি কবিয়ালগণকে ভিন্ন পেশায় যেতে না দেওয়ার মাধ্যমে এ পেশায় থেকে কবিগান করতে পারেন এরূপ সহযোগিতা করা হলে সম্ভবত কবিগানকে রক্ষা করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে আমাদের বর্তমান প্রজন্ম তথা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এটিকে আমরা যথাযথভাবে পৌছে দিতে পারব। বাংলাদেশ তথা বাঙালির এই সত্তা বর্তমানে যে নাজুক অবস্থায় রয়েছে সেখান থেকে আরো উন্নত স্থানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। দেশের সংস্কৃতি সংরক্ষণের প্রয়োজনে কবিগানের প্রচলন হওয়া এবং যুবকগণের মনে কবিগান সম্বন্ধে উৎসাহ, প্রীতি সঞ্জীবিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

উপসংহার

কবিগান বাংলার লোকসংস্কৃতির একটি সমৃদ্ধ আঙ্গিক। এ গান লোকসাহিত্যের অন্যতম সম্পদ। আমাদের দেশে লোকসংগীতের যে ভাণ্ডার রয়েছে, তা এক ঐশ্বর্যভাণ্ডার। বাংলাভাষায় রবীন্দ্রসাহিত্য ও বৈষ্ণবসাহিত্যের পরেই সর্বাধিক আলোচ্য বিষয় কবিগান। কবিগান কখন, কোথায়, কে বা কারা সৃষ্টি করেছিলেন তার সঠিক তথ্য নিরূপণ করা খুবই দুরূহ বিষয়। তবে এ গান কোনো একক ব্যক্তির ভূমিকা নয়। কবিগান গোষ্ঠী, জাতি, সম্প্রদায়ের সামগ্রিক প্রচেষ্টার সার্থক সমন্বিত রূপ। উদ্ভবকালে কবিগানের যে আদল তৈরি হয়েছিল, উনিশ শতকে কোলকাতাতেই তাতে নানা ধরনের পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। সেই পরিবর্তিত কবিগান গ্রামবাংলায় জায়গা পায়। তবে পর্যাপ্ত পৃষ্ঠপোষকতা না থাকায় কোলকাতার কবিগানের তুলনায় গ্রামবাংলার কবিগান খানিকটা দুর্বল হয়। কালক্রমে গ্রামবাংলায় প্রতিভাবান কবিয়ালদের আবির্ভাব ঘটতে থাকে। কবিগানের পূর্ববঙ্গ পর্বে বেশ কয়েকজন অসাধারণ কবিয়ালদের মধ্যে যাঁদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য,এমন তিনজন কবিয়ালের ভূমিকা নিয়ে এই গবেষণা কাজটি করা হয়। গবেষণার আলোকে বলা যায় রমেশ শীল, বিজয় সরকার ও স্বরূপেন্দু সরকার এই তিন কবিয়ালই স্ব স্ব ক্ষেত্রে কবিগানে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছেন।

রমেশ শীল ছিলেন কমিউনিজমে বিশ্বাসী ও মাইজভাণ্ডারী তরিকায় বিশ্বাসী একজন কবিয়াল। নানা পৌরাণিক আবহে আবর্তিত কবি-বিতর্ক ছাড়িয়ে রমেশ শীল কবিগানে নিয়ে আসেন সমকালীন জীবন-জিজ্ঞাসা, উন্নত রুচিবোধ, প্রকৃত নীতি-নৈতিকতা, সমাজ- সচেতনতা এবং রাজনীতি। তাঁর গানের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলছেন গণমানুষের চাহিদা, বৈষম্য, সমস্যা নিরসনের উপায়। সমগ্র পাক-ভারত উপমহাদেশে কবিগানের ক্ষেত্রে রমেশ শীল যে অনন্যসাধারণ ভূমিকা রেখেছেন তা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে আমাদের জাতীয় জীবনে।

বিজয় সরকার ছিলেন অসাধারণ কবিত্বশক্তির অধিকারী একজন সাধক পুরুষ। তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক, বিচ্ছেদী, ভাটিয়ালি ও মরমী গানের সুরস্রষ্টা। তাঁর গানের কথা ও সুরের মধ্যে এক অসাধারণ সমন্বয় ছিল। তাঁর গান মানুষের মনকে এখনো আন্দোলিত করে এবং সুপথের সন্ধান দেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন আলোচনায় বিজয় সরকারের জুড়ি ছিল না। বিজ্ঞান, দর্শন, ব্যাকরণ, কুরআন, হাদিস, বাইবেল, বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, সংগীত, কাব্য সব আলোচনাতেই তাঁর রুচি ছিল। এমনকি রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জসীমউদ্‌দীন প্রমুখের কবিতার দর্শন ও কাব্যমূল্য নিয়ে তিনি আলোচনা করতেন। তিনি ছিলেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে। তাঁর সংগীতসাধনা হয়ে উঠেছিল মানবকল্যাণে নিবেদিত।

স্বরূপেন্দু সরকারের কবিগান আধুনিক-মনস্কতা ও সমাজসচেতনায় ভরপুর ছিল। তাঁর গানে মানুষের নীতি ও আদর্শকে অনুভব করত। তাঁর গানগুলোতে সামষ্টিক জনতার কথা, সমাজের মঙ্গলচিন্তা, শ্রেণিগত দ্বন্দ্ব-সংঘাত পরিহারের সুপরামর্শ থাকত। এছাড়া স্বরূপেন্দু সরকার মতুয়া আদর্শের প্রচারক হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

আলোচিত এই তিন কবিয়ালের গানে মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ ও কলহ নিরসনের চিন্তায় অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিশেষভাবে স্মরণীয়। এঁদের গানে হিন্দু-মুসলমান উভয় ঐতিহ্যের যুগল ব্যবহারের ফলে উভয় সম্প্রদায়ের পারস্পরিক উপলব্ধি, সমন্বয় ও মিলনের প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে। এই তিন কবিয়ালের গানে বিস্ময়করভাবে সমাজচেতনা প্রকাশিত হয়েছে। সামাজিক অবিচার ও

অসাম্য, ধর্মীয় গোঁড়ামি, জাত-পাতের সমস্যা, শ্রেণি-শোষণ, অর্থনৈতিক বৈষম্য এই তিন কবিয়ালের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তাঁরা আর্থ-সামাজিক প্রসঙ্গে তাঁদের অকপট-আন্তরিক বক্তব্য কবিগানের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। বিত্তবান ও বিত্তহীন, কুলীন ও প্রাকৃত, শোষক ও শোষিতের বিভক্ত সমাজে দরিদ্র-নিঃস্ব-নির্যাতিতের পক্ষভুক্ত প্রতিনিধি হিসেবে এই কবিয়ালগণ এক আশ্চর্য সমাজসচেতন দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করেছিলেন। মানুষের প্রতি মানুষের শোষণ-বঞ্চনা ও অবিচার-অবজ্ঞার চির অবসান কামনা করে তাঁরা শ্রেণিহীন শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন।

বর্তমানে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছে। বহমান কালের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়েছে পুরনো মূল্যবোধ ও রুচি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে অনেকের বিবেচনাতেই কবিগান হচ্ছে পিছিয়ে পড়া সমাজের সংস্কৃতি। কবিগানের অন্তর্ভুক্ত সকল গান আজকের দিনের প্রেক্ষিতে হয়তো তরুণ প্রজন্মের রুচি ও মানবিকতায় সমান মূল্য পাওয়ার দাবি রাখে না। ঐতিহাসিক কারণেই কবিগানের বিশুদ্ধতা ও অস্তিত্ব আজ অনেকাংশে বিপন্ন। কিন্তু এত কিছুর পরেও কবিগানের সামাজিক ও ঐতিহাসিক মূল্য নির্ণয়ের প্রয়োজন রয়ে গেছে বলে ধারণা করা যায়। কবিগানের গল্প সমাজ-সম্পর্কের ধারা বেয়ে সাম্প্রদায়িকতা-জাতিভেদ-এর মতো যুগসমস্যাকে চিহ্নিত করে সেই সমস্যাগুলোর সমাধানের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে এসেছে। এই প্রয়াসের মাধ্যমে কবিয়ালগণ মুক্তমন, সমাজসচেতন ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিচয় দিয়েছেন তার স্বরূপনির্ণয় এদেশে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবন চর্চার মৌল প্রবণতার একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক বলেই কবিগানের চর্চা ও এই ক্ষেত্রে গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান।

এই গবেষণাকর্মে কবিগানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, কবিগান ও কবিয়ালদের ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখতে হলে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বাংলা একাডেমি, শিল্পকলা একাডেমিসহ বিভিন্ন গবেষক ও সুধীজনের মাধ্যমে অডিও, ভিডিও এবং ট্রান্সক্রিপট তৈরি করে আর্কাইভিং করা খুবই জরুরি। বিভিন্ন ইলেকট্রিক মিডিয়া কর্তৃক কবিয়ালদের গান ও সাক্ষাৎকার অডিও-ভিডিও মাধ্যমে ধারণ করে তা সংরক্ষণ ও প্রচার করা প্রয়োজন বলে মনে হয়েছে।

কবিগান প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে হিংসা-বিদ্বেষ, অসাম্য পরিহার করে শান্তিময় গণতান্ত্রিক ধরিত্রী বিনির্মাণ করা সম্ভব। ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ ও মূল্যবোধ যখনই ক্ষয় হতে শুরু করে, তখনই লোককবিগণ কথা ও সুরের মাধ্যমে মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান প্রদান করেন। আমরা কবিগানের তত্ত্ব-দর্শন ও শিল্পসৌন্দর্যে বাঙালির প্রবহমান জীবনচেতনার মৌলিক আকাঙ্ক্ষাকে হৃদয়ে ধারণ করে প্রকাশিত হতে চাই বিশ্বলোকে।

পরিশিষ্ট

গবেষকদের সাক্ষাৎকার

যতীন সরকার-এর সাক্ষাৎকার

১. *কবিগানের উদ্ভবের পিছনে মূল কারণ কী ছিল বলে আপনি মনে করেন?*

জনগণের যুক্তি বা লজিক থেকেই কবিগানের উৎপত্তি।

২. *কবিগানের উদ্ভবের পিছনে কোন কোন ব্যক্তির ভূমিকা অগ্রগণ্য বলে আপনি মনে করেন?*

যুক্তিবাদী সাধারণ মানুষের ভূমিকাই আগে। আমাদের সমাজব্যবস্থার লৌকিক গল্পের ভাণ্ডারই কবিগানকে সমৃদ্ধ করছে। তবে বিশেষ করে পূর্ববাংলার আধুনিক কবিগান হরিচরণ আচার্যের হাত ধরেই এগিয়ে গেছে। তারপর আরো অনেকে অবদান রেখেছেন।

৩. *কবিগানের স্বর্ণযুগ কোন সময়টি বলে আপনি মনে করেন?*

মোটামুটি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত বাংলা কবিগানের স্বর্ণযুগ বলা হয়।

৪. *বাংলাদেশে কবিগানে কাদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য বলে আপনি মনে করেন?*

হরিচরণ আচার্য, বিজয়নারায়ণ আচার্য, রামু, রামগতি, রামকানাই, তারকচন্দ্র সরকার, গুমানি দেওয়ান, রাজেন সরকার, রমেশ শীল, বিজয় সরকার, নকুল সরকার, স্বরূপেন্দু সরকারসহ আরো অনেকেই আছেন।

৫. *কবিয়ালদের অনেকেই কবিয়াল, কবিওয়ালা, লোককবি, চারণকবি বলে থাকেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁদের কী ধরনের সম্বোধন করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?*

যাঁরা কবিগান করেন তাঁরা মূলত স্বভাবকবি। তবে তাঁদের কবিয়াল হিসেবে সম্বোধন করার পক্ষে আমি নই। কবিয়াল শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁদের সৃষ্টিশীলতাকে খাটো করা দেওয়া হয়েছে বলে অমি মনে করি।

৬. *কবিগানের ক্ষেত্রে রমেশ শীল, বিজয় সরকার, স্বরূপেন্দু সরকারের অবস্থান আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?*

অবশ্যই তাঁরা বাংলা কবিগানের প্রধানতম কবি। তাঁদের কবিগান সমাজে একটা জাগরণ সৃষ্টি করেছিল। মূলত তাঁরা জনগণের সাথে সেতুবন্ধন তৈরি করেছিলেন। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের গান, যুক্তি, সমাজে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে কাজ করেছে।

৭. *রাষ্ট্র, সমাজ, সরকার, শিল্পী ও গবেষকগণ কি আমাদের কবিয়ালদের যথাযথ মূল্যায়ন করেছেন? না করলে, এঁদের কিভাবে মূল্যায়ন করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?*

পুরোপুরি হয়েছে বলে তো বলব না। তবে ঘাটতি আছে অবশ্যই। শিক্ষিত শেণির অনেক ক্ষেত্রেই কবিগানের প্রতি অনীহা আছে। সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে এটাও দৃশ্যমান। প্রচুর গবেষণা এবং সরকারি, বেসরকারি, পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে কবিগানের মূল্যায়ন বা প্রসার ঘটানো সম্ভব।

৮. *কবিয়াল রমেশ শীল, বিজয় সরকার, স্বরূপেন্দু সরকার-এর গান এখন সমাজে কতটুকু প্রচলিত আছে? সমাজের গতিশীলতার ক্ষেত্রে বর্তমানে এই কবিয়ালদের ভূমিকা কতটুকু?*

খুব বেশি প্রচলিত তো এখন আর নেই। কবিগানের স্বর্ণযুগের সময় সামাজিক ধনশালী উচ্চ শেণি কবিগানের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। আমি আগেও বলেছি সেই সময় সামাজিক জীবনযাত্রার সাথে বিনোদন ও যুক্তিতে কবিগান জড়িত ছিল। এখন সমাজের গতিশীলতায় কবিগানের অবস্থা খুবই ক্ষীণ। তবে প্রচার-প্রসার জরুরি।

৯. *সামাজিক ও সাহিত্যিক মূল্যায়নে কবিগানের অবস্থান কোথায়?*

কবিগান জনমানুষের, কবিগানের গায়কদের ভেতর থেকে প্রখর যুক্তি হতে উদ্ভূত। আমার মতে, বাংলা কবিতার মূল ধারার সাথে কবিগান ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। মূলধারার মধ্যেই পড়ে। তবে অনেকে ভিন্ন মত দিতেই পারে।

১০. *আপনার মতে রমেশ শীল, বিজয় সরকার, স্বরূপেন্দু সরকার-এর গানের ভাব-দর্শন সমাজে কোনো পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে কি না? যদি সমাজে কোনো পরিবর্তন ঘটে থাকে তাহলে অনুগ্রহ করে সংক্ষেপে উল্লেখ করবেন।*

হ্যাঁ, অবশ্যই এনেছে। কবিগান আমাদের সমাজব্যবস্থার অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশকে তুলে ধরে। যা মানুষকে যুক্তিবাদী করে ও কুসংস্কারের গণ্ডি ভাঙতেও সাহায্য করে।

১১. *রমেশ শীল কবিগান করতে গিয়ে বাংলাদেশে কোনো প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হয়েছেন কি না? হলে সেটা উপস্থাপন করুন।*

কোনো প্রতিকূলতার সম্মূখীন হয়েছেন বলে আমার জানা নেই।

১২. *রমেশ শীল-এর কবির দলে সহশিল্পী হিসেবে কাদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য বলে আপনি মনে করেন?*

এ বিষয়ে আমার জানা নেই।

১৩. *কবিগানে জীবনবোধ ও তৎকালীন সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ছিল কিনা?*

কবিগান আসরের মধ্যে তাৎক্ষণিক যুক্তির সুরেলা প্রয়োগ। সেখানে প্রখরভাবে উঠে এসেছে সামাজিক জীবনবোধ, ন্যায়-অন্যায় ও সে সময়কার সমাজব্যবস্থার নানা গল্প। তৎকালীন সমাজব্যবস্থার বিনোদনের অন্যতম মাধ্যমও ছিল কবিগান। সুতরাং সার্বিকভাবে অবশ্যই তৎকালীন সমাজব্যবস্থা কবিগানের ব্যপক প্রভাব ছিল।

১৪. *অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবিগান প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে সমাজপতিদের কী ধরনের ভূমিকা ছিল?*

সমাজপতিদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই কবিগানের বড় বড় আসর বসত।

১৫. *বর্তমান বিশ্বে বিরাজমান বৈষম্য ও অশান্তি কবিগান প্রচারের মাধ্যমে নিরসন করা সম্ভব– এ কথার সাথে আপনি একমত কি না? সম্ভব হলে সেটা কিভাবে?*

সার্বিকভাবে যে সম্ভব তা বলব না। কবিগানের যুক্তিতর্কের মাধ্যমে সমাজব্যবস্থার কিছু চিত্র তুলে ধরা হয়। এর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে জাগরণ সম্ভব।

১৬. *সমাজে নানাবিধ অসংগতি কবিগানের মাধ্যমে তুলে ধরা হলে সেটা সমাজ ও মানুষের কল্যাণে কতটুকু ভূমিকা রাখবে বলে আপনি মনে করেন?*

অবশ্যই ভূমিকা রাখবে। মানুষের মধ্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মানসিকতা তৈরি হবে।

১৭. *কবিগানের বর্তমান অবস্থা কেমন বলে আপনি মনে করেন? অনুগ্রহ করে বিস্তারিত জানাবেন।*

বর্তমান অবস্থা ভালো নেই। সমাজব্যবস্থার সৃষ্টিশীলতার অনেক পিছনে পড়ে গেছে কবিগান।

১৮. *কবিগান যদি অতীতের মতো উজ্জ্বল অবস্থানে না থাকে, তবে ভালো অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?*

পৃষ্ঠপোষকতা, গবেষণা, গবেষণাকর্মের প্রয়োগ জরুরি।

১৯. *কবি ও কবিগানের জন্য রাষ্ট্রীয় ও সরকারি পর্যায়ে কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?*

অধিকতর গবেষণা, কবিগানের পৃষ্ঠপোষকতা ও সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

২০. *কবিগান টিকিয়ে রাখার জন্য গবেষণার প্রয়োজন অনস্বীকার্য– এ ক্ষেত্রে আপনার মতামত জানাবেন।*

হ্যাঁ, অবশ্যই অনস্বীকার্য। তবে শুধু গবেষণা করলেই চলবে না। এর ওপর ভিত্তি করে তার ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রয়োগ খুবই জরুরি।

২১. *এই গবেষণাকর্ম কি কবিগানের অতীত সামাজিক, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক অবদানের মতো বর্তমানেও কোনো ভূমিকা রাখবে বলে আপনি মনে করেন?*

রাখতে পারে। যদি বই আকারে বের হয় অন্তত মানুষ তো জানবে। কবিগানের প্রতি একটা পজেটিভ ধারণা তৈরি হবে মানুষের।

আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

কাজল অধিকারী-এর সাক্ষাৎকার

১. *কবিগানের উদ্ভবের পিছনে মূল কারণ কী ছিল বলে আপনি মনে করেন ?*

শুধু কবিগান নয়, লোকসংস্কৃতির কোনো ধারারই উৎসমুখ খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভবই। সংস্কৃতির যে কোনো ধারাই অনেক আবর্তন-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান রূপটি পরিগ্রহণ করে। যেহেতু লোকসংস্কৃতির কোনো ধারার লিখিত ইতিহাস নেই, বলা ভালো কিছুদিন আগে পর্যন্ত কেউ লিখে রাখার প্রয়োজনও অনুভব করেননি, তাই মূল কারণ খোঁজার চেষ্টা কষ্টসাধ্য। তবে এটা অনুমান করা যায় যে, কোনও বিনোদনে যদি উত্তেজনা থাকে তাতে বাণিজ্যের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। আর উত্তেজনা উৎপাদনের দ্বন্দ্বের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না বলে অনুমিত হয়। খেলাধুলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা, নাটকে চারিত্রিক দ্বন্দ্ব (conflict), চলচ্চিত্রে রংয়ের বৈপরীত্য (Color contrast) বা আবেগ বৈপরীত্য (Imotional contrast) জনচিত্তে নানামাত্রিক অভিঘাত সৃষ্টি করে, জনচিত্ত হয় উদ্বেলিত। উত্তেজনায় আবিষ্ট হতে বার বার ছুটে যায়, হয় মোহাচ্ছন্ন। জীবনযন্ত্রণা থেকে, তাৎক্ষণিক ভাবে হলেও পায় মুক্তি। কবিগানের আসরেও মানুষ মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকে। মূলে আছে দুই কবিগায়কের দ্বন্দ্ব। কবিগানের উৎসমুখে এই দ্বন্দ্বই হয়তো হয়। শোনা যায় বিক্রমাদিত্যের রাজসভাতে নবরত্নদের মধ্যে পণ্ডিতি লড়াই হত। বিভিন্ন রাজ-রাজাড়াদের সভায় কবিদের প্রতিযোগিতা হত। বিজয়ী কবি পেতেন উপঢৌকন। কখনও কখনও রাজকবি হিসেবে পেতেন নিয়োগপত্র। কবির লড়াই রাজসভা থেকে জনসভায় স্থানলাভই কবিগানের উৎসমুখ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

২. *কবিগানের উদ্ভবের পিছনে কোন কোন ব্যক্তির ভূমিকা অগ্রগণ্য বলে আপনি মনে করেন ?*

কবিগানের উদ্ভবকাল যেহেতু নির্ধারণ করা দুঃসাধ্য সেহেতু চরিত্রগুলো উদ্ধার করা সম্ভব নয় বলে বিবেচিত হয়। কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় কিছুদিন ধারাবাহিকভাবে কিছু কবিয়ালদের জীবনী প্রকাশ করেছিলেন। সেই সূত্রে প্রথম কবিয়াল হিসেবে আমরা 'গোঁজলা গুঁই'য়ের নাম জানতে পারি। কিন্তু কোনো একজন ব্যক্তি কোনো লোকধারার প্রবর্তক এটা বোধকরি কেউই মেনে নেবেন না। ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয় তেমন দাবিও করেননি। তবে সেই সময়ের কিছু কবিয়ালদের নাম আমরা জানতে পারি গুপ্ত-কবি সংগৃহীত তথ্য থেকে। উক্ত তথ্য থেকে লালু-নন্দলাল, কেষ্টা মুচি, নিতাই বৈরাগী, হরু ঠাকুর, ভোলা ময়রা এবং অ্যান্টনি ফিরিঙ্গিদের নাম প্রকাশ্যে আসে। প্রসঙ্গত বলে রাখি, কবি ঈশ্বরগুপ্তও একজন বাঁধনদার ছিলেন। বাঁধনদাররা নিজে গাইতেন না কিন্তু অন্য কবিয়ালদের জন্য গান রচনা করতেন। তবে কোলকাতাই যে কবিগানের গর্ভভূমি– ইতিহাস এমনটা সাক্ষ্য দেয় না। কলিকাতায় যে সময় অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, ভোলা ময়রা প্রভৃতি কবিয়ালরা গান করতেন তখন পূর্ববঙ্গেও কবিগান প্রচলিত ছিল। ময়মনসিংহ জেলায় লোচন কর্মকার, হারাইল বিশ্বাস, চন্দ্রীপ্রসাদ ঘোষ এবং অন্যান্য কবিয়ালরা খ্যাতির শীর্ষে ছিলেন। তবে এঁরা কবিগানের উদ্ভাবক এমনটা দাবি করা সমীচীন হবে বলে মনে হয় না।

৩. *কবিগানের স্বর্ণযুগ কোন সময়টি বলে আপনি মনে করেন?*

কোলকাতাভিত্তিক যে কবিগান তার ইতিহাস আমরা জানতে পারি ১৮৫৪ সাল নাগাদ প্রভাকরের পাতায়। অষ্টাদশ শতকের কবিয়ালদের কবিগান অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ ছিল। কোলকাতার বাইরে,

বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় কবিগান ছিল। মুর্শিদাবাদও কবিগানের লালনভূমি। বর্তমানে যে অঞ্চলটি নিয়ে বাংলাদেশ গঠিত সেই অঞ্চলের কবিগানকে অশ্লীলতামুক্ত করার দুই কারিগর হরিচরণ আচার্য ও তারক সরকার। এঁদের ধারার ধারক ও বাহকগণ কবিগানকে এক উজ্জ্বল মহিমায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তারক সরকারের শিষ্য মনোহর সরকার ও হবিবর সরকার। মনোহর সরকারের শিষ্য বিজয় সরকার ও নিশি সরকার। বিজয় সরকারের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন রসিক সরকার ও অনাদি সরকার। হরিচরণ আচার্যের শিষ্য নকুল দত্ত ও রাজেন্দ্র নাথ সরকার। ওদিকে চট্টগ্রামের রমেশ শীল। এইসব মহাতারকা ছাড়াও আর অনেক কবিয়াল ছিলেন যাঁরা কবিগানকে গুণে-মানে উচ্চাসনে বসিয়ে গেছেন। সেদিক দিয়ে বিচার করলে বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে আশির দশক পর্যন্ত আমার মতে কবিগানের স্বর্ণযুগ।

৪. *বাংলাদেশে কবিগানে কাদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য বলে আপনি মনে করেন?*

বাংলাদেশে কবিগানে যাঁদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়েছে তাঁরা হলেন হরিচরণ আচার্য, তারক সরকার, নকুল দত্ত, রাজেন সরকার, মনোহর সরকার, বিজয় সরকার, নিশি সরকার, রসিক সরকার, অনাদি সরকার, রমেশ শীল প্রমুখ।

৫. *কবিয়ালদের অনেকেই কবিয়াল, কবিওয়ালা, লোককবি, চারণকবি বলে থাকেন তবে প্রকৃতপক্ষে তাঁদের কী ধরনের সম্বোধন করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?*

এটি একটি জটিল প্রশ্ন বলে আমার মনে হয়। পশ্চিমবঙ্গে কবিয়ালগণ নিজেদের লোককবি বলে থাকেন। অবশ্যই তাঁরা লোককবি। কিন্তু যাঁরা ভাওয়াইয়া গান, ঝুমুর গান, ভাটিয়ালি গান বা বাউল গান রচনা করেন তাঁরাও লোককবি। আবার বাংলাদেশে অনেক ক্ষেত্রে চারণকবি হিসেবে উল্লেখিত হন। যাঁরা জারীগান করেন, বিচারগান করেন বা পালাগান করেন তাঁরাও একার্থে চারণকবি। তাই 'কবিয়াল' বা 'কবিওয়ালা' শব্দ দুটি যেমন এক বিশেষ গায়কশ্রেণির দ্যোতক তেমনটি আর কোনো শব্দে হয় না। কিন্তু 'য়াল' বা 'ওয়ালা' প্রত্যয়ান্ত শব্দ তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয় বলে বর্তমান প্রজন্মের কবিগায়কগণ শব্দ দুটি পছন্দ করেন না। তাঁরা লোককবি হিসেবেই পরিচিত হতে চান।

৬. *কবিগানের ক্ষেত্রে রমেশ শীল, বিজয় সরকার, স্বরূপেন্দু সরকারের অবস্থান আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?*

কবিগানের জগতে রমেশ শীল একজন সমাজসচেতন আধুনিকমনস্ক কবিগায়ক। শুধু কবিগান গেয়ে থেমে থাকেননি, সামাজিক আন্দোলন করে জেলও খেটেছেন। কবিগানের জগতে তিনি এক এবং একক। বিজয় সরকার পেশাগতভাবে কবিয়াল ছিলেন। ড. শক্তিনাথ ঝাঁ-এর কথায় তিনি কবিগায়ক নন, কবি এবং গায়ক। যে গানগুলো বাজারে প্রচলিত তা কবিগান নয়। তবে কবিগানের আসরে গানগুলো গেয়েছেন। গানগুলো সবসময় কবিগানের আসরেও রচিত হয়নি। একটি উদাহরণ 'শুধু পাষাণ নয় ঐ তাজহমলের পাথর' গানটি আগ্রায় তাজমহলে বসে রচিত। এ গানে কবিগানের উত্তর-প্রতিউত্তরের উত্তেজনা নেই। দুটি লাইন উদ্ধৃত করছি–

তাজমহলের মর্মরের ওই পাশে,
দুটি হিয়ার মর্মের বাণী ভাসে,
ছুটিছে আকাশ বাতাসে, পাষাণ ফুলের গন্ধ আতর।
কিম্বা–
সৃষ্টির প্রাতে প্রথম সোপানে,
যে বিরহ মানুষের পরানে,
সেই বেদনার ব্যাকুলটানে, পাষাণও আজ অশ্রুকাতর,

চরণগুলোতে তাজমহলের বহিরাঙ্গের বর্ণনা নয়, তার অন্তর্নিহিত অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। এগানটি গীতিকবিতার ধর্মী। স্বরূপেন্দু সরকারের কবিগান শোনার সুযোগ হয়নি আমার। তবে ছোটবেলায় দেখেছি। নিশি সরকারের ছাত্র হিসেবে আমাদের বাড়িতে এসেছেন। বহুমুখী প্রতিভা ছিল। সহজাত কবিত্বশক্তি ছিল। কবিতা লিখতে দেখেছি কবিতার খাতা ছিল। সুন্দর ছড়া লিখতেন। এবং সুকুমার রায়ের মতো ছড়ার অর্থবোধক কার্টুন আঁকতেন। নাগরিক জীবনের সংস্পর্শে এলে কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতেন মনে হয় খড়ি ও কলমে ছোট ছোট সুন্দর অক্ষরে নাম লিখে দিতেন। সে অক্ষর এত ছোট হত যে কখনো কখনো আতসকাচের প্রয়োজন হত। সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। বুকের পেশি নাচাতে পারতেন। কিন্তু তিনি যে সময়ে কবিগানের জগতে এসেছিলেন সে সময়ে অর্ধ ডজনের বেশি কবিয়াল যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশালে দাপটের সঙ্গে গান গেয়ে চলেছেন। রাজেন্দ্রনাথ সরকার, বিজয় সরকার, নিশি সরকার, ছোট রাজেন সরকার, কালাচাঁদ সরকার, অনাদি সরকার, রসিক সরকার প্রমুখ কবিগায়কদের প্রভাবে অনেক সম্ভাবনাপূর্ণ কবিয়াল যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেননি।

৭. *রাষ্ট্র, সমাজ, সরকার, শিল্পী ও গবেষকগণ কি আমাদের কবিয়ালদের যথাযথ মূল্যায়ন করেছেন? না করলে, এঁদের কিভাবে মূল্যায়ন করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?*

কিছুদিন আগে পর্যন্ত কবিগানের মূল্যায়নে গবেষকগণ কিছুটা হলেও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখতেন। অশ্লীল, খিস্তিখেউড়ের গান বলে বরং অবমূল্যায়ন করতেন। আসলে সেগুলো কলিকাতাভিত্তিক নগরজীবনের বাইরে গ্রামবাংলার বিস্তীর্ণ পটভূমিতে কবিগানের যে প্রাণবন্ত ধারা বয়ে চলছিল সে খবর তাদের কাছে অধরা। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি পাল্টাতে শুরু করেছে। বিভিন্ন সারস্বত প্রতিষ্ঠানগুলো কবিগান সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠছে। এটা খুব আনন্দের বিষয়।

৮. *কবিয়াল রমেশ শীল, বিজয় সরকার, স্বরূপেন্দু সরকার-এর গান এখন সমাজে কতটুকু প্রচলিত আছে? সমাজের গতিশীলতার ক্ষেত্রে বর্তমানে এই কবিয়ালদের ভূমিকা কতটুকু?*

কবিয়াল রমেশ শীল, বিজয় সরকার, স্বরূপেন্দু সরকার তিন জনের গানই সমাজে গতিশীলতার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে তাঁদের গানের কথা ও সুর মানুষকে প্রভাবিত করেছে।

৯. *সামাজিক ও সাহিত্যিক মূল্যায়নে কবিগানের অবস্থান কোথায় ?*

তাৎক্ষণিকভাবে রচিত অংশ হয়তো সবসময় সাহিত্যের মানদণ্ড ধরে রাখতে পারেনি কিন্তু সামাজিক অবদান অপরিসীম। নগরকেন্দ্রিক নবজাগরণের ঢেউ গ্রামবাংলাতে খুব একটা প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয় না। কারণ রেডিও, টেলিভিশনের আগে নগরজীবন ও গ্রাম্যজীবনের মধ্যে আত্মিক নৈকট্যের অভাব ছিল। এইসব কবিগায়ক, জারীর বয়াতি, বাংলার বাউল সম্প্রদায় ও বিভিন্ন লোকধারার মহাজনেরাই বাংলার প্রকৃত নবজাগরণ ঘটিয়েছেন। সর্ব ধর্মের সমন্বয় সাধন করে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মানুষকে সজাগ করে, ধর্মের জটিল তত্ত্বকে মানবিকভাবে পরিবেশন করে গ্রামবাংলার সামাজিক রিফর্মেশন ঘটাতে চেষ্টা করেছেন তাঁরা।

১০. *আপনার মতে রমেশ শীল, বিজয় সরকার, স্বরূপেন্দু সরকার-এর গানের ভাব-দর্শন সমাজে কোনো পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে কি না? যদি সমাজে কোনো পরিবর্তন ঘটে থাকে তাহলে অনুগ্রহ করে সংক্ষেপে উল্লেখ করবেন।*

লোককবিগণ একাধারে গণমনোরঞ্জন ও লোকশিক্ষক। কবিগানের আসরে হিন্দু-মুসলমান একত্রে বসে গান শোনেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি তৈরির ক্ষেত্র এইকবিগানের আসরগুলো। তবে যে সময় রমেশ শীল, বিজয় সরকার, স্বরূপেন্দু সরকার গান গাইতেন সে সময়

গণমাধ্যমগুলো এত সক্রিয় ছিল না। এমনকি তাঁরা গান পরিবেশনের সময় মাইকও ব্যবহার করতেন না। হাতে হাতে মোবাইল বা অন্য কোনো ধারক-যন্ত্রও ব্যবহৃত হত না। ফলে তাৎক্ষণিকভাবে রচিত সংগীতে শ্রোতাদের বিনোদনের সাথে সাথে চেতনা সমৃদ্ধ হত বটে কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য কোনো প্রকৌশল মানুষের হাতে ছিল না। এই সুবিধা এখনকার কবিগায়কগণ পেয়ে থাকেন। কোথাও কবিগান হলে মুহূর্তে নেটে ভাইরাল হয়ে যায়। সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে সামাজিক পরিবর্তনে লোককবিদের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু এককভাবে কেউ সমাজকে পরিবর্তিত করে তুলেছে এমন দাবি করা যৌক্তিক বলে মনে হয় না।

১১. *বিজয় সরকার কবিগান করতে গিয়ে বাংলাদেশে কোনো প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হয়েছেন কি না? হলে সেটা উপস্থাপন করুন।*

প্রথমজীবনে বিজয় সরকার যখন কবিগান শুরু করেন তখন প্রতিষ্ঠিত কবিয়ালগণ বিজয় সরকারকে বয়কট করেছিলেন। নেতৃত্বে ছিলেন রাজেন্দ্রনাথ সরকার, বেশ কিছুদিন কবিগান বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই দুঃসময়ে নকুল দত্ত মহাশয় এসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বিজয় সরকারকে নিয়ে জোট বেঁধে গান করতে শুরু করেন। এছাড়া আর কোনো প্রতিকূলতা হয়নি।

১২. *বিজয় সরকার-এর কবির দলে সহশিল্পী হিসেবে কাদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য বলে আপনি মনে করেন?*

প্রথমজীবনে দলের ম্যানেজার রাজেন মাস্টার, হারমোনিয়ম বাদক নিরঞ্জন পাণ্ডে, ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, অক্ষয় ঢুলি, ক্ষীরোদ ঢুলি, ম্যানেজার কালীকান্ত সিকদার এবং শেষের দিকে ছায়াসঙ্গী দীপক অধিকারী (কটা) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

১৩. *কবিগানে জীবনবোধ ও তৎকালীন সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ছিল কিনা?*

যে কোনো লোকধারায় সমাজব্যবস্থার প্রভাব বিদ্যমান থাকে। থাকে জীবনবোধে সম্পৃক্ত। কবিগানও তার ব্যতিক্রম নয়। সমাজের সাথে যোগসূত্রহীন কোনো শিল্পই স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনা।

১৪. *অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবিগান প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে সমাজপতিদের কী ধরনের ভূমিকা ছিল?*

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলশ্রুতি হিসেবে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা বাবুরাই তৎকালীন কবিগানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল বলে জানা যায়। বাবুদের আমোদের একপ্রকার উৎসই ছিল সেকালের কবিগান।

১৫. *বর্তমান বিশ্বে বিরাজমান বৈষম্য ও অশান্তি কবিগান প্রচারের মাধ্যমে নিরসন করা সম্ভব– এ কথার সাথে আপনি একমত কিনা? সম্ভব হলে সেটা কিভাবে?*

এটি একটি অতিরিক্ত চাওয়া হয়ে যাবে বলে মনে হয়। প্রত্যেকটা লোকধারার একটা নিজস্ব চারণভূমি থাকে। স্থানচ্যুত হলে ধারাটি নিষ্প্রভ হয়ে যায়, হয়তো-বা বিলুপ্তও। রাঢ়বাংলার ঝুমুর যেমন ভাটি অঞ্চলে প্রভাব ফেলেনা, উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া যেমন উত্তর প্রদেশে প্রভাব ফেলবেনা, বাংলার কবিগানও উজবেকিস্তানে প্রভাব ফেলবে বলে মনে হয় না। পৃথিবী নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানে আবৃত। আছে নানা লোকধারা। এর একটি ধারা সারা বিশ্ব প্রভাবিত করবে কতটা– তা বলা মুশকিল। তবে লোকায়ত ধারাগুলো সামগ্রিকভাবে সামাজিক বৈষম্য দূর করতে অন্যতম ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে বলে মনে করা যেতে পারে।

১৬. *সমাজে নানাবিধ অসংগতি কবিগানের মাধ্যমে তুলে ধরা হলে সেটা সমাজ ও মানুষের কল্যাণে কতটুকু ভূমিকা রাখবে বলে আপনি মনে করেন ?*

সামাজিক অসংগতি কবিগানে তুলে ধরলে সেটা মানুষের কল্যাণে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। খেটেখাওয়া শ্রমজীবী মানুষ নিরক্ষর হতে পারে কিন্তু অশিক্ষিত নয়। কবিগায়কদের তারা আদর্শ মানুষ হিসেবে মান্যতা দেয়। তাই কবিগান তাদের জনজীবনে বিরাট প্রভাব ফেলে।

১৭. *কবিগানের বর্তমান অবস্থা কেমন বলে আপনি মনে করেন? অনুগ্রহ করে বিস্তারিত জানাবেন।*

আক্ষরিক অর্থে কবিগান এখন হয় না। যেটা হয় পাঁচালী আর ধূয়া গান। এ-দুটি কবিগানের মূল অঙ্গ নয়। আগে পাঁচালি দোহারদের বিশ্রাম দেওয়ার জন্য পাঁচ-দশ মিনিট হত। পাঁচালি একটু বেশি সময় বললে শ্রোতারা আপত্তি করত। মূল অঙ্গগুলো হল– তাক, মালশি, সখি সংবাদ এবং কবিগান। মালশি, সখি সংবাদ ও কবিগানের কিছু নির্দিষ্ট বিভাগ আছে। আছে তার নির্দিষ্ট সুর। এগুলো হল ধারণ, চিতান, ১ম ফুকার, মিশ, মুখ, পেচ, খোচ, ২য় ফুকার, ২য় মিশ, অন্তরা, পরচিতান, ৩য় ফুকার ও ৩য় মিশ। ৩য় ফুকার ও ৩য় মিশ অনেক সময় থাকেনা। মালশির কোনো জবাব থাকে না কিন্তু সখি সংবাদ ও কবিগানে জবাব থাকে। জবাবের আবার পাল্টা-জবাব হয় তাকে বলা হয় 'পালট'। এছাড়া বসন্ত, ভোর গোষ্ঠ আছে। ফাল্গুন, চৈত্র মাসে বসন্ত গাওয়া হত। রাত্রে গান আরম্ভ হলে রাত্রিশেষে ভোর গাওয়া হত। শেষে দুই কবির মিলন হত গোষ্ঠ দিয়ে। গোষ্ঠ ছাড়া সবগুলো দোহাররা গাইত। সেসব গান এখন আর হয় না। সে শ্রোতাও নেই।

১৮. *কবিগান যদি অতীতের মতো উজ্জ্বল অবস্থানে না থাকে, তবে ভালো অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?*

সংস্কৃতি হল প্রবহমান নদীর মতো। নিজেই নিজের পথ করে নেয়। আরোপিত কোনোপ্রক্রিয়া তাকে বাঁচাতে পারে না যতক্ষণ-না নিজে বাঁচার প্রক্রিয়া খুঁজে নেয়।

১৯. *কবি ও কবিগানের জন্য রাষ্ট্রীয় ও সরকারি পর্যায়ে কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?*

পশ্চিমবঙ্গে সরকারি অর্থানুকূল্যে একটি কবিগান একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে কবিগান শেখানো হয়। এছাড়া দুস্থ কবিয়ালদের বা যন্ত্রশিল্পীদের ভাতা, চিকিৎসা ব্যবস্থা সরকারিভাবে করা প্রয়োজন। জীবনে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা পেলে নতুন প্রজন্ম কবিগান শিখতে আগ্রহী হবে।

২০. *কবিগান টিকিয়ে রাখার জন্য গবেষণার প্রয়োজন অনস্বীকার্য– এ ক্ষেত্রে আপনার মতামত জানাবেন।*

কবিগানের গবেষণা কবিগণের মূল্যায়নের জন্য আবশ্যিক। কিন্তু ধারা টিকে থাকে তার উপভোক্তাদের দ্বারা। উপভোক্তারা মুখ ঘুরিয়ে নিলে টিকে থাকা মুশকিল।

২১. *এই গবেষণাকর্ম কি কবিগানের অতীত সামাজিক, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক অবদানের মতো বর্তমানেও কোনো ভূমিকা রাখবে বলে আপনি মনে করেন?*

হ্যাঁ, এটা মনে করা যেতে পারে।

আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

মহসিন হোসাইন-এর সাক্ষাৎকার

১. *কবিগানের উদ্ভবের পিছনে মূল কারণ কী ছিল বলে আপনি মনে করেন ?*

কবিগানের উৎপত্তি হয়েছিল প্রাচীন কালে। সনাতন ধর্মীদের দেবীপূজায় বন্দনাই ছিল প্রথমদিকে কবিয়ালদের প্রধান কর্তব্য। যে কারণে সৃষ্টি হয়েছিল ডাক, আগমনী ও মালশি। এর পরে কবিপাল্লায় যুক্ত হয় সখী সংবাদ। এই ধারার গান রাধাকৃষ্ণকে লক্ষ্য করে রচিত। সংক্ষেপে বলতে হয় দেবদেবী বন্দনাই ছিল কবিগান উদ্ভবের মূল কারণ। কবিগান উদ্ভবের সুনির্দিষ্ট কাল উল্লেখ করা যাবে না। তাই শত শত বছর আগে ধর্মাশ্রিত দেবদেবী বিষয়ক গান থেকেই কবিগানের উৎপত্তি বলে আমি মনে করি।

২. *কবিগানের উদ্ভবের পিছনে কোন কোন ব্যক্তির ভূমিকা অগ্রগণ্য বলে আপনি মনে করেন?*

ঔপনিবেশিক আমলে রাজা মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় গোঁজলা গুঁই, হরু ঠাকুর, রাম বসু, ভোলা ময়রা, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, প্রমূখের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তবে কবিয়াল অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির শিষ্য ছিলেন চব্বিশ পরগনা জেলার গোবিন্দ তাঁতি সরকার। আর এই কবিয়ালের বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন নড়াইল জেলার পাঁচু দত্ত সরকার। এই পাঁচু দত্ত কোলকাতায় যেমন কবিগান পরিবেশন করতেন তেমনি বৃহত্তর যশোরসহ সারা পূর্ববাংলায় কবিগান গাইতেন। পাঁচু দত্তের তিনজন শিষ্য ছিলেন; এঁরা হলেন রাসমোহন সরকার, ঈশ্বর বালা, রাইচরণ সরকার। উল্লেখিত কবিয়ালগণ বর্তমান পশ্চিমবাংলা ও বাংলাদেশের অসংখ্য কবির আসরে কবিগান পরিবেশন করেন। এসব কবিয়ালরাই কাশীনাথ সরকার, তারক সরকার, বিজয় নারায়ণ আচার্য, হরিচরণ আচার্য, হরিবর সরকার, মনোহর সরকার, রাজেন সরকার প্রমূখ কবিয়ালের সার্থক পূর্বসূরি।

৩. *কবিগানের স্বর্ণযুগ কোন সময়টি বলে আপনি মনে করেন?*

উনিশ শতকের দিকে কোলকাতায়ই ছিল কবিগানের স্বর্ণযুগ। তখন কোলকাতার কবিগানের ঢেউ যশোর এলাকায় পরিলক্ষিত হয়। ঐ সময় যশোরের তারকচন্দ্র সরকার-এর মাধ্যমেই এই স্বর্ণযুগের সূচনা ঘটে। পরবর্তীতে হরিবর সরকার, মনোহর সরকার, রাজেন সরকার, বিজয় সরকার, নিশি সরকার, নকুল সরকার প্রমুখ এ যুগের নেতৃত্ব প্রদান করে। এছাড়া ময়মনসিংহের বিজয়নারায়ণ আচার্য, নরসিংদীর হরিচরণ আচার্য, চট্টগ্রামের রমেশ শীল ইত্যাদি কবিয়ালের নাম উল্লেখযোগ্য। এ সময়কে পূর্ববাংলা বা বাংলাদেশের কবিগানের স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে।

৪. *বাংলাদেশে কবিগানে কাদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য বলে আপনি মনে করেন?*

বাংলাদেশে কবিগানের ক্ষেত্রে তারকচন্দ্র সরকার, হরিবর সরকার, মনোহর সরকার, বিজয় নারায়ণ আচার্য, হরিচরণ আচার্য, রাজেন সরকার, রমেশ শীল, নিশিকান্ত সরকার, বিনয় সরকার, বিজয় সরকার, নকুল সরকার, অনাদি সরকার, নারায়ণ সরকার, স্বরূপেন্দু সরকার প্রমুখ ব্যক্তির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য বলে আমি মনে করি।

৫. *কবিয়ালদের অনেকেই কবিয়াল, কবিওয়ালা, লোককবি, চারণ কবি বলে থাকেন তবে প্রকৃতপক্ষে তাঁদের কী ধরনের সম্বোধন করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?*

প্রকৃতপক্ষে কবিয়ালরা কখনো চারণ কবি, লোককবি নন। তাঁরা আসলে 'কবিয়াল' বলে আমি মনে করি। কবিয়াল শব্দটি অন্য কোনো শব্দের সাথে সম্পৃক্ত নয়।

৬. *কবিগানের ক্ষেত্রে রমেশ শীল, বিজয় সরকার, স্বরূপেন্দু সরকারের অবস্থান আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?*

রমেশ শীল ছিলেন গণমানুষের কবিয়াল। তিনি কমিউনিজমে বিশ্বাসী এবং একইসঙ্গে মাইজভাণ্ডারী তরিকায় বিশ্বাসী একজন কবিয়াল। গণমানুষের সুখ-দুঃখ, সমাজের উঁচু-নিচুর বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর গানের মধ্য দিয়ে। বিজয় সরকার ছিলেন অসাধারণ কবিত্বশক্তির অধিকারী। তাঁর অবস্থান ছিল জনপ্রিয়তার শীর্ষে। তিনি ভাটিয়ালী, বিচ্ছেদী ও আধাত্মিক গানের স্রষ্টা ছিলেন। তাঁর গানের কথা ও সুরের এত অপূর্ব মিলন যা শ্রোতাকে সজেই মন্ত্রমুগ্ধ করে তুলত। স্বরূপেন্দু সরকারের রচনা খুবই অসাধারণ ও বর্ণাঢ্য। তাঁর গানে আধুনিকতা ও সমাজসচেতনতার ছোঁয়া আছে। তিনি শুধু কবিয়ালই নন তিনি আধুনিক লোককবিও বটে। এছাড়া তাঁর লেখা গানের মধ্যে মতুয়া আদর্শের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

৭. *রাষ্ট্র, সমাজ, সরকার, শিল্পী ও গবেষকগণ কি আমাদের কবিয়ালদের যথাযথ মূল্যায়ন করেছেন? না করলে, এঁদের কিভাবে মূল্যায়ন করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?*

বাংলাদেশ কবিয়ালদের রাষ্ট্রীয়ভাবে তেমন কোনো মূল্যায়ন করা হয়নি। বহু আগে রমেশ শীল ও বিজয় সরকারকে একবার সম্মাননা দেয়া হয়েছিল। অথচ কবিয়ালরা হলেন আমাদের মূল সংস্কৃতির ধারক। তাঁদের গান, সুর, দর্শন ও জীবনবোধ আমাদের জীবনকে আলোকিত ও ত্বরান্বিত করার পিছনে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে। তবে রাষ্ট্রের উচিত এঁদের সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে ও আনুষ্ঠানিকভাবে এমন একটি সংকলনপত্র বা গবেষণাপত্র করা যাতে কে, কারা, কখন, কিভাবে, কোথায় কবিগান করছেন তার উদ্ভবকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

৮. *কবিয়াল রমেশ শীল, বিজয় সরকার, স্বরূপেন্দু সরকার-এর গান এখন সমাজে কতটুকু প্রচলিত আছে? সমাজের গতিশীলতার ক্ষেত্রে বর্তমানে এই কবিয়ালদের ভূমিকা কতটুকু?*

এঁদের গান সমাজে গতিশীলতার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করছে। কেননা আমরা দেখি গ্রামে বৈঠকি গান কিংবা ভক্তিমূলক গানের আসরে কবিয়ালদের অনেক গানের কথা কিংবা সুর নিয়ে শ্রোতারা আলোচনা করছেন। আমার জানামতে, বিজয় সরকারের অনেক ভক্ত সভা ও সমাজে বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে তাঁর গানের কথা তুলে ধরেন।

৯. *সামাজিক ও সাহিত্যিক মূল্যায়নে কবিগানের অবস্থান কোথায়?*

হ্যাঁ, আছে। পল্লিকবি জসীমউদ্দীন তাঁর 'জীবন কথা' গ্রন্থে কবির পাল্লা করার কথা সরাসরি স্বীকার করছেন। তিনি যে অলইন্ডিয়া বেতার কেন্দ্রে কবিয়াল বিজয় সরকারের সাথে কবির পাল্লা করছেন তা সর্বজনবিদিত। ভারতের সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা সিরাজও প্রথমজীবনে আসরে আসরে কবিগান করেছেন। অন্যমতে সৈয়দ সাহেব ছিলেন আলকাপ গানের গায়ক। আর আমি তো বিজয় সরকারের দলে (গুরুনাথ কবিপার্টি) এক যুগেরও বেশি বাঁধনদার বা কবিগান করেছি। জাতীয় কবি নজরুল কবিয়াল ছিলেন না তবে তিনি কবিগানের প্রায় সমপর্যায়ের ধারা লেটোর দলে কাজ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখা 'কবি সংগীত' প্রবন্ধের অনেক জায়গায় কবিগানের উচ্ছাসিত প্রশংসা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ পল্লি কৃষকের ঘরে জন্মালে আশা করেছিলেন 'কবিয়ালরূপে গ্রামে গ্রামে গাওনা গেয়ে বেড়াতাম'। আমি মনে করি কবিগান আধুনিক কবির সাহিত্যিকদেরও সৃষ্টির উন্মাদনা দিয়েছে। এককালের কোনো কোনো কবিয়াল তো আজ আধুনিক সাহিত্যসাধনায় যুগোত্তীর্ণ। সুতরাং আমি আশা রাখি আগামী দিনের প্রজন্ম

বা বংশধর কবিগানের ওপরে আরো বেশি কাজ করবে। যাতে কবিগানের সামাজিক ও সাহিত্যমূল্য বজায় থাকে।

১০. *আপনার মতে রমেশ শীল, বিজয় সরকার, স্বরূপেন্দু সরকার-এর গানের ভাব-দর্শন সমাজে কোনো পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে কি না? যদি সমাজে কোনো পরিবর্তন ঘটে থাকে তাহলে অনুগ্রহ করে সংক্ষেপে উল্লেখ করবেন।*

রমেশ শীলের গান শুনে সে যুগের মানুষ রাজপথে নেমেছে, জেল খেটেছে, ন্যায্য দাবি আদায় করেছে। বিজয় সরকার ও স্বরূপেন্দু সরকার মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে গিয়ে কবির দল গঠন করেছেন এবং সেখানে মুক্তিযুদ্ধের গান বেঁধেছেন। সেখানকার শরণার্থীরা গান শুনে মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। এই তিন কবিয়ালের গানের কথা ও সুর মানুষকে প্রেরণা ও কাজে উৎসাহ দিয়েছে। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠনের কাজে তাঁদের গানের আদর্শ সমাজে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছে।

১১. *বিজয় সরকার কবিগান করতে গিয়ে বাংলাদেশে কোনো প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হয়েছেন কি না? হলে সেটা উপস্থাপন করুন।*

এ ধরনের সমস্যা সাধারণত দক্ষিণাঞ্চলে দেখা যেত। তখন কবিগান করতেন নমঃশূদ্র কবিয়ালেরা। গানের আসর বসত ব্রাহ্মণ কায়স্থ এলাকায়। তখন ঐ এলাকার লোকজন নমঃশূদ্রদের অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। তাঁরা কবির লোকদের খাবার দিতেন কলাপাতায় এবং বলতেন, কলাপাতা তোমরা ফেলে দিয়ে আসবে। অর্থাৎ এগুলো তাঁরা ধরলে তাঁদের কৌলিন্য নষ্ট হয়ে যাবে। এমনকি তাঁদের পবিত্রতা হারাবে। বর্ণবিদ্বেষের কারণে এ রকম বহু ঘটনা ঘটেছে।

১২. *বিজয় সরকার-এর কবির দলে সহশিল্পী হিসেবে কাদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য বলে আপনি মনে করেন?*

দোহার ও যন্ত্রশিল্পী হিসেবে গাইয়ে নগেন মাস্টার, গাইয়ে সদানন্দ মল্লিক, হারমোনিয়াম বাদক ধীরেন্দ্রনাথ রায়। ম্যানেজার ও গাইয়ে মতিবাবু, কালীদাশ শিকদার এবং দীপক বিশ্বাস প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

১৩. *কবিগানে জীবনবোধ ও তৎকালীন সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ছিল কি না ?*

হ্যাঁ, কবিগানে জীবনবোধ ও সমাজব্যবস্থার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তৎকালীন সমাজে হিন্দুদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য অনেকে গান রচনা করেছেন। শুধু গানই রচনা করেননি, বিজয় সরকার নিজের গ্রামের এক বিধবা নারীকে বিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁকে অপদস্থও হতে হয়েছে। তবে বিয়ে টিকিয়েছিলেন তিনি। সমাজের নানা অসঙ্গতি ও দুরবস্থা থেকে মুক্তির জন্য সমাজসচেতন গান লিখতে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করে।

১৪. *অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবিগান প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে সমাজপতিদের কী ধরনের ভূমিকা ছিল?*

১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের পরে মুসলমান শাসনব্যবস্থার যখন অবনতি ঘটে, ইংরেজ আমল শুরু হয়, তখন একটা বিভেদ সৃষ্টি হয়। এমন এক সময় নবগঠিত জমিদারদের মনতুষ্টির জন্য কিংবা চিত্তবিনোদনের জন্য দেশীয় বারবনিতা কিংবা কবিয়ালদের মাধ্যমে বাড়িতে আসর বসিয়ে নাচ-গান পরিবেশনের আসর বসনো হত। এগুলোর উদ্যোক্তা ছিলেন জমিদার শ্রেণির লোকজন। এসব বিত্তবান জমিদার শ্রেণি কবিগানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁরা টপ্পা, খেমটাগানের পর্যায়ে কবিগানকেও দেখতে পছন্দ করতেন।

১৫. *বর্তমান বিশ্বে বিরাজমান বৈষম্য ও অশান্তি কবিগান প্রচারের মাধ্যমে নিরসন করা সম্ভব– এ-কথার সাথে আপনি একমত কি না? সম্ভব হলে সেটা কিভাবে?*

হ্যাঁ, অবশ্যই সম্ভব। যদি আমরা আন্তরিকভাবে কবিগানের প্রচার ও প্রসার ঘটাই কিংবা এ গান যদি জাতীয়ভাবে বিভিন্ন মিডিয়ায় এমনকি টিভি, রেডিওতে প্রচার করা হয় এবং গানের মধ্যে যদি জাত-পাতের বিরুদ্ধে তথ্য দিই তাহলে সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করবে। কবিগানকে অবশ্যই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায় হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

১৬. *সমাজে নানাবিধ অসংগতি কবিগানের মাধ্যমে তুলে ধরা হলে সেটা সমাজ ও মানুষের কল্যাণে কতটুকু ভূমিকা রাখবে বলে আপনি মনে করেন?*

কবিগান সমাজ ও মানুষের কল্যাণে অবশ্যই ভূমিকা রাখবে। তবে এক্ষেত্রে কবিগানকে গণমূখী করতে হবে। মানুষের কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে– তাহলে এর সুফল পাওয়া সম্ভব।

১৭. *কবিগানের বর্তমান অবস্থা কেমন বলে আপনি মনে করেন? অনুগ্রহ করে বিস্তারিত জানাবেন।*

কবিগানের বর্তমান অবস্থা আমার কাছে নাজুক বলে মনে হয়। তবে বর্তমানে যারাই গান করছেন এঁদের মধ্যে নতুন সৃষ্টি খুবই কম– চর্বিত চর্বণই বেশি।

১৮. *কবিগান যদি অতীতের মতো উজ্জ্বল অবস্থানে না থাকে, তবে ভালো অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?*

কবিগানকে ভালো অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদের সবাইকে জাতীয়ভাবে সংঘবদ্ধ হতে হবে। এককভাবে এটা সম্ভব নয় । সরকারিভাবে সরাসরি সহযোগিতা করলে এখান থেকে উত্তরণ ঘটানো সম্ভব।

১৯. *কবি ও কবিগানের জন্য রাষ্ট্রীয় ও সরকারি পর্যায়ে কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?*

কবি ও কবিগানে রাষ্ট্র ও সরকারের উচিত; যেমন বিটিভিতে সপ্তাহে একদিন কবিগানের আসর করা তাহলে গ্রামপর্যায়ের লোকজন দেখতে পারবে, এমনকি তাদের কবিগান সম্পর্কে একটি পজেটিভ ধারণা তৈরি হবে। এছাড়া বছরে একবার বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মাধ্যমে কবিয়াল সম্মেলন করা যেতে পারে। যেখানে বাংলাদেশের বিখ্যাত কবিয়ালগণ আসবেন। এই কাজটি করলে সারা দেশ জেগে উঠবে। এসব কবিয়ালদের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে গ্রামেগঞ্জে কবিগান পরিবেশনের ব্যবস্থা করে সরকার কবিগানকে উৎসাহিত করতে পারে।

২০. *কবিগান টিকিয়ে রাখার জন্য গবেষণার প্রয়োজন অনস্বীকার্য– এ ক্ষেত্রে আপনার মতামত জানাবেন।*

গবেষকগণ বিভিন্ন এলাকার কবিগান সংগ্রহ করে বই আকারে প্রকাশ করতে পারেন। এক্ষেত্রে বাংলা একাডেমিকে সম্পৃক্ত করতে হবে। তাহলে এটা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

২১. *এই গবেষণাকর্ম কি কবিগানের অতীত সামাজিক, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক অবদানের মতো বর্তমানেও কোনো ভূমিকা রাখবে বলে আপনি মনে করেন?*

আমি আশা করি এই গবেষণা অবশ্যই ভূমিকা রাখবে। কবিয়ালদের নিয়ে কাজ করলে প্রথমত আমাদের মূল্যবোধ জাগতে পারে দ্বিতীয়ত এঁদের সংগীতে যে ঐতিহ্য ছিল যা আমাদের ধর্মবোধ ও ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করবে।

আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

স্বরোচিষ সরকার-এর সাক্ষাৎকার

১. *কবিগানের উদ্ভবের পিছনে মূল কারণ কী ছিল বলে আপনি মনে করেন ?*

যে কোনো শিল্প সৃষ্টির পেছনে কাজ করে একদিকে শিল্পীর আভ্যন্তরীণ তাগিদ, অন্যদিকে ভোক্তার আগ্রহ। কবিগান সৃষ্টির পেছনেও একই নিয়ম প্রযোজ্য বলে আমার মনে হয়। আঠারো শতকের বাংলাদেশে নানা ধরনের লোকসংগীত মিশ্রিত হয়ে কবিগানের উদ্ভব ঘটে। তৎকালীন মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিনোদনের উপায় হিসেবে তা জনপ্রিয়তা পায়। এটাই কবিগানের উদ্ভবের মূল কারণ বলে আমি মনে করি।

২. *কবিগানের উদ্ভবের পিছনে কোন কোন ব্যক্তির ভূমিকা অগ্রগণ্য বলে আপনি মনে করেন ?*

সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির ভূমিকা থাকার চেয়ে বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর ভূমিকা থাকাটাই স্বাভাবিক। প্রথমে কোন কবিয়াল এই ধরনের গান প্রথম পরিবেশন করেছিলেন, তার কোনো ইতিহাস কারো জানা নেই। তাছাড়া যেসব মধ্যবিত্ত শ্রোতা সেইসব কবিয়ালদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, তাঁদের নামও আজ অজানা।

৩. *কবিগানের স্বর্ণযুগ কোন সময়টি বলে আপনি মনে করেন?*

কবিগানের স্বর্ণযুগ বললে অন্তত দুটি যুগের কথা বলতে হয়। প্রথমত উনিশ শতকের প্রথমার্ধের কোলকাতা। যখন ভোলা ময়রা-অ্যান্টনি ফিরিঙ্গিরা গাইতেন। এটাকে বলা যায় কবিগানের প্রথম স্বর্ণযুগ। দ্বিতীয়ত বিশ শতকের গোড়ার দিককার পূর্ববঙ্গ। এর সূচনাকারী হিসেবে যশোরের তারকচন্দ্র সরকারের নাম সর্বাগ্রগণ্য। তাঁর বয়ঃকনিষ্ঠদের মধ্যে হরিচরণ আচার্য, বিজয়নারায়ণ আচার্য, মনোহর সরকার, হরিবর সরকার, রাজেন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখ কবিয়াল নতুন একটা যুগ তৈরি করেছিলেন, যেটাকে দ্বিতীয় স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে।

৪. *বাংলাদেশে কবিগানে কাদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য বলে আপনি মনে করেন?*

কবিগানের বাংলাদেশ পর্ব শুরু হয়েছিল যশোরের তারকচন্দ্র সরকারের হাতে। তারপর কবিগান কয়েকটি অঞ্চলে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। এসব অঞ্চলে বেশ কয়েকজন কবিয়াল নিজের এলাকা ছাড়িয়ে অন্যত্রও জনপ্রিয় হয়েছিলেন। এমনকি পূর্ববঙ্গের সীমানা ছাড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গ, এমনকি আসাম-ত্রিপুরাতেও তাঁদের জনপ্রিয়তা তৈরি হয়েছিল। বিশেষভাবে বিশ শতকের এমন কয়েকজন কবিয়ালের মধ্যে ঢাকা অঞ্চলের হরিচরণ আচার্য, ময়মনসিংহ অঞ্চলের বিজয়নারায়ণ আচার্য, গোপালগঞ্জ অঞ্চলের রাজেন্দ্রনাথ সরকার ও নিশিকান্ত সরকার, বরিশাল অঞ্চলের নকুল দত্ত, চট্টগ্রাম অঞ্চলের রমেশ শীল, যশোর অঞ্চলের বিজয় সরকার, খুলনা অঞ্চলের স্বরূপেন্দু সরকার।

৫. *বাঙালি জনমানসে কোন কোন কবিয়াল উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছেন বলে আপনি মনে করেন?*

আধুনিক কালের অর্থাৎ বিশ শতকের কথা বিবেচনায় রাখলে রাজেন্দ্রনাথ সরকার, বিজয় সরকার, রমেশ শীল প্রমুখের প্রভাব বাঙালি জনমানসে অধিক বলে আমি মনে করি।

৬. *কবিগানের ক্ষেত্রে রমেশ শীল, বিজয় সরকার, স্বরূপেন্দু সরকারের অবস্থান আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?*

কবিগানে দুজন কবিয়াল পরস্পরবিরোধী চরিত্রে এক ধরনের অভিনয় করে থাকেন। তাই তাৎক্ষণিকভাবে কবিগান দিয়ে তাঁদের মূল্যায়ন করা কঠিন। তবে তাঁদের পূর্বরচিত কিছু গান থাকে, সেগুলো দিয়ে কিছু মন্তব্য করা যেতে পারে। সেই সূত্রে রমেশ শীল ছিলেন বামপন্থায় বিশ্বাসী এবং একই সঙ্গে মাইজভাণ্ডারী তরিকায় বিশ্বাসী একজন কবিয়াল। উভয় পন্থার প্রচার ও প্রসারে তাঁর গান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বিজয় সরকার ছিলেন অসাধারণ কবিত্বশক্তির অধিকারী। সহজ সরল ভাষায় লেখা তাঁর গানগুলোর কথা হৃদয়গ্রাহী। আবার সেই গানগুলোতে যখন তিনি ভাটিয়ালি সুর আরোপ করতেন, তা শ্রোতাকে মুগ্ধ করত। স্বরূপেন্দু সরকারের গানে একদিকে যেমন তীব্র সমাজসচেতনতা লক্ষ করা যায়, লক্ষ করা যায় প্রবল জাতীয়তাবাদ। এছাড়া মতুয়া আদর্শের প্রচারক হিসেবেও তাঁর রচনা জনপ্রিয়।

৭. *রাষ্ট্র, সমাজ, সরকার, শিল্পী ও গবেষকগণ কি আমাদের কবিয়ালদের যথাযথ মূল্যায়ন করেছেন? না করলে, এঁদের কিভাবে মূল্যায়ন করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?*

বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার আগে ও পরে বহু কবিয়াল রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মানিত হয়েছেন। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সংগঠন দ্বারাও তাঁরা বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ষাটের দশকে রমেশ শীলকে বুলবুল ললিতকলা একাডেমি থেকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। কয়েক বছর আগে বিজয় সরকারকে একুশে পদক দেওয়া হয়েছে। স্বরূপেন্দু সরকারকেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন পুরস্কৃত করেছে। তবে সবচেয়ে বড় পুরস্কার হল সাধারণের মনের মধ্যে স্থায়ী আসন লাভ করা। সেই আসন এই তিনজনই ভালোভাবে পেয়েছেন।

৮. *কবিয়াল রমেশ শীল, বিজয় সরকার, স্বরূপেন্দু সরকার-এর গান এখন সমাজে কতটুকু প্রচলিত আছে? সমাজের গতিশীলতার ক্ষেত্রে বর্তমানে এই কবিয়ালদের ভূমিকা কতটুকু?*

রমেশ শীলের গান মাইজভাণ্ডার তরিকার লোকজন ব্যবহার করে। মাইজভাণ্ডার তরিকার মধ্যে যে অসাম্প্রদায়িকতা ও লৌকিক উদার আদর্শ রয়েছে, তার পেছনে রমেশ শীলের গানের ভূমিকা থাকা সম্ভব। বিজয় সরকার এবং স্বরূপেন্দু সরকারের বহু গান আজকাল অনেক শিল্পী বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে পরিবেশন করেন। সামাজিক অসাম্য দূর করতে তাঁদের গান পরোক্ষভাবে কাজ করে।

৯. *সামাজিক ও সাহিত্যিক মূল্যায়নে কবিগানের অবস্থান কোথায় ?*

সমাজের সৃজনশীলতার সাক্ষ্য হিসেবে কবিগান মূল্যবান। তাৎক্ষণিক বুদ্ধিমত্তার যে প্রতিফলন কবিগানে ঘটে, তা অসাধারণ। বহু সমালোচকের নিকট কবিগানের সাহিত্যমূল্য মূল্যবান।

১০. *আপনার মতে রমেশ শীল, বিজয় সরকার, স্বরূপেন্দু সরকার-এর গানের ভাব-দর্শন সমাজে কোনো পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে কি না? যদি সমাজে কোনো পরিবর্তন ঘটে থাকে তাহলে অনুগ্রহ করে সংক্ষেপে উল্লেখ করবেন।*

সকল কবিয়ালই লোকশিক্ষকের ভূমিকা পালন করেন। পূর্ববর্তী রচনা বা তৎকালীন বহু রচনায় তাঁরা কী করণীয় সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রচার করেন। এ কাজে তাঁরা তিনজনই দক্ষ। সাম্যবাদের প্রচারে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রচারে, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠনের কাজে তাঁদের প্রচারিত আদর্শ সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে।

১১. *স্বরূপেন্দু সরকার কবিগান করতে গিয়ে বাংলাদেশে কোনো প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হয়েছেন কি না? হলে সেটা উপস্থাপন করুন।*

ষাটের দশকে বরিশাল জেলা শহরের একটি প্রদর্শনীতে 'বলদের কবি' নামে একটি কবিগান পরিবেশন করতে গিয়ে স্বরূপেন্দু সরকার বিরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন। গানটির

মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী মনোভাব ও বাঙালির বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব প্রকাশ হওয়ায় তাঁকে ডেকে নিয়ে ভর্ৎসনা করা হয়।

১২. *স্বরূপেন্দু সরকার-এর কবির দলে সহশিল্পী হিসেবে কাদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য বলে আপনি মনে করেন?*

যন্ত্রসঙ্গতকারী হিসেবে ছিলেন ঢুলিবাদক শান্তিরঞ্জন বিশ্বাস, হারমোনিয়ম বাদক ব্রজেন্দ্রনাথ, কাঁসিবাদক রঞ্জন, দোতারাবাদক মনীন্দ্রনাথ এবং দোহার হিসেবে সতীশ মণ্ডল, খগেন বিশ্বাস, শোভানন্দ সরকার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

১৩. *কবিগানে জীবনবোধ ও তৎকালীন সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ছিল কি না?*

কোনো শিল্পীই সমাজবিচ্ছিন্ন নন। কবিয়ালও তাঁর সমাজেরই সৃষ্টি। তাই সেই সমাজের নানা অসঙ্গতি ও দুরবস্থা তাঁদের অনুপ্রাণিত করে এবং সমাজসচেতন গান লিখতে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করে।

১৪. *অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবিগান প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে সমাজপতিদের কী ধরনের ভূমিকা ছিল?*

আঠারো শতকের বিত্তবান জমিদার শ্রেণি কবিগানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁরা তাঁদের বিনোদনের উপায় হিসেবে কবিগানের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। কিন্তু পরিহাসের বিষয় হল, কবিয়ালগণ অনেক সময়ে ঐ পৃষ্ঠপোোষকদের সমালোচনাতেও পিছপা হননি।

১৫. *বর্তমান বিশ্বে বিরাজমান বৈষম্য ও অশান্তি কবিগান প্রচারের মাধ্যমে নিরসন করা সম্ভব– একথার সাথে আপনি একমত কি না? সম্ভব হলে সেটা কিভাবে?*

যে কোনো ধরনের শিল্পকে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কবিগানের প্রতি বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের যেহেতু এক ধরনের শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে, তাই কবিগানকে অবশ্যই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায় হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

১৬. *সমাজে নানাবিধ অসংগতি কবিগানের মাধ্যমে তুলে ধরা হলে সেটা সমাজ ও মানুষের কল্যাণে কতটুকু ভূমিকা রাখবে বলে আপনি মনে করেন ?*

কবিগানের প্রকৃতির মধ্যেই সমাজের খারাপ দিক তুলে ধরার বিষয়টি রয়েছে। তাই এ কাজে কবিগানের গুরুত্ব আছে।

১৭. *কবিগানের বর্তমান অবস্থা কেমন বলে আপনি মনে করেন? অনুগ্রহ করে বিস্তারিত জানাবেন।*

সময়ের পরিবর্তনে কবিগানে নানা পরিবর্তন ঘটেছে, এমনকি নানা ধরনের রূপান্তরও ঘটেছে। এই সূত্রে আঠারো শতকের কবিগান এবং উনিশ শতকের কবিগানের আঙ্গিক ও বিষয় আলাদা হয়ে যায়। একইভাবে বিশ শতকের কবিগান এমনকি একুশ শতকের কবিগানও আলাদা হয়ে গেছে। উনিশ ও বিশ শতকের কবিগানের তুলনায় একুশ শতকের কবিগান খুব সংক্ষিপ্ত একটি পরিবেশনা। এখন শুধু ধুয়াগান ও ছড়াকাটার মধ্যেই কবিগান সীমাবদ্ধ। এটাই হয়তো বর্তমান সময়ের শ্রোতাদের চাহিদা।

১৮. *কবিগান যদি অতীতের মতো উজ্জ্বল অবস্থানে না থাকে, তবে ভালো অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?*

নানা ধরনের অডিও-ভিডিও মাধ্যমে কবিগানকে উৎসাহিত করা যায়। কেননা এই মাধ্যমটির প্রতি সাধারণের এক ধরনের ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে।

১৯. *কবি ও কবিগানের জন্য রাষ্ট্রীয় ও সরকারি পর্যায়ে কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?*

কবিয়ালদের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে এবং বিশেষভাবে গ্রামে-গঞ্জে কবিগান পরিবেশনের জন্য যে সামাজিক নিরাপত্তা দরকার তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সরকার কবিগানকে উৎসাহিত করতে পারে।

২০. *কবিগান টিকিয়ে রাখার জন্য গবেষণার প্রয়োজন অনস্বীকার্য– এ ক্ষেত্রে আপনার মতামত জানাবেন।*

প্রতিভাবান কবিয়ালগণ যদি কবিগান করতে এগিয়ে আসেন এবং কবিগানকে যুগোপযোগী করে তুলতে পারেন, তাহলে কবিগান টিকে থাকবে। গবেষণা করে কোনো শিল্পকে টিকিয়ে রাখা যায় না, শিল্পটি সম্পর্কে জানা যায় মাত্র।

২১. *এই গবেষণাকর্ম কি কবিগানের অতীত সামাজিক, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক অবদানের মতো বর্তমানেও কোনো ভূমিকা রাখবে বলে আপনি মনে করেন?*

আমি আশা করি এই গবেষণা সংশ্লিষ্টজনদের কবিগান সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করবে এবং তাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্র থেকে কবিগানের মতো এমন একটি উজ্জ্বল লোকমাধ্যমকে টিকে থাকতে ও এর বিকাশ ঘটাতে ভূমিকা পালন করবেন।

আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদের সম্পর্কে তথ্য

১. যতীন সরকার

বয়স : ৮৩
বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত
শিক্ষাগত যোগ্যতা : এম এ (বাংলা ভাষা ও সাহিত্য)
পেশা : অবসরপ্রাপ্ত (চাকরি)
ঠিকানা: বানপ্রস্থ, সাতপাই, নেত্রকোনা।
দেশ : বাংলাদেশ
দূরালাপনী : ০১৭১১৩৯১৬১০
ই-মেইল : প্রযোজ্য নয়।

২. কাজল অধিকারী

বয়স : ৭২
বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত
শিক্ষাগত যোগ্যতা : বি.এস.সি
পেশা : অবসরপ্রাপ্ত (ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়া)
ঠিকানা: কেউটিয়া, চব্বিশ পরগনা, ভারত।
দেশ : ভারত
দূরালাপনী : +৯১৯৮৩১০৭৭২৩৭
ই-মেইল : প্রযোজ্য নয়।

৩. মহসিন হোসাইন

বয়স : ৬৬
বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত
শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিএ (সম্মান) অধ্যায়ন
পেশা : গীতিকার, সুরকার, শিল্পী।
ঠিকানা: গ্রাম : কলাবাড়িয়া, উপজেলা : কালিয়া, জেলা : নড়াইল।
দেশ : বাংলাদেশ
দূরালাপনী : ০১৭১৫৬৫৩৮৬৭
ই-মেইল : mohisn24@gmail.com

৪. স্বরোচিষ সরকার

বয়স : ৬০
বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত
শিক্ষাগত যোগ্যতা : এমএ পিএইচডি
পেশা : শিক্ষকতা
ঠিকানা: অধ্যাপক, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
দেশ : বাংলাদেশ
দূরালাপনী : ০১৭১৫-২৯৯৩৫৭
ই-মেইল : swarocish@yahoo.com

Dhaka University Institutional Repository

আলোকচিত্র

Dhaka University Institutional Repository

সমাজসংস্কারক কবিয়াল রমেশ শীল

চট্টগ্রামের বোয়ালখালি থানায় গোমদণ্ডী গ্রামে রমেশ শীল-এর পৈত্রিক বাড়ি

Dhaka University Institutional Repository

বাম থেকে পল্লিকবি জসীমউদদীন, কবিয়াল রমেশ শীল ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আবুল ফজল

কবিয়াল রমেশ শীল-এর নিজ বাড়িতে গানের মঞ্চ

Dhaka University Institutional Repository

কবিগানের প্রাণপুরুষ বিজয় সরকার

নড়াইল জেলার ডুমদি গ্রামে বিজয় সরকারের বাসভবন ও মন্দির

Dhaka University Institutional Repository

কবিয়াল বিজয় সরকার-এর স্মরণে ডুমদি গ্রামে তাঁর নিজ বাড়িতে সরকার কর্তৃক নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ

ভারতের চব্বিশ পরগনায় কেউটিয়া গ্রামে এই ভবনে জীবনের শেষদিনগুলো অতিবাহিত করেন কবিয়াল বিজয় সরকার

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিকমনস্ক ও সমাজসচেতন কবিয়াল স্বরূপেন্দু সরকার

বাগেরহাট জেলার চিতলমারি থানায় চরবানিয়ারি গ্রামে নিজ বাসভবনে কবিয়াল স্বরূপেন্দু সরকার ও তাঁর স্ত্রী

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকা'র বাংলা একাডেমি মঞ্চে কবিগান পরিবেশনরত কবিয়াল স্বরূপেন্দু সরকার

বাগেরহাট জেলায় চিতলমারি থানায় চরবানিয়ারি গ্রামে নিজ বাড়িতে কবিয়াল স্বরূপেন্দু সরকার-এর সমাধিস্থান

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১. দীপক বিশ্বাস, *কবিগান*, কোলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, ২০০৪।
২. দীনেশচন্দ্র সিংহ, *কবিয়াল কবিগান*, কোলকাতা : সৌদামিনী সিংহ, ১৯৭৭।
৩. দীনেশচন্দ্র সিংহ, *পূর্ববঙ্গের কবিয়াল কবি-সঙ্গীত*, কোলকাতা, ১৯৯০।
৪. দীনেশচন্দ্র সিংহ, *পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৭।
৫. দীনেশচন্দ্র সিংহ, *নকুলেশ্বর গীতিমাল্য*, কোলকাতা : দে বুক স্টোর, ১৯৮৬।
৬. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, *কবিজীবনী*, ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত, কোলকাতা : ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৫৮।
৭. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *কবি*, পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা : স্টান্ডার্ড পাবলিশার্স লি., ১৯৬১।
৮. উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও রেণুকা বিশ্বাস, সম্পাদক, *বাংলার লোককবি সরকার বিজয় অধিকারী গীতিমালা*, কোলকাতা, ১৯৮৩।
৯. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, *চতুর্থ খণ্ড*, কোলকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সি, ১৯৭৩।
১০. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, *কবিতা সংগ্রহ*, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, কোলকাতা : কেদারনাথ রায়, ১৮৮৫।
১১. এস. এম. নূর-উল-আলম, *চট্টগ্রামের কবিয়াল ও কবিগান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৩।
১২. কল্যাণী ঘোষ, *চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮।
১৩. কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর ও গোপাল বিশ্বাস, সম্পাদক, *বাংলার কবিগান ও লোককবি বিজয় সরকার*, কোলকাতা : চতুর্থ দুনিয়া, ২০০২।
১৪. কালীপ্রসন্ন সিংহ, *হুতোম প্যাঁচার নকশা*, কোলকাতা : মনোমোহন প্রকাশনী, ১৯৮৩।
১৫. খগেন্দ্রনাথ মিত্র, *কীর্তন*, কোলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৪৫।
১৬. আবুল হাসান চৌধুরী, *বাংলাদেশের লোকসংগীতে প্রেমচেতনা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০১।
১৭. জসীমউদ্‌দীন, *জীবনকথা*, ঢাকা : পলাশ প্রকাশনী, ১৯৬৪।
১৮. জসীমউদ্‌দীন, *জারীগান*, ঢাকা : কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৬৮।
১৯. তারকচন্দ্র সরকার, *শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত*, *৭ম সংস্করণ*, ওড়াকান্দি, ১৯৭১।
২০. দেবেশ রায়, *বরিশালের যোগেন মণ্ডল*, কোলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১০।
২১. নিরঞ্জন চক্রবর্তী, *ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য*, কোলকাতা, ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং, ১৯৫৮।
২২. নূর মহম্মদ টেনা, *খুলনার লোককবি*, খুলনা : কালান্তর প্রকাশনী, ১৯৮১।
২৩. পুলক চন্দ, *গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তাঁর গান*, কোলকাতা : কথাশিল্প, ১৯৭৮।
২৪. ইয়াকুব আলী, *কবিগান*, চট্টগ্রাম, ১৯৬৭।
২৫. পূর্ণেন্দু দস্তিদার, *কবিয়াল রমেশ শীল*, কোলকাতা, ১৯৬৩
২৬. প্রফুল্লচন্দ্র পাল, *প্রাচীন কবিওয়ালার গান*, কোলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮।
২৭. বাদল বরণ বড়ুয়া ও সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, সংকলক, *কবিয়াল ফণী বড়ুয়া : জীবন ও রচনা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭।
২৮. হরিচরণ আচার্য, *বঙ্গের কবির লড়াই*, পুনর্মুদ্রণ, নরসিংদী, দীপকচন্দ্র দাস, ২০০৬, প্রথম প্রকাশ ১৯৩০।
২৯. হরিচরণ আচার্য, *কবি ঝঙ্কার*, *১ম খণ্ড*, নরসিংদী, জিতেন্দ্র কিশোর মৌলিক, ১৯২৯।
৩০. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *গৌরবঙ্গ সংস্কৃতি*, কোলকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৯৭২।
৩১. বাসুদেব গোলদার, *শ্রীশ্রী গুরু পাগল বিজয়ামৃত*, বনগাঁ, ১৯৮৬।
৩২. বিষ্ণুপদ বাগচী, *তারকচন্দ্র সরকার*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮।
৩৩. ভারতচন্দ্র রায়, *ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের গ্রন্থসঙ্কলনপুস্তিকা*, কোলকাতা : অরুণোদয় ঘোষ, ১৮৭৮।
৩৪. মযহারুল ইসলাম, *কবি পাগল কানাই*, রাজশাহী : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯।
৩৫. মহানন্দ হালদার, *শ্রীশ্রী গুরুচাঁদচরিত*, খুলনা : মতুয়া মহাসংঘ, ১৯৪৪।
৩৬. মহসিন হোসাইন, *কবিগান এবং চারণকবি আচার্য রাজেন্দ্রনাথ*, যশোর, ১৯৭৯।
৩৭. মহসিন হোসাইন, *ভাটিয়ালী গানের রাজা পাগল বিজয়*, যশোর, ১৯৮০।
৩৮. মহসিন হোসাইন, *কবিয়াল বিজয় সরকারের জীবন ও সঙ্গীত*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

৩৯. মহসিন হোসাইন, *বিজয় সরকার*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮।
৪০. মহসিন হোসাইন, *বৃহত্তর যশোরের লোককবি ও চারণকবি*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮।
৪১. মহসিন হোসাইন, *নদী চলে সাগর সন্ধানে*, ঢাকা : মনন প্রকাশ, ২০১৪।
৪২. মহসিন হোসাইন, *রমেশ শীল*, ঢাকা : যুক্ত, ২০০৯।
৪৩. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১।
৪৪. স্বরোচিষ সরকার, *মুকুন্দদাস*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩।
৪৬. স্বরোচিষ সরকার, *যোগেশচন্দ্র বাগল*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩।
৪৭. বিষ্ণুপদ বাগচী, *তারকচন্দ্র সরকার*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮।
৪৮. মামুন তরফদার, *টাঙ্গাইলের লোক-ঐতিহ্য*, ঢাকা : ক্যাবকো পাবলিকেশন্স, ২০০৬।
৪৯. মাযহারুল ইসলাম তরু, *বাংলার বৈচিত্র্যময় লোকসঙ্গীত*, ঢাকা : শোভাপ্রকাশ, ২০০৯।
৫০. মাহবুবুল হক ও শিশির দত্ত, *সমকালের কবিয়াল*, চট্টগ্রাম : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব থিয়েটার আর্টস, ২০০৭।
৫১. পবিত্র সরকার, *লোকভাষা লোকসংস্কৃতি*, কোলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৯১
৫২. মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা, *বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য*, ঢাকা : স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৭।
৫৩. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, *হারামণি*, *৭ম খণ্ড*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৬৪।
৫৪. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, *হারামনি*, *১০ম খণ্ড*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪।
৫৫. মো. মাহবুবর রহমান ও স্বরোচিষ সরকার, সম্পাদক, *বিশ শতকের বাংলা*। রাজশাহী : ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ২০১০।
৫৬. মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী, *বাংলাদেশের লোকসংগীত পরিচিতি*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৭৩।
৫৭. যতীন সরকার, *বাংলাদেশের কবিগান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫।
৫৮. যতীন সরকার, *হরিচরণ আচার্য*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৯।
৫৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, *ষষ্ঠ খণ্ড*, কোলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৪১।
৬০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলি*, *১৩শ খণ্ড*, কোলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৬১।
৬১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *লোকসাহিত্য*, কোলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৭০।
৬২. লোকেশ্বর বসু, *আমাদের পদবীর ইতিহাস*, কোলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮১।
৬৩. শফিকুর রহমান চৌধুরী, সম্পাদক, *বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪।
৬৪. শাহিদা খাতুন, সম্পাদক, *বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংগ্রহমালা ১ : কবিগান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১০।
৬৫. শিবনাথ শাস্ত্রী,*রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, কোলকাতা : এস কে লাহিড়ী অ্যান্ড কোং, ১৯০৪।
৬৬. সিরাজুল ইসলাম, প্রধান সম্পাদক, *বাংলাপিডিয়া*, *দশ খণ্ড*, ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ২০০৩।
৬৭. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, কোলকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সি, ১৯৪০।
৬৮. শামসুজ্জামান খান ও সেলিনা হোসেন, সম্পাদক, *বাংলা একাডেমী চরিত অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫।
৬৯. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, *রমেশ শীল*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৭।
৭০. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, সম্পাদক, *রমেশ শীল রচনাবলী*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩।
৭১. স্বরূপেন্দু সরকার, *শ্রীশ্রী হরিচাঁদের জীবনকথা*, রাজশাহী, কঙ্কাপ্রকাশ, ২০০৬।
৭২. স্বরূপেন্দু সরকার, *ভাটির নাইয়া*, *২য় সংস্করণ*, রাজশাহী, কঙ্কাপ্রকাশ, ২০০৪
৭৩. স্বরূপেন্দু সরকার, *পতিতের বান্ধব*, রাজশাহী, কঙ্কাপ্রকাশ, ২০০৯।
৭৪. স্বরূপেন্দু সরকার, *মহালক্ষী শ্রীশ্রী শান্তিদেবীর পাঁচালী*, বাগেরহাট, কবিকুটির, ১৯৯৮।
৭৫. ড. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা লোকসঙ্গীত : ভাটিয়ালী গান*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, সেগুনবাগিচা, ১৯৯৭।
৭৬. হাবিবুর রহমান, *বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত ও ভৌগোলিক পরিবেশ*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮২।
৭৭. ম ন মুস্তাফা, *আমাদের সঙ্গীত ইতিহাসের আলোকে*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৮১।
৭৮. ড. করুণাময় গোস্বামী, *প্রসঙ্গ বাংলা গান*, ঢাকা, অনুপম প্রকাশনী, ২০০৯।
৭৯. ড. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫।
৮০. ড. করুণাময় গোস্বামী, *সঙ্গীত কোষ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা; ১৯৮৫।
৮১. দিনেন্দ্র চৌধুরী, *ভাটিয়ালী গান*, *লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র*, কোলকাতা; ২০০২।

৮২. বরুণকুমার চক্রবর্তী, *বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস*, পুস্তক বিপনি, কোলকাতা, ২০০৩।
৮৩. শামসুজ্জামান খান, *বাংলাদেশের লোকঐহিত্য*, *প্রথম খণ্ড*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০০৬।
৮৪. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা লোকসঙ্গীত সারি গান*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮।
৮৫. মোমেন চৌধুরী, *লোকসংস্কার ও বিবিধ প্রসঙ্গ*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭।
৮৬. যতীন সরকার, *বাংলাদেশের কবিগান*, ঢাকা : বিভাস, ২০১০।
৮৭. সুকুমার রায়, *লোকসঙ্গীত জিজ্ঞাসা*, কোলকাতা, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৩।
৮৮. দীনেশচন্দ্র সেন, *হিন্দুসমাজ ও বৈষ্ণব ধর্ম*, কোলকাতা, নবযুগ প্রকাশনী, ২০১০।
৮৯. মনোয়ারা খাতুন, *বাংলাদেশের লোকসাহিত্য সমাজ*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০০১।
৯০. বিরাট বৈরাগ্য, *মতুয়া সাহিত্য পরিক্রমা*, নদীয়া : পরিমল বৈরাগ্য, ১৯৯৯
৯১. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *ভাষা ও দেশের গান*, ঢাকা, অনুপম প্রকাশনী, ২০০৫।
৯২. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *লোকসংগীত*, ঢাকা, প্যাপিরাস, ১৯৯৯।
৯৩. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৩।
৯৪. ড. গোকুল চন্দ্র বিশ্বাস, *মুকুন্দদাসের গান*, ঢাকা, গতিধারা, ২০০৯।
৯৫. আহমদ শরীফ, *সংস্কৃতি ভাবনা*, ঢাকা, উত্তরণ, ২০০৪।
৯৬. যূথিকা বসু, *বাংলা গানের আঙিনায়*, কোলকাতা, পুস্তক বিপনি, ২০০৪।
৯৭. দীনেশচন্দ্র সেন, *প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান*, ঢাকা, পলাশ প্রকাশনী, ২০০২
৯৮. ড. জাহিদুল কবীর, *ভাটিয়ালী গানের উদ্ভব ও বিকাশ*, ঢাকা, অন্বেষা প্রকাশন, ২০১৭।
৯৯. ড. রহমান হাবিব, *বাংলা গানের ভাবসম্পদ*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০০৯।
১০০. ড. তপন বাগচী, *লোকগানের খোঁজে*, ঢাকা, আলোকায়ন, ২০১৬।
১০১. লিঠু মণ্ডল, *বিজয় সরকার : জীবন ও কর্ম*, ঢাকা, ডাংগুলি, ২০১৭।
১০২. রণজিৎ চট্টোপাধ্যায়, *কবিগান ও কবিয়াল*, ঢাকা, আলোকায়ন, ২০১৭।
১০৩. আহমদ শরীফ, *বাউলতত্ত্ব*, ঢাকা, বুকস ফেয়ার, ২০১৩।

পত্র-পত্রিকা

১. চন্দ্রকুমার দে, "ময়মনসিংহের দাশুরায়", *সৌরভ*, মে-জুন ১৯১৪।
২. চন্দ্রকুমার দে, "মালীর জোগান", *সৌরভ*, এপ্রিল-মে ১৯১৪।
৩. বিজয়নারায়ণ আচার্য, "ময়মনসিংহের কবিগান" *সৌরভ*, জুন-জুলাই ১৯১৭।
৪. বিজয়নারায়ণ আচার্য, "রামগতির টপ্পা", *সৌরভ*, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯১৪।
৫. স্বরোচিষ সরকার, "বাগেরহাটের লোককবি স্বরূপেন্দু সরকারের কবিয়াল-জীবন ও তাঁর গান", *স্থানীয় ইতিহাস পত্রিকা*, রাজশাহী : জুন ২০০৯।
৬. স্বরোচিষ সরকার, "কবিগান : অতীত ও বর্তমান", *সাহিত্য পত্রিকা*, ফেব্রুয়ারি- ১৯৮৫।